বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

[Impact of Interest Free Banking System on the Economic Growth of Bangladesh : An Analysis]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

নুসরাত জাহান রাত্রি

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং-১৯৮/২০১৭-২০১৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ ২০২৩

এম.ফিল.

থিসিস

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

[Impact of Interest Free Banking System on the Economic Growth of Bangladesh : An Analysis]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

নুসরাত জাহান রাত্রি

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং-১৯৮/২০১৭-২০১৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ ২০২৩

উৎসর্গ

“পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা ও মমতাময়ী মা এবং
আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি যাদের
অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন উৎসাহ-উদ্দীপনা
আর অফুরন্ত দু'আকে পাথেয় করে এ স্তর
পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।”

بسم الله الرحمن الرحيم

ঘোষণাপত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি যে, **‘বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা’** শীর্ষক শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও দিক-নির্দেশনায় সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর আংশিক উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোন গবেষক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখ : ঢাকা
মার্চ, ২০২৩ খ্রি.

(নুসরাত জাহান রাত্রি)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিঃ নং-১৯৮
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০, ৬২৯১
ফ্যাক্স : ৮৮-২-৯৬৬৭২২২
ওয়েব : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/6290, 6291
Fax : 88-2-9667222
Web : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

স্মারক নং : ..... তারিখ : ০৬/০৩/২০২৩ খ্রি.

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল. গবেষক নুসরাত জাহান রাত্রি কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় প্রণীত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোন যুগ্মকর্ম নয়।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে নানান বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম পরম দাতা ও দয়ালু মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ত অবিরাম প্রেরণা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপাধ্যায় বিন্যাস, গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তার অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত স্তরে উন্নীত করতে নিরন্তর সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তার ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়েছে এবং এটা মানসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা যায়। কাজেই আমি তার কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ স্যারের প্রতি, যারা আমাকে গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ, দিক-নির্দেশনামূলক তথ্য ও আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজ করার সুযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ ও অধ্যাপক ড. শেখ মোঃ ইউসুফ স্যারের প্রতি, যারা এ গবেষণা কর্মটি দ্রুত সম্পাদনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন বলেই এ কাজে আমি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

এছাড়া আরও অনেকে যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে করব। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংকের নানা পর্যায়ের কর্মকর্তাও রয়েছেন। বিশেষ করে জনাব ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, আতিকুল ইসলাম খান খাদেম, মোঃ শাহেদ আলম ও মুহাম্মদ শোয়াইবের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের সকলের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এবং সকলকে সম্মানের সাথে স্মরণ করছি।

বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা এবং পরিবারের আপনজন যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে নানাভাবে আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, কল্যাণ কামনা ও দু'আ করেছেন যার ফলে গবেষণকর্মটি শেষ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে, আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। এছাড়া আমার স্বামী ড. মোঃ আবু হানিফাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যারা এ গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা কখনো ভুলবার নয়। মহান আল্লাহ উভয় জগতেই তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

উক্ত অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্স একাডেমী লাইব্রেরি, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ইকনমিক রিসার্চ ব্যুরো লাইব্রেরি প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফিস এবং এম.ফিল. শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আমাকে গবেষণাকর্মের জন্য দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্মে যথেষ্ঠ সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন এ কামনা করি।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি সুদমুক্ত ব্যাংকিং, ইসলামি অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর লিখিত দেশি-বিদেশি লেখকবৃন্দের রচনা, প্রতিবেদন, প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকা ও জার্নালের সহযোগিতা নিয়েছি এবং যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকবৃন্দের নাম, তাদের রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম স্বশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছি; তাদের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুবিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করার জন্য জনাব এ বি এম নূরুল্লাহর কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আকুল প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর এ নগন্য বান্দার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহ ও পরকালিন সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন।

(নুসরাত জাহান রাত্রি)
এম.ফিল. গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবর্ণায়ন

(رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

[আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত]

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا ء	অ	ض	দ	ـَ	া (আ-কার)	وُ	উ
ب	ব	ط	ত	ـِ	ি (ই-কার)	وُوْ	ঊ
ت	ত	ظ	য	ـُ	ু (উ-কার)	وِيْ	বি / ভী
ث	ছ	ع	‘	ـَا	া (আ-কার)	يَ	ইয়া
ج	জ	غ	গ	ـِيْ	ী (ঈ-কার)	يِ	ই
ح	হ	ف	ফ	ـُوْ	ূ (ঊ-কার)	يِيْ	ঈ
خ	খ	ق	ক্ব/ক	أَ	া (আ-কার)	يُ	য়ু
د	দ	ك	ক	أ	া (আ-কার)	يُوْ	য়ূ
ذ	য	ل	ল	إِ	ি (ই-কার)	عَ	‘আ
ر	র	م	ম	إِيْ	ী (ঈ-কার)	عَا	‘আ
ز	য	ن	ন	أُ	ু (উ-কার)	عِ	‘ই
س	স	ه	হ	أُوْ	ূ (ঊ-কার)	عِيْ	‘ঈ
ش	শ	و	ও	وَ وَا	ওয়া	عُ	‘উ
ص	ছ	ى	য়	وِ	বি	عُوْ	‘ঊ

ع (‘আইন) বর্ণের উচ্চারণ বুঝাতে (‘) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : শারি‘আহ্ (شَرِيْعَةٌ), আল-মু‘জাম (اَلْمُعْجَمُ), আল ‘আলামিন (اَلْعٰلَمِيْنَ), জামি‘ (اَلْجَامِعُ) প্রভৃতি।

ء (হামযা) । (আলিফ)-এর মত। তবে সাকিন হলে ঊর্ধ্ব কমা (’) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : تَأْجِيْرٌ (তা’জীর)।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত বিদেশি শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথাবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন– ডাটা (Data), ইন্টারনেট (Internet), কুরআন (قُرْاٰنٌ), দ্বীন (دِيْنٌ), নবী (نَبِي), রসুল (رَسُوْلٌ) প্রভৃতি।

শব্দ সংক্ষেপ

সংকেত		বিবরণ
অনু.	:	অনুবাদ
অনূ.	:	অনূদিত
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
প্র.	:	প্রকাশ
বুখারি	:	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ইল আল বুখারি (র.)
মুসলিম	:	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরি (র.)
তিরমিযি	:	আবু 'ইসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ইসা ইব্ন সাওরহ্ (র.)
নাসাই	:	আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন নাসাই (র.)
আবু দাউদ	:	আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস (র.)
ইবন্ মাজাহ	:	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াজিদ ইব্ন মাজাহ (র.)
মাও.	:	মাওলানা
মৃ.	:	মৃত্যু
র.	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি (رحمة الله عليه)
রা.	:	রাদিআল্লাহু আনহু (رضي الله عنه) / রাদি'আল্লাহু আনহা (رضي الله عنها)
সং.	:	সংস্করণ
সা.	:	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (صلى الله عليه و سلم)
আ.	:	আলাইহিস সালাম (عليه السلام)
হি.	:	হিজরি
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
১ম	:	প্রথম
২য়	:	দ্বিতীয়
৩য়	:	তৃতীয়
৪র্থ	:	চতুর্থ
৫ম	:	পঞ্চম
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
AAOIFI	:	Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
ed.	:	edited
M.Phil.	:	Master of Philosophy

সংকেত		বিবরণ
p.	:	page
Ph.D.	:	Doctor of Philosophy
pp.	:	pages
vol.	:	volume
IBBL	:	Islami Bank Bangladesh Limited
SIBL	:	Social Islami Bank Limited
FSIBL	:	First Security Islami Bank Limited
SJIBL	:	Shahjalal Islami Bank Limited
AIBL	:	Al-Arafah Islami Bank Limited
GIBL	:	Global Islami Bank Limited
EXIM	:	Export Import Bank Limited
SPSS	:	Statistical Package for the Social Sciences

এ্যাবস্ট্রাক্ট (Abstract)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

(Impact of Interest Free Banking System on the Economic Growth of Bangladesh : An Analysis)

সুদমুক্ত ব্যাংকিং মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক পরিচালিত এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যাতে সুদ ও সুদের বিনিময়ে ধার ও ঋণের লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে সুদ নির্মূলকরণ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা, ন্যায়বিচার, দক্ষতা, স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্যোক্তা ও পুঁজির মালিকের মধ্যে শিল্প অথবা বাণিজ্যিক ঝুঁকি সমানভাবে বণ্টন এবং বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা ও মুনাফা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে মূলধনের ভিত্তিতে ভাগ করে দেয়া হয়ে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সাধারণত সেরা ঋণ পরিশোধকারী গ্রাহকদের সেবা দিতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও লাভজনক প্রকল্পের সন্ধান করে। ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং তাত্ত্বিকভাবে ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্তর ও সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের বিরোধিতা করে এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। বাংলাদেশের চলমান অর্থব্যবস্থাকে আরো স্থিতিশীল করে গড়ে তোলার জন্য সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাবতীয় যোগ্যতা ধারণ করে। আর সে ধারণার আলোকে **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক শিরোনামে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণীত হয়েছে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাংকিং কার্যাবলিতে ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালন করা। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতা নির্ভর করে সুদ বর্জন নীতিমালা পরিপালনের উপর। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে ব্যাংকিং-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সকল দিক ও বিভাগে সুদ পরিহারের নীতিমালা পরিপালন অত্যাবশ্যক। সুদমুক্ত ব্যাংকিং বিষয়ে বিশ্বে যে ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে সে তুলনায় বাংলাদেশ এখনও অনেকটা পিছিয়ে আছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকি ও অর্থায়ন অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এ ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামি পদ্ধতির আলোচনা এখন পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন একটা স্থান পায়নি বললেই চলে। ফলে এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা ও সংশয় এখনও বিরাজমান করছে। বিশেষত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যপদ্ধতির ব্যাপারে ব্যাংকার-গ্রাহক ও জনসাধারণের মাঝে স্পষ্ট ধারণার ব্যাপক অভাব পরিদৃষ্ট হয়। আর এ বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ গবেষণার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো ব্যাংকিং কার্যাবলিতে ইসলামি বিধি-বিদান পরিপালন করা, যা সাম্য, ন্যায়, ও মমত্তভিত্তিক। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুফল লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে কুরআনে বর্ণিত সে নীতি পরিপালনের উপর। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে

সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বাস্তবতা উদ্ঘাটন করা।

এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য ইংরেজি ও আরবি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের ব্যাংকিং কাঠছামো ও বাংলাদশের সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তার সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহে সুদমুক্তভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে মাঠ জরিপের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অবস্থা চিহ্নিত করে সম্ভাব্য দিক-নির্দেশনা ও সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি ভাবানুবাদের আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় প্রণীত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামি ব্যাংকসমূহে সুদ পরিহারপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যে সব খাতে অবদান রেখেছে সেগুলোতে ইসলামি বিধি-বিদান পরিপালনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণই গবেষণা পরিধির আওতাভুক্ত। এ ছাড়া এ সংক্রান্ত ব্যাপারে মানুষের মাঝে ভুল ও অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত রয়েছে। সে বিষয়টিও এ গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া শারি'আহ ও সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের পরিচিতিও তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালনপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ব্যাংকসমূহের অবদান সংক্রান্ত বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

সর্বোপরি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিশেষত সুদমুক্তভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিস্থিতি চিহ্নিত করে এতদ্‌বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা গবেষণা কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Sources) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Sources) ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা'** শিরোনামে এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায়ে ও প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের কাঠামো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার শিরোনামোক্ত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ভূমিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা, গবেষণা কর্মের পরিধি, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা এবং বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ক্রমানুসারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের উৎপত্তি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন'। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যুদয়, স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-

সামাজিক অবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিংও এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্র'। এ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিশ্লেষণ, ইসলামি অর্থনীতির ধারণা, বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ' বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং'। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিকাশ, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সামগ্রিক চিত্র, সুদ ও মুনাফার পরিচিতি, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ ও মুনাফার অবস্থানগত পার্থক্য ও বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ'। এ অধ্যায়ে মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরোক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিবিধ প্রকার নির্দেশকের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের উপর মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং'। এ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকসমূহের উপর প্রচলিত ও সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর অবস্থানগত পার্থক্য, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সে আলোকে বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রসারে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। শিরোনামোক্ত বিষয়বস্তুসমূহকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে যথাস্থানে তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তথ্যসূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে।

উপসংহার : অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার লিখিত হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে একান্ত অভিব্যক্তি উপসংহারে প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা শারি'আহ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের গ্রাহকগণ ও ইসলামি অর্থনীতিবিষয়ক গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনসাধারণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভ থেকে সুদমুক্ত ব্যাংকিং, ইসলামি শারি'আহ, সুদ ও সুদের কুফল, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন, সর্বোপরি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয়ভাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ যদি সামান্যতম উপকৃত হয় তাহলেই এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে পরিগণিত হবে।

তারিখ, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.

নুসরাত জাহান রাত্রি
এম.ফিল. গবেষক
রেজি: নং-১৯৮/২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

- উৎসর্গ ii
- ঘোষণাপত্র iii
- প্রত্যয়নপত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- প্রতিবর্ণায়ন vii
- শব্দ সংক্ষেপ viii
- সূচিপত্র x

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা ২
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৩
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪
- গবেষণার পদ্ধতি ৫
- গবেষণাকর্মের পরিধি ৫
- গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস ৬
- তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ৬
- গবেষণার সময়কাল ৬
- গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা ৭
- প্রাক-পঠন পর্যালোচনা ৮
- অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ১০
- উপসংহার ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের উৎপত্তি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

- ◈ প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের অভ্যুদয় ১৪
- ◈ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৩১
- ◈ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ৩৭
- ◈ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ৪৫

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্র

- ◈ প্রথম পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা ৫০
- ◈ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিশ্লেষণ ৫৬
- ◈ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি অর্থনীতির ধারণা ৬২
- ◈ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ৭৫
- ◈ পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা ৮৩

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং

- ◈ প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর বিকাশ ৯৮
- ◈ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর সামগ্রিক চিত্র ১০৪
- ◈ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুদ ও মুনাফার পরিচিতি ১১৪
- ◈ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ ও মুনাফার অবস্থানগত পার্থক্য ১২৭
- ◈ পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব ১৩৪

পঞ্চম অধ্যায়
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

- ◈ প্রথম পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব ১৪৫
- ◈ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরোক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব ১৫৪
- ◈ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিবিধ প্রকার নির্দেশকের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব ১৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং

◈ প্রথম পরিচ্ছেদ	:	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকসমূহের উপর প্রচলিত ও সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর অবস্থানগত পার্থক্য	১৬৬
◈ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল	১৭৬
◈ তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রভাব পর্যালোচনা	১৮৯
◈ চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রসারে সুপারিশমালা	১৯৬
◈		উপসংহার	২০৬
◈		পরিশিষ্ট : সাক্ষাৎকার অনুসূচি	২০৯
◈		গ্রন্থপঞ্জি	২২০

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- গবেষণার পদ্ধতি
- গবেষণা কর্মের পরিধি
- গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস
- তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ
- গবেষণার সময়কাল
- গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা
- প্রাক-পঠন পর্যালোচনা
- অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা
- উপসংহার

গবেষণা প্রস্তাবনা

সুদমুক্ত ব্যাংকিং মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক পরিচালিত এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যাতে সুদ ও সুদের বিনিময়ে ধার ও ঋণের লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে সুদ নির্মূলকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাম্য, যৌক্তিকতা, ন্যায়বিচার, দক্ষতা, স্থিতিশীলতা ও ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

আল নাজ্জার ইবরাহিম আনসারি কর্তৃক লিখিত 'ইসলামি ব্যাংকিং কি ও কেন?' গ্রন্থটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলো সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকিং-এর জন্য আন্দোলনের সূচনা করে মূলত ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। আর সে আন্দোলনের সূত্র ধরেই প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বিশ্বে প্রথম ইসলামি ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে সৌদি আরবের জেদ্দায় মুসলিম দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে স্ব স্ব দেশের অর্থনীতি ইসলামিকরণের একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সিদ্ধান্তের আলোকে মুসলিম দেশগুলো স্ব স্ব দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সূত্রপাত তারই ফলশ্রুতি। তা ছাড়া, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ কর্মসূচি 'Structural Adjustment Programmer'-এর আওতায় বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত দেশের সরকার উদারীকরণ নীতির মাধ্যমে প্রথম ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অনুমোদন দেয়া আরম্ভ করে। এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তা শামিয়াল ভারভিকা, আব্বাস মীরা খান ও মহসিন খান।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ ইসলামি উন্নয়ন সংস্থার অংশীদারিত্বে কয়েকজন ব্যবসায়ীর উদ্যোগে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। দেশে বিদ্যমান কোম্পানি আইনের অধীনে বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে প্রথম একটি ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয় যার মূল উদ্দেশ্য স্বাধীনতা পরবর্তী বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের আলোকে শারি'আহ অনুযায়ী সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করে মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে অগ্রগতির পথে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। আর সদ্য স্বাধীন দেশ বলে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক অবস্থার সাথে অনভিজ্ঞতা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবে মুসলিম দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্ব স্ব দেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রণয়ণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা ছিল বাংলাদেশের জন্য আলোর মশাল স্বরূপ। কারণ, মুসলিম সংস্থাগুলোর সদস্যপদ লাভ, সর্বোপরি সংস্থাগুলোর সার্বিক সহায়তা লাভের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা করার অর্থাৎ একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বহির্বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য এর চেয়ে উত্তম পদক্ষেপ আর ছিল না।

ইসলামি চিন্তাবিদগণ বলে থাকেন, ইসলামি ব্যবস্থা কোন সাময়িক বা যুগ বিশেষের ব্যাপার নয়। সমস্ত দেশ ও কালের জন্যই তা প্রযোজ্য। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ইসলামের অর্থনীতি গ্রন্থে বলেছেন, 'ইসলাম এক চিরন্তন ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা বলিয়া উহার উপস্থাপিত রীতিনীতি ও আদর্শ সমাজজীবন পুনর্গঠণের জন্য চিরকালীন মৌলিক ব্যবস্থা, তাহার কোনটাই সাময়িক বা ক্ষণিক নহে।'[১]

আধুনিক বিশ্বের দোদুল্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ঋণসমস্যার ভারে পশ্চিমাদেশগুলো চরমভাবে বিপদগ্রস্থ। আর সে বিপদগ্রস্থ অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব এতটাই জটিল যে, নিরাপদ অর্থনীতির দেশ

---

১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, এপ্রিল, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৪

ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহও চরমভাবে আক্রান্ত হতে পারে। পৃথিবীর এ অবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাও জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন সরকারের সময়ে অত্যধিক হারে ব্যাংক ঋণগ্রহণ, লাগামহীন মূল্যস্ফীতি, রেমিট্যান্স সরবরাহে ব্যাপক ধস, রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতি, আমদানি বাণিজ্যে ব্যয় বৃদ্ধি, বিভিন্ন খাতে অতিমাত্রায় ভর্তুকি প্রদান ও লেনদেনে ভারসাম্য চাপ দেশের অর্থনীতিকে জটিল করে তুলেছে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ অর্থনৈতিক মন্দার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে 'সুদ' বা 'রিবা' নামক ভয়ংকর একটি অভিশাপ।

সুদকে অভিশাপ হিসেবে অভিহিত করার কারণ হলো, যখন একটি দেশ আরেকটি দেশের কাছ থেকে বা বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে তখন চড়া সুদের বোঝা হিসেবে সে দেশের উপর চেপে যায়। যেখানে একটি দেশের নাগরিকদের স্বাভাবিক প্রাপ্য সুবিধা প্রদানের জন্য ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে সেখানে আসল প্রদেয় অর্থের সাথে সাথে বাড়তি সুদ সে দেশের উপর একটি অবাঞ্চিত চাপ ছাড়া আর কিছুই না। এতে করে দেখা যায়, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলো অর্থনীতির দিক থেকে পশ্চাৎপদ রয়ে যায়, আর পুজিবাদী উন্নত রাষ্ট্রগুলো সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবেই ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বিভাজন গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। একমাত্র সুদমুক্ত অর্থনীতিই পারে এ ভেদাভেদ পিছনে ফেলে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মাঝে সমতা আনয়ন করে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। আর সে জন্যই সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্যোক্তা ও পুঁজির মালিকের মধ্যে শিল্প অথবা বাণিজ্যিক ঝুঁকি সমানভাবে বণ্টন এবং বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা ও মুনাফা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে মূলধনের ভিত্তিতে ভাগ করে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সাধারণত সেরা ঋণ পরিশোধকারী গ্রাহকদের সেবা দিতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও লাভজনক প্রকল্পের সন্ধান করে। ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং তাত্ত্বিকভাবে ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্তর ও সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের বিরোধিতা করে এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। বাংলাদেশের চলমান অর্থব্যবস্থাকে আরো স্থিতিশীল করে গড়ে তোলার জন্য সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাবতীয় যোগ্যতা ধারণ করে। আর সে ধারণার আলোকে **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক শিরোনামে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণীত হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাংকিং কার্যাবলিতে ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালন করা। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতা নির্ভর করে সুদ বর্জন নীতিমালা পরিপালনের উপর। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে ব্যাংকিং-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সকল দিক ও বিভাগে সুদ পরিহারের নীতিমালা পরিপালন অত্যাবশ্যক। সুদমুক্ত ব্যাংকিং বিষয়ে বিশ্বে যে ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে সে তুলনায় বাংলাদেশ এখনও অনেকটা পিছিয়ে

আছে। সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহে সুদ বর্জনের নীতিমালা পরিপালন পূর্বক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কি পরিমাণ অবদান রাখছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য বই-পুস্তকের প্রচুর অভাব রয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই-পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল।

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকি ও অর্থায়ন অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এ ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামি পদ্ধতির আলোচনা এখন পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন একটা স্থান পায়নি বললেই চলে। ফলে এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা ও সংশয় এখনও বিরাজমান করছে। এমনকি বর্তমানে যারা সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট– ব্যাংকার কিংবা গ্রাহক যে হিসেবেই হোক না কেন তাদের মধ্যেও বহু ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব প্রকট। বিশেষত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যপদ্ধতির ব্যাপারে ব্যাংকার-গ্রাহক ও জনসাধারণের মাঝে স্পষ্ট ধারণার ব্যাপক অভাব পরিদৃষ্ট হয়। আর এ বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক শিরোনামে এ গবেষণার প্রয়াস।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো ব্যাংকিং কার্যাবলিতে ইসলামি বিধি-বিদান পরিপালন করা, যা সাম্য, ন্যায়, ও মমত্তভিত্তিক। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুফল লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে কুরআনে বর্ণিত সে নীতি পরিপালনের উপর। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বাস্তবতা উদ্ঘাটন করা। এছাড়াও এ গবেষণার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হলো :

- সুদি ও সুদমুক্ত ব্যাংকিং সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা গবেষণামূলক লিখিত নির্ভরযোগ্য দালিলিক প্রমাণ হিসেবে সংরক্ষিত রাখা।
- বাংলাদেশের সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে জনসাধারণের বাস্তব কাজে ব্যবহার করার পথ নির্দেশক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- ইহ ও পরকালীন কল্যাণে ইসলামি বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত ব্যাংকিং ও সুদ সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে গভীর জ্ঞান লাভ করে জীবন চলার পথ সহজ করা।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতগুলোতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা কতখানি লাভজনক তার সঠিক চিত্র উপস্থাপন করা।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রভাব কতটুকু তা নির্ণয় করা ও কিভাবে আরো ভূমিকা রাখতে পারে তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।
- বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকগুলোতে কতটুকু ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালনপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় তার বাস্তবতা বিষয়ে পর্যালোচনা করা।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি

সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান হলো প্রকৃত গবেষণা। মূলত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে[২] যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাকেই গবেষণা বলে। গবেষণা বিদ্যমান জ্ঞানের সাথে নতুন কিছু সংযোজন করে থাকে। এ গবেষণায় ঐতিহাসিক (Historical) ও পর্যবেক্ষণমূলক (Observational) আন্তর্জাতিক (International) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার বিষয়টি আর্থ-সামাজিক গবেষণার আওতাভুক্ত। গবেষণার সুবিধার্থে অনেক সময় একাধিক পদ্ধতির আবশ্যকতা দেখা দেয়। তবে এ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে সাধারণত ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analysis Method) বেশি অনুসৃত হয়েছে।

এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য ইংরেজি ও আরবি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের ব্যাংকিং কাঠছামো ও বাংলাদশের সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তার সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহে সুদমুক্তভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে মাঠ জরিপের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অবস্থা চিহ্নিত করে সম্ভাব্য দিক-নির্দেশনা ও সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি ভাবানুবাদের আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় প্রণীত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

গবেষণা কর্মের পরিধি

বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামি ব্যাংকসমূহে সুদ পরিহারপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যে সব খাতে অবদান রেখেছে সেগুলোতে ইসলামি বিধি-বিদান পরিপালনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণই গবেষণা পরিধির আওতাভুক্ত। এ ছাড়া এ সংক্রান্ত ব্যাপারে মানুষের মাঝে ভুল ও অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত রয়েছে। সে বিষয়টিও এ গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া শারি'আহ ও সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের পরিচিতিও তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালনপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ব্যাংকসমূহের অবদান সংক্রান্ত বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

সর্বোপরি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিশেষত সুদমুক্তভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিস্থিতি চিহ্নিত করে এতদ্‌বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা গবেষণা কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

---

২. 'মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৪টি ধাপ হলো : (১) ঐতিহাসিক (Historical) (২) বর্ণনামূলক (Descriptive) (৩) বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) এবং (৪) পর্যবেক্ষণমূলক (Observational)। একটি গবেষণার জন্য উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করলে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর খুব গভীরে প্রবেশ করা যায় এবং একটি মানসম্পন্ন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো সম্ভব হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে ইতিহাস, বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ এ ৪টি দিক যথাযথভাবে সমন্বয় করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হয়।' দ্র. প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল*(ঢাকা : মাহফুজ কম্পিউটারস, নভেম্বর, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৯। এ গবেষণার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ধাপসমূহ সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল যাতে টেকসই কৌশলে অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত না হয় সে বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Sources) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Sources) ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎসের (Primary Sources) মধ্যে রয়েছে অপ্রকাশিত থিসিস, বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড, ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বরত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার, শারি'আহ বিশেষজ্ঞ, ইসলামি ব্যাংকসমূহে কর্মরত ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের মতামত বিশ্লেষণ ইত্যাদি। ব্যাংকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, সাময়িকী, অর্ধবার্ষিকী, মাসিক, ত্রয়োমাসিক কিংবা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন, বিভিন্ন ঘোষণা সম্বলিত বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা, ডায়েরি, বিবরণী, পুস্তিকা, জার্নাল, ব্রশিউর, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, মাঠ জরিপ (Field Survey) ও গঠনমূলক সুপারিশ ইত্যাদি গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Sources) মধ্যে রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলি, অনূদিত গ্রন্থ, বিশ্বকোষ, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেগুলোতে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যাবলিতে ইসলামি বিধি-বিদান পরিপালন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের জার্নাল, বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহের শারি'আহ কাউন্সিল ও সেন্ট্রাল শারি'আহ কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শারি'আহ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের জার্নাল ও শারি'আহভিত্তিক পরিচালিত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলির বিবরণ এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ।[৩]

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য, তত্ত্ব, উপাত্ত ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্পর্কিত আলোচনা এম.এস.ওয়ার্ড (MS Word) এবং টেবিল ও সারণী এম.এস.এক্সেল (MS Excel)-এর সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালনপূর্বক বাংলাদেশের সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে কি–না সে বিষয়টি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন পদক্ষেপও এখানে উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

গবেষণার সময়কাল

এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে প্রায় পাঁচ সময় লেগেছে। এ সময়কালকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট, এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

৩. দ্বৈতীয়িক উৎসসমূহের মধ্যে শারী'আহ্ পরিপালন বিষয়ক জার্নাল ও গ্রন্থসমুহ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলামি শারি'আহ্‌ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হওয়ায় এ সংক্রান্ত তথ্যাবলি সম্বলিত বই-পুস্তক গবেষণা উৎসের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামি ব্যাংকিং ও ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নিজস্ব প্রকাশনা, রিপোর্ট, জার্নাল, সাময়িকী ও ডাটাসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং সম্পর্কিত বেশ কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের সাথে আলোচনা আকারে মত বিনিময় করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ যাচাই-বাছাই করে গবেষণা কর্মের মানদণ্ড বজায় রেখে কর্ম সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে ড্রাফটিং, সম্পাদনা, পুনঃসম্পাদনা এবং চূড়ান্ত প্রুফসহ সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ বছর। গবেষণাকর্মে নিয়োজিত মোট সময়কে নিচে ছকের মাধ্যমে প্রদর্শিত করা হলো :

নিয়োজিত সময়ের তালিকা

কাজের প্রকার	নিয়োজিত সময়
প্রথম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	৮ মাস
দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	৮ মাস
উভয় পর্যায়ের উৎসের মাঝে সমন্বয় সাধন	৮ মাস
প্রশ্নপত্র তৈরি ও সম্পাদনা	৬ মাস
জরিপ (ব্যাংকার ও গ্রাহক)	৮ মাস
তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৭ মাস
কম্পিউটার কম্পোজ	৭ মাস
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রুফ	৫ মাস
চূড়ান্ত মুদ্রণ, সম্পাদনা ও বাঁধাই	৩ মাস
মোট	**৬০ মাস**

গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার সময় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অর্থনীতি ব্যাংকের দায়িত্বশীল বিভিন্ন নির্বাহী-কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণের ব্যস্ততার কারণে গবেষণার ব্যাপারে সহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে অনীহা এর মধ্যে অন্যতম। নিম্নে সীমাবদ্ধতাসমূহের কতিপয় দিক উল্লেখ করা হলো :

১. **তথ্য প্রদানে অনীহা :** গোপনীয়তা রক্ষার্থে অনেক ব্যাংক কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছেন। তবে বিশেষ কৌশলে বিকল্প পন্থায় সেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. **তথ্য ভাণ্ডারের অপর্যাপ্ততা :** সারা বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলেও ইসলামি ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আশানুরূপভাবে তা পাওয়া যায়নি। তথ্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে একাধিকবার বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ করতে হয়।

৩. **গবেষণার সময় :** এম.ফিল. একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ শিক্ষার স্তর হওয়ায় বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। যার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে গবেষক পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে পারে না। এতে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারলে অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সুচারুভাবে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হত।

৪. **ব্যাংকের নির্বাহী-কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণের ব্যস্ততা :** ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী-কর্মকর্তা ও গ্রাহকগণের সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময় তাদের যথেষ্ট ব্যস্ত দেখা গেছে। যার ফলে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লেগেছে। তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেলে এটি আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করা যেত।

৫. **করোনা মহামারি সংক্রান্ত জটিলতা :** ২০২০ খ্রিস্টাব্দে করোনা মহামারি সমগ্র বিশ্বের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। এ ক্ষতিকর প্রভাব বাংলাদেশকেও আঘাত করেছে। অন্যান্য সকল খাতের মত শিক্ষাখাতও বিপর্যস্ত হয়েছে। ফলে গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। করোনা মহামারিজনিত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হলে আরো দ্রুত গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত।

প্রাক-পঠন পর্যালোচনা

বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা, সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার শুরুর কথা, সুদমুক্ত ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এ ব্যাংকসমূহের প্রভাব, চলার পথ এবং এ ব্যবস্থায় বিশেষ করে ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শারি'আহ নীতিমালার প্রায়োগিক বিভিন্ন সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সংক্রান্ত বিষয়ক কিছু সংখ্যক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং সামান্য দিক ও বিভাগ নিয়ে গবেষণাও হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ–

ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসনে, '*স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস*' (২০১৪ খ্রি.) নামক গ্রন্থে প্রাচীন কাল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে আর্থিক অবকাঠামোগত সংস্কারের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। তবে এ গ্রন্থে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি আলোচিত হয়নি।

মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, '*উন্নয়ন অর্থনীতি*' (২০১৯ খ্রি.) নামক গ্রন্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির পার্থক্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎস ও নির্দেশক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ গ্রন্থে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হয়নি।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম '*ইসলামের অর্থনীতি*' (৬ষ্ঠ প্রকাশ ১৯৯৭ খ্রি.) নামক গ্রন্থে অর্থনীতির গোড়ার কথা, অর্থনীতির সামাজিক উন্নয়ন শক্তি, জাতীয় উন্নয়নে অর্থব্যবস্থার অবদান, অর্থোৎপাদনের পন্থা, শিল্প, ভূমি ও বণ্টননীতি, ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, ইসলামি ব্যাংকের পরিকল্পনা, ইসলামি ব্যাংকের পূর্ব ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক সুশাসনে ইসলামি ব্যাংকের অংশগ্রহণ, বৈদেশিক বিনিময় ও ইসলামি ব্যাংক প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তবে এ বইতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশক, উৎস এবং সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পন্থা সম্পর্কিত কোন বিষয় উল্লিখিত হয়নি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন '*ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*' (২য় সংস্করণ ২০১৩ খ্রি.) শীর্ষক গ্রন্থে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার পটভূমি, ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য, সুদ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা, ইসলামি ব্যাংকের তহবিলের উৎস, ইসলামি ব্যাংকের কার্যাবলি, বিনিয়োগ, মুদারাবা কারবারের শর্তাবলি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিময় এবং ইসলামি

ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত সুচারুভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার নৈতিকতা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কতখানি অবদান রাখে তার একটি চিত্র এ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। তবে এ গ্রন্থে সত্যিকার অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে রচিত তথাকথিত পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার সীমাহীন ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ইসলামি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি।

ইসলামি ব্যাংকিং এর তাত্ত্বিক বিষয় সম্বলিত আরেকটি গ্রন্থ হলো '*ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি*' (১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪ খ্রি.) লিখেছেন যৌথভাবে আব্দুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ। গ্রন্থখানিতে ব্যাংক ও অর্থব্যবস্থা, ইসলামি ব্যাংকিং, সুদ, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার বিনিয়োগ পদ্ধতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এবং শারি'আহ বিষয়ক আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই যেমন- এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং*' (১ম প্রকাশ, মে ১৯৯৯ খ্রি.)। এ বইয়ে লেখক ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি, কর্মপদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বিনিয়োগ, বীমা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*' (১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.)। এ বইয়ে লেখক ইসলামি ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা, প্রায়োগিক বিভিন্ন দিক ও আনুষঙ্গিক মৌলিক বিষয়াদির উপর আলোচনা করেছেন।

এম এ মান্নান রচিত '*ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব • প্রয়োগ*' (১৯৮৩ খ্রি.)। এটি ইসলামি অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ.এ.এম হাবীবুর রহমান রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং*' (৬ষ্ঠ সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৪ খ্রি.) গ্রন্থে ইসলামি ব্যাংক ও অর্থনীতি, ইসলামি সাধারণ জ্ঞান, বিনিয়োগ, জামানত, বিবিধ ব্যাংকিং আইন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। শাহ আব্দুল হান্নান-এর '*ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল*' (জুন ২০০৬ খ্রি.) দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়গুলো চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম প্রণীত '*ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*' (৩য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩ খ্রি.)। ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন প্রণীত, আবদুল মতীন জালালাবাদী অনূদিত '*ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*' (২য় সংস্করণ, মে ২০০৩ খ্রি.)। এম এ হামিদ রচিত, প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূদিত '*ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*' (২য় সংস্করণ, মে ২০০২ খ্রি.)। এগুলো ইসলামি অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর লিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

মোঃ মোসলেহ উদ্দিন রচিত '*ব্যাংকিং এ শরীয়া : আমানত, বিনিয়োগ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*' (ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.)। মোঃ সেতাউর রহমান রচিত '*ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি*' (১ম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.)। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান রচিত '*ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশে শরী'আহ বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা*' (অক্টোবর ২০১৬ খ্রি.)। ডক্টর ইউসূফ আল-কারাদাভী প্রণীত মোঃ মুখলেছুর রহমান সম্পাদিত '*ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা*' (২য় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রি.)। মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান সম্পাদতি '*ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ : পরিপালন-প্রয়োগ-পদ্ধতি*' (১ম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৬ খ্রি.)। শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান রচিত

'*ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*' (২য় প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.)। ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আমিন প্রণীত '*ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*' (১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রি.)। ড. মো. ইব্রাহীম খলিল লিখিত '*ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*' (৩য় মুদ্রণ, মে ২০১৫ খ্রি.)। এ সমস্ত গ্রন্থে লেখকগণ ইসলামি ব্যাংকিং ও বীমার প্রায়োগিক বিভিন্ন দিক ও আনুষঙ্গিক মৌলিক বিষয়াদির উপর আলোকপাত করেছেন।

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী রচিত '*সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি, কেন, কিভাবে?*' (১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮ খ্রি.)। মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী রচিত '*ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*' (৪র্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০১ খ্রি.)। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান লিখিত '*মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং*' (১ম সংস্করণ, মার্চ ২০১৬ খ্রি.)। উক্ত গ্রন্থাবলিতে সুদ, ইসলামি ব্যাংকিং, ব্যবসা-বাণিজ্য, শারি'আহর বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ফাহদা নুর আহমাদ কামার প্রণীত '*Islamic Financial System : Principles & Operations*' (২০১৬ খ্রি.) নামক গ্রন্থে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুদমুক্ত ব্যাংকিং পদ্ধতির ধরাণা, ইসলামি পুঁজি বাজার, তাকাফুল এবং ঝুঁকিব্যবস্থাপনার ইসলামি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আদাম আব্দুল্লাহ রচিত '*Islamic Economics : Principles & Analysis*' (২০১৮ খ্রি.) শীর্ষক গ্রন্থে ইসলামি অর্থনীতি, ইসলামি অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎস, নির্দেশক এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

ড. এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকি রচিত '*Banking Without Interest*' (১৯৮৩ খ্রি.), ডেভিগা ভেনজেদাসালাম প্রণীত '*Principles of Economics*' (২০১৩ খ্রি.), ড. খুরশিদ আহমেদ প্রণীত '*Economic Development in an Islamic Framework'* (১৯৭৯ খ্রি.), পিটার এস. রোজ সংকলিত '*Bank Management & Financial Services*' (২০১৩ খ্রি.), এন্থনী সান্ডার্স ও মার্সিয়া মিলন কমেট প্রণীত '*Financial Institutions Management*' (২০১৩ খ্রি.), মোঃ আবদুল হামিদ মিয়া রচিত '*Islamic Microfinance*' (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রি.), এম. উমর চাপড়া প্রণীত '*Islam and Economic Development : A Strategy for Development with Justice and Stability*' (১৯৯৩ খ্রি.) এবং মোহাম্মদ আবদুল মান্নান রচিত '*Islamic Banking in the Light of Objectives of Shariah*' (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.)। ইসলামি অর্থনীত, ফাইন্যান্স, আইন, শারি'আহ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা সম্বলিত প্রোক্ত গ্রন্থাবলি এ গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলি ইসলামি অর্থনীতি, ফাইন্যান্স, ব্যাংকিং ও শারি'আহ বিষয়ক লিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এগুলো অধ্যয়নপূর্বক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালনকে সহজ করার সুপারিশমালা সম্বলিত তাত্ত্বিক বিষয়কে গ্রহণপূর্বক গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ-গঠন পরিকল্পনা

গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা'** শিরোনামে এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায়ে ও প্রত্যেকটি অধ্যায়কে

কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের কাঠামো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার শিরোনামোক্ত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ভূমিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা, গবেষণা কর্মের পরিধি, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা এবং বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ক্রমানুসারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের উৎপত্তি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন'। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যুদয়, স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিংও এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্র'। এ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিশ্লেষণ, ইসলামি অর্থনীতির ধারণা, বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ' বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং'। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিকাশ, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সামগ্রিক চিত্র, সুদ ও মুনাফার পরিচিতি, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ ও মুনাফার অবস্থানগত পার্থক্য ও বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ'। এ অধ্যায়ে মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরোক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিবিধ প্রকার নির্দেশকের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের উপর মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং'। এ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকসমূহের উপর প্রচলিত ও সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর অবস্থানগত পার্থক্য, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সে আলোকে বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রসারে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। শিরোনামোক্ত বিষয়বস্তুসমূহকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে যথাস্থানে তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তথ্যসূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে।

উপসংহার : অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার লিখিত হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে একান্ত অভিব্যক্তি উপসংহারে প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা শারি'আহ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের গ্রাহকগণ ও ইসলামি অর্থনীতিবিষয়ক গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনসাধারণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভ থেকে সুদমুক্ত ব্যাংকিং, ইসলামি শারি'আহ, সুদ ও সুদের কুফল, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন, সর্বোপরি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয়ভাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ যদি সামান্যতম উপকৃত হয় তাহলেই এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। মহান আল্লাহর কাছে যেন এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গৃহীত হয় সে প্রার্থনা রইল। আমিন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের উৎপত্তি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের অভ্যুদয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের উৎপত্তি ও অর্থব্যবস্থার পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কেও আলোচনা করা জরুরি। কারণ, বাংলার আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহুকালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড অর্জন করেছি। শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্যের প্রমাণ আজও বাংলার বিভিন্ন স্থানে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই শুধুমাত্র বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করলেই বাংলাদেশের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। বরং, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যার জন্য প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস বর্তমান সময়ে বেশ কিছুটা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। কারণ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কোন নির্ভরযোগ্য রচনাকারীর অবদান বা শাসকদের আত্মজীবনীমূলক রচনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এ সময়ের তথ্য-উপাত্ত ও ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হয় সে সময়ের কোন শিল্পকলা, চিত্রকলা, মঠ, বিহার, মূর্তি, ভ্রমণ কাহিনী, বিভিন্ন বিদেশি পরিব্রাজকদের রচনা থেকে। এ সকল উৎস বিচার করে বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাসের মোটামুটি একটা চিত্র উপস্থাপন করা যায়।[১] নিচে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হলো :

বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় : প্রাচীনকালে বাংলা বলতে বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বুঝাত যাতে বিভিন্ন ভৌগোলিক নামের উপস্থিতি ছিল। ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল' প্রদেশের ভূখণ্ড, বর্তমানে যা বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ, তা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার অবিভক্ত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসনামলে রাষ্ট্রীয় সীমারেখার সংকোচন ও সম্প্রসারণ হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক সীমারেখার ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।[২]

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে বাংলার নাম ও সীমার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলেই একাধিকবার বাংলাকে বিভক্ত করে এর বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ

---

১. মোহাম্মদ নূরনবী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে* ১৯৭১(ঢাকা : ঝিনুক প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৭

২. 'উত্তরে সিকিম ও হিমালয় এবং নিম্ন উপত্যকায় উত্তরাংশে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা। ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে এর উত্তর-পূর্বের প্রাকৃতিক সীমা। পূর্ব সীমার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈয়ন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা, পূর্ব-দক্ষিণে ত্রিপুরা শৈলশ্রেণি বঙ্গদেশকে বৃহত্তর আসামের লুসাই জেলা ও ব্রহ্মদেশ থেকে আলাদা করে রেখেছে। বঙ্গের পশ্চিমে রয়েছে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর, মানভূম, ধলভূম, কেওনঝাড়, ময়ূরভঙ্গের আরণ্যক মালভূমি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বঙ্গের পশ্চিম সীমানা দক্ষিণে গঙ্গার তীর বেয়ে আধুনিক দ্বারভাঙ্গা জেলার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বঙ্গের দক্ষিণ সীমানায় বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগরের কূল বরাবর সমতট ভূমি যেখানে রয়েছে সুবিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর, হাজারও নদনদী, খালবিল। এসব নদনদীর পলিমাটিতে গড়ে উঠেছে বর্তমানকালের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনিপুর, চব্বিশ পরগণা এবং বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের অধিকাংশ নিম্নভূমি।' দ্র. কে. আলী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৭

শাসনামলের অবসানলগ্ন পর্যন্ত যাকে আমরা বাংলা বলে জেনে এসেছি আসলে তার বাইরেও অনেক অংশ বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভক্তি বাংলাকে দু'টি ভিন্ন দেশের ভিন্ন অঞ্চলে পরিণত করেছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতবর্ষের বিভক্তি পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের এবং পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অংশ করে দেয়। কিন্তু এই বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তা মুছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলাকে 'বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা করেন।[৩]

বাংলার প্রাচীনযুগ : প্রাচীন বাংলার ভূখণ্ডটি বর্তমান সময়ের মত একটি একত্রিত ভূখণ্ড ছিল না। তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন জনপদের নামানুসারে তাদের অবস্থানরত এলাকার নামকরণ করা হত। এগুলো সীমানা সবসময় এক রকম ছিল না। বিভিন্ন শাসকের সময় নানাবিধ রাজনৈতিক কারণে এগুলোর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার জনপদ– বঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড়, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, বঙ্গাল, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি নামে বিভক্ত ছিল।

(ক) বঙ্গ : প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের একটি পৃথক রাজ্যের নাম 'বঙ্গ'। ইহা যশোর ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো নিয়ে বিস্তৃত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে 'বঙ্গ' জনপদটি গঠিত ছিল যার অন্তর্গত ছিল ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ।[৪]

(খ) পুন্ড্র : পুন্ড্র প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর আরেকটি নিদর্শন। বর্তমান উত্তর বঙ্গের বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর পুন্ড্রের আওতায় ছিল। বগুড়ার মহাস্থানগড় প্রাচীন পুন্ড্র নগরের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে এখনো বিদ্যমান রয়েছে।[৫]

(গ) বরেন্দ্র : এ অঞ্চলটিকে পুন্ড্রের অন্তর্ভুক্ত বলেই ধরা হয়। বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা এবং পাবনার কিছু অংশ প্রাচীন 'বরেন্দ্র'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬]

(ঘ) গৌড় : বর্তমান মুর্শিদাবাদের একটি এলাকা প্রথম গৌড় জেলা নামে পরিচিতি পায় এবং এ থেকে 'গৌড় দেশ' নামের উৎপত্তি হয়। ষষ্ঠ শতকের দিকে এই গৌড় প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সপ্তম শতকে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কর্ণসুবর্ণ গৌড়ের রাজধানীর মর্যাদা পায়। তাছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলি জেলার অংশ বিশেষ গৌড় জনপদের অধীন ছিল। মুসলিম শাসনামলের শুরুর দিকে মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবর্তী গৌড় নামে অভিহিত হত। হিন্দু শাসনামলে বাংলাদেশ গৌড় ও বঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলিম শাসনামলে গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাকেই বুঝানো হত।[৭]

---

৩. উক্ত সভায় তিনি বলেন 'জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ' হইবে।' দ্র. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*(ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২৩

৪. কে. আলী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৩

৫. দিলীপ কুমার সাহা, ড. মোঃ শাহজাহান এবং মোঃ আনারুল হক, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে* ১৯৭১(ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৪১

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

(ঙ) সমতট : বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী সমতট জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রাচীন নাম 'সমতট'। হিউয়েন সাং-এর মতে, সমতট ও বঙ্গ একই। কুমিল্লা জেলার বড় কামতায় ছিল এ জনপদের রাজধানী।[৮]

(চ) চন্দ্রদ্বীপ : চন্দ্রদ্বীপের অবস্থান ছিল বর্তমান বরিশাল জেলায়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অনেক এলাকাও চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৯]

(ছ) হরিকেল : হরিকেল স্থানটি চন্দ্রদ্বীপের সংলগ্ন এলাকা যা ছিল প্রাচ্য অঞ্চলের পূর্ব সীমায় এবং এর বিস্তৃতি শ্রীহট্ট (সিলেট) পর্যন্ত হয়েছিল।[১০]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত অঞ্চলভিত্তিক বঙ্গেও বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন জনপদ নিয়ে বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর জনপদগুলো ধীরে ধীরে একত্রিত হতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে মালদহ, মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে উৎকল পর্যন্ত এলাকা একটি অভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে উক্ত জনপদগুলো বঙ্গের সাথে যুক্ত হয়। অবশেষে বাংলার বিভিন্ন জনপদ পুরনো খণ্ডিত অবস্থার বিলোপ করে একীভূত হয় এবং বঙ্গ নামে পরিচিত হতে থাকে।[১১]

প্রাচীন বাংলার মৌর্য সাম্রাজ্য : খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ভারতবর্ষ রূপান্তরিত হয় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে। এ সময় গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন। বর্তমান উড়িষ্যা তথা তৎকালীন মগধের অত্যাচারী রাজা ধননন্দকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উৎখাত করে মগধের সিংহাসনে বসেন এবং গ্রিকদের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং তাদেরকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেন। তার নামানুসারেই এ যুগের নামকরণ করা হয় 'মৌর্য যুগ'[১২]। মৌর্য বংশের আরেক সম্রাট অশোকের[১৩] মৃত্যুর পর থেকে মৌর্য বংশের আলো ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হতে থাকে। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় এখনো মৌর্য যুগের প্রাচীন নিদর্শন বহন করে।[১৪]

মৌর্য সাম্রাজ্যের পর প্রাচীন যুগের প্রায় ৫০০ বছরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের দিকে গুপ্ত শাসনের[১৫] গোড়াপত্তন হয়। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো গুপ্ত শাসনামল থেকেই ধীরে ধীরে একীভূত হওয়া শুরু করে। গুপ্ত রাজা সমুদ্রগুপ্ত[১৬] বাংলার অধিকাংশ অংশকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

---

৮. কে. আলী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৯. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১০. প্রাগুক্ত।

১১. কে. আলী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১২. 'খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ সালে মৌর্যরা কেন্দ্রীয়ভাবে ভারতবর্ষে শাসন প্রতিষ্ঠা করে।' দ্র. সুকুমার সেন, *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি*(ঢাকা : বাঙলায়ন পাবলিকেশন্স, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ২৫

১৩. 'সম্রাট অশোককে মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২৬৯-২৩২ সাল পর্যন্ত সম্রাট অশোকের শাসনামল বিস্তৃত ছিল। তার শাসনামলে উত্তর বাংলার অনেক বড় একটি অংশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে এসেছিল।' দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৫৫ খি.), খ. ১, পৃ. ১৪

১৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১; মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪৩

১৫. 'খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।' দ্র. R. D. Banarjee, *The Age of the Imperial Guptas*(Varanasi : The Benares Hindu University, 1933 AD), p. ii

১৬. 'সমুদ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান শাসক। তার শাসনামল ৩৪০-৩৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যপ্ত ছিল।' দ্র. ibid, p. 8

করেছিলেন।[১৭] এ সময় বাংলায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এ সময় বাংলা উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত ছিল।[১৮]

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য : ষষ্ঠ শতকের গোঁড়া থেকেই গুপ্ত বংশের দুর্বলতার কারণে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য ও গৌড় রাজ্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণ ও পার্শ্ববর্তী শাসকদের আক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার কারণে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্লান হতে শুরু করে।[১৯]

স্বাধীন গৌড় রাজ্য : বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিপতিত হয়ে গুপ্ত রাজাদের অস্তিত্ব ম্লান হওয়ার প্রাক্কালেই 'শশাঙ্ক'[২০] নামক এক সামন্ত সপ্তম শতকের প্রারম্ভে গৌড় রাজ্যের সার্বভৌমত্ব দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[২১] তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম বাংলার ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যায়।[২২]

মাৎস্যন্যায় : রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে বাংলায় এক অন্ধকার যুগ শুরু হয়।[২৩] এ সময়টা বাংলার ইতিহাসের একটি দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। একাধিকবার বিদেশি আক্রমণের ফলে বাংলার ঐতিহ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বাংলার সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়ে খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নেপালি, তিব্বতিসহ বহু শাসক এ সময় বাংলাকে জোর দখলের চেষ্টা চালায়। ফলে তখন সমগ্র বাংলায় অস্থিরতা বিরাজ করছিল। বড় বড় শক্তিশালী রাজাদের অত্যাচারে অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল অঞ্চলগুলো অতিষ্ঠ ছিল। এ সময়ের অবস্থাকে বিবেচনা করেই ইতিহাসে এ যুগকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়।[২৪] এ সময় বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই বিপর্যস্ত হয় যে, সমকালীন রৌপ্য মুদ্রার সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পায়। বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যও মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

পাল যুগ : অষ্টম শতকে বাংলায় পালবংশের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ, পালযুগের সূত্রপাতের মাধ্যমেই একটি ধ্বংসপ্রায় অঞ্চল পুনরুজ্জীবিত হওয়ার আশ্বাস পায়। পাল বংশীয় প্রথম রাজা হিসেবে গোপালের আবির্ভাব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া অঞ্চলকে পুনরায় জাগ্রত

---

১৭. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

১৯. কে. আলী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২০. 'রাজা শশাঙ্ক ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত বংশের অধিকৃত রাজ্য দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য গড়ে তোলেন। উত্তর ও পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তার রাজত্ব ছিল। তাছাড়া মগধ, উৎকল ও উত্তর উড়িষ্যাও তিনি দখল করেছিলেন। প্রথম জীবনে সামন্তরাজা থাকলেও পরবর্তীতে স্বাধীন গৌড় রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।' দ্র. আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(ঢাকা : ইডেন প্রেস, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ১৮

২১. কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*(ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৫৪

২২. 'ঐতিহাসিকগণের মতে, রাজা শশাঙ্কই ছিলেন বাঙালি রাজাগণের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম রাজা। বাংলাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পিছনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শশাঙ্কের রাজ্যনীতি বাংলার পরবর্তী শাসক বংশের জন্যও অনুকরণীয় হয়ে ছিল। বাংলাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসেবে কল্পনা করার সাহসও কারো হয়নি। কিন্তু রাজা শশাঙ্ক তা প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই সাথে এ অঞ্চলের অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধশালী করেছেন। বাংলাকে সার্বভৌম রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠা ও তৎকালীন উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলাকে তুলে ধরার কৃতিত্বস্বরূপ শশাঙ্ককে বাংলার প্রথম 'জাতীয় রাজা' বলে গণ্য করা হয়।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২৪. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪৩

করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। আনুমানিক ৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোপাল[২৫] রাজ্য শাসন করেন। তার মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে তার পুত্র ধর্মপাল[২৬], দেবপালসহ[২৭] আরও অনেকে রাজ্য শাসন করেন।[২৮] কিন্তু এ সময় রাজ্য শাসনের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। কারণ ক্রমশ পাল বংশের শাসকগণ দুর্বল হতে শুরু করেন।

শাসকদের দুর্বলতাকে পাশ কাটিয়ে রাজ্যের শাসনভার নতুন করে কাঁধে তুলে নেন রাজা প্রথম মহীপাল।[২৯] ধর্মপরায়ণতা ও জনহিতকর কাজের মাধ্যমে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন প্রথম মহীপাল। প্রথম মহীপালের মৃত্যুর পর পালবংশ আবার দুর্বল হয়ে পড়ে।[৩০] প্রথম মহীপালের উত্তরসূরি ছিলেন দ্বিতীয় মহীপাল[৩১], রামপাল[৩২] প্রমুখ। কিন্তু তারা কেউই প্রথম মহীপালের মত সফল ছিলেন না। তাদের যোগ্যতার অভাব, উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, ছোট ছোট স্বাধীন রাজবংশ (যেমন– দেব বংশ[৩৩], চন্দ্ররাজ বংশ[৩৪], খড়্গ বংশ[৩৫], বর্ম রাজবংশ[৩৬]) প্রভৃতির উদ্ভব, বহিঃশত্রুর আক্রমণের কারণে অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি কারণ পাল বংশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। রাজা দেবপালের দুর্বল উত্তরাধিকারীর সময় হতেই বৈদেশিক আক্রমণ ও লুণ্ঠন নিয়মিত হয়ে পড়ে। পাল শাসনের উপর সর্বশেষ কুঠারাঘাত হানে সামন্ত বিজয় সেন যার ফলে বাংলায় সেন শাসনের পত্তন হয়। দীর্ঘ ৪০০ বছরের পাল বংশের ইতিহাসের যবনিকা টানেন রাজা বল্লাল সেন। তিনি পাল বংশের শেষ রাজা গোবিন্দ পালকে পরাজিত করেন।[৩৭]

সেন শাসন : সেন শাসন বাংলার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ এটিই বাংলার প্রাচীন যুগের সর্বশেষ শাসনকাল। সেনগণ বাংলায় আসেন দক্ষিণের কর্ণাট থেকে এবং পাল রাজাদের অধীনে কাজ শুরু করেন। কিন্তু পালদের দুর্বলতার সুযোগে রাজ্যের শাসনভার নিজেদের হাতে নেন।

---

২৫. 'গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তার দ্বারা পাল বংশের শাসনের গোড়াপত্তন হয়।' দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৬. 'ধর্মপালের শাসনকাল আনুমানিক ৭৮১-৮২১ খ্রি. পর্যন্ত। তিনি উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশ নিতে সফল হন।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২৭. 'দেবপালের শাসনকাল আনুমানিক ৮২১-৮৬১ খ্রি. পর্যন্ত। তিনি ধর্মপালের পুত্র। তার সময়েও পাল সাম্রাজ্যের গৌরব অটুট ছিল।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২৮. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল-১৯৭১ সাল পর্যন্ত*, পৃ. ৪৬

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৩০. প্রথম মহীপালের শাসনকাল আনুমানিক ৯৯৫-১০৪৩ খ্রি. পর্যন্ত ছিল। দ্র. Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Benga* (Dhaka : The Asiatic Society of Pakistan, 1965 AD), p. 16; মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল-১৯৭১ সাল পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৩১. 'দ্বিতীয় মহীপাল আনুমানিক ১০৭৫-১০৮০ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেন।' দ্র. Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal,* ibid, p. 20

৩২. 'রামপালের শাসনামল আনুমানিক ১০৮২-১১২৪ খ্রি.। রামপালের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পাল সাম্রাজ্যের গৌরব আর ধরে রাখতে সক্ষম হননি।' দ্র. ibid, p. 21

৩৩. 'বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে দেব রাজবংশের পত্তন হয়। ৭৫০-৮০০ খ্রি.-এর মধ্যবর্তী সময়ে দেব রাজবংশের শাসকগণ শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হন।' দ্র. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*(কলকাতা : জোনাকি প্রেস, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ১৯১

৩৪. 'দশম শতকের গোড়ার দিকে চন্দ্র রাজবংশের আবির্ভাব হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ছিল এ রাজবংশের শাসন ও প্রভাব প্রতিপত্তি। বর্তমান ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ ও বিক্রমপুরে ছিল চন্দ্র রাজবংশের রাজধানী।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩৫. 'সপ্তম শতকের দিকে খড়্গ রাজবংশের উত্থান ঘটে।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩৬. 'এগার শতকের শেষাংশে বর্ম রাজবংশের উত্থান ঘটে। ১০৮০-১১৫০ খ্রি. পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্ম রাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল।' দ্র. প্রাগুক্ত।

৩৭. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল-১৯৭১ সাল পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম শাসনামল শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা শাসন করেন।[৩৮] সামন্ত সেন[৩৯], হেমন্ত সেন[৪০], বিজয় সেন[৪১], বল্লাল সেন[৪২], লক্ষ্মণ সেন[৪৩] প্রমুখ ছিলেন এ বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক। বিজয়সেন ও বল্লাল সেনের শাসনকাল সেন আমলের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাদের সময় রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হয়। বল্লাল সেন নিজের পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা নিয়ে আসেন। সেন বংশের সর্বশেষ শাসক লক্ষ্মণ সেন। তার সময়ে এভাবেই বাংলায় প্রাচীন যুগের যবনিকাপাত হয় এবং মুসলিম শাসনের মাধ্যমে মধ্যযুগের সূচনা ঘটে।[৪৪]

বাংলার মধ্যযুগ : ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মাদ বখতিয়ার খলজির[৪৫] বাংলা বিজয় ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। তিনি ছিলেন দিল্লির সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের বিশ্বস্ত সেনাপতি। বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের ফলে বাংলায় মুসলিম শাসনের আধিপত্য শুরু হয়। আফগান বংশোদ্ভূত সুলতান মুহাম্মদ ঘুরির[৪৬] প্রতিনিধি হিসেবে কুতুব উদ্দিন আইবেক[৪৭] উত্তর ভারতের অধিকৃত অঞ্চলগুলো একত্রিত করে মুসলিম শাসন কায়েম করতে চান। সে উদ্দেশ্যে তিনি বখতিয়ার খলজিকে বাংলা ও বিহার দখল করতে পাঠান।[৪৮] বিহারকে কেন্দ্রস্থল হিসেবে ধরে বখতিয়ার সেন রাজ্য আক্রমণ করেন। তার অতর্কিতে আক্রমণের ফলে রাজা লক্ষ্মণ সেন তৎকালীন রাজধানী নদীয়া থেকে পালিয়ে যান এবং খুব সহজেই বখতিয়ার খলজি বাংলা অধিকার করতে সক্ষম হন। বখতিয়ার খলজির অভিযানের ফলে বাংলা ও বিহার ঘুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক শাসন শুরু হয় যা ইতিহাসে বড় একটি অধ্যায় হিসেবে স্থান পেয়েছে।

মুসলিমগণের আনাগোনা বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণের বহু পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু শাসক হিসেবে মুসলিমগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয় বখতিয়ার খলজির মাধ্যমেই।[৪৯] বখতিয়ার খলজির

---

৩৮. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৩৯. 'সামন্ত সেনের কোন পূর্বসূরির খোঁজ পাওয়া যায় না। তবে কর্ণাট দেশে যুদ্ধে যশোলাভ এবং বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে বসবাস ব্যতীত রাজনৈতিক কোন ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় না। সুতরাং, সামন্ত সেনকেই সেন বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ধরে নেয়া যায়।' দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৪০. 'হেমন্ত সেন সামন্ত সেনের পুত্র। বিজয় সেন তার লিপিতে হেমন্ত সেনকে 'মহারাজাধিরাজ' বলে অভিহিত করেছেন।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৪১. 'বিজয় সেন হেমন্ত সেনের পুত্র। বিজয় সেনের দ্বারাই গৌড় ও বঙ্গ জনপদে সেন শাসনের সুত্রপাত হয়। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ থেকে বর্ম রাজাদের উৎখাত করেন। পরবর্তীতে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ থেকে পাল রাজাদের উৎখাত করে বঙ্গের বিশাল অঞ্চল নিজের আয়ত্তে আনেন। উত্তর বিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও বিজয় সেনের অধীনে ছিল। ১০৯৮-১১৬০ খ্রি. পর্যন্ত বিজয় সেনের শাসনামল বিস্তৃত ছিল।' দ্র. প্রাগুক্ত।

৪২. 'বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন। ১১৬০-১১৭৮ খ্রি. পর্যন্ত তার শাসনামল বিস্তৃত ছিল।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৪৩. 'বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের শাসনামলে সেন বংশের গৌরব সর্বাধিক ছিল।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৪৪. মাহবুবুর রহমান; *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল-১৯৭১ সাল পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৪৫. 'ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২৩৪ খ্রি. লক্ষ্মণ সেনের অস্থায়ী রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের দুর্বলতার সুযোগে মুসলিমগণ এ অঞ্চলের শাসনভার হাতে তুলে নেন এবং সেন বংশকে উচ্ছেদ করেন।' See. J.N. Sarkar, *The History of Bengal : Muslim Period [1200-1757 AD]*(Delhi : B.R. Publishing Corporation, 2003 AD), p. 30

৪৬. 'ভারতে মুহাম্মদ ঘুরীর প্রধান অনুচর ও উত্তরাধিকারী ছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবেক। তুর্কিস্তানের 'আইবেক' উপজাতি বংশে তার জন্ম। ১১৯২-১২০৬ খ্রি.-এর মধ্যে তিনি মিরাট, দিল্লি, বারানসি দখল করেন। ১১৯৭-৯৮ খ্রি.-এর মধ্যে কনৌজ ও কালিঞ্জরও দখল করেন।' দ্র. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৪৭. 'প্রকৃত নাম মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ। তিনি শিহাবউদ্দিন ঘুরী নামেও পরিচিত। আফগান বংশোদ্ভূত সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৩ খ্রি. গজনির শাসনভার লাভ করেন। তিনি গজনি থেকেই ভারতে অভিযান পরিচালনা শুরু করেন। ১২০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৪৮. মোহাম্মদ নূরনবী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

বাংলা জয়ের পর বহু সুফি-সাধকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইসলামের প্রসার লাভ হয়। এছাড়া বখতিয়ার খলজি নিজেও ইসলাম প্রচার ও ইসলামি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন।[৫০]

খলজি মালিকদের অধীনে বাংলা : বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর তার সহচরদের সিংহাসন দখলের চিন্তা তাদের মধ্যে এক মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। কারণ, সহচরদের সকলেই মসনদে নিজেদের অধিকার দাবি করে। ১২০৬ থেকে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি খলজি মালিকদের অন্তর্বিরোধের ইতিহাস বহন করে।[৫১] বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর খলজি মালিকদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজি[৫২] শাসনভার গ্রহণ করেন। খলজি মালিকদের অন্তর্বিরোধের কারণে বাংলার প্রশাসনিক অবস্থার যে অবনতি হয়েছিল তিনি তা মেরামতে সক্ষম হন। তিনি নদীমাতৃক বাংলায় রাজ্য সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন।[৫৩] তবে দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশ[৫৪] গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজির এ রাজ্যের প্রতিপত্তিকে সুনজরে দেখেননি। ১২২৫ এবং ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে পরপর দু'বার আক্রমণের ফলে গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজি পরাজিত ও নিহত হন।[৫৫] এভাবে বাংলা দিল্লির শাসনস্থ একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

বাংলায় তুর্কি শাসন : ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ[৫৬] গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজিকে পরাজিত করে বাংলা অধিকার করেন। কিন্তু এ সময়ে কেন্দ্রীয় শাসন দিল্লিতে হওয়ায় বাংলার শাসনকার্য সুচারুরূপে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। বিহার, অযোধ্যা, কনৌজ প্রভৃতি প্রতিবেশী প্রদেশের শাসকরা বাংলাকে নিজেদের অধিকারে নিতে চাচ্ছিল। ফলে বাংলার শাসনকার্য বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়। ১২২৭ থেকে ১২৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট পনেরজন মুসলিম শাসনকর্তা বাংলার মুসলিম রাজ্য শাসন করেন। এদের মধ্যে দশজনই ছিলেন মামলুক বা দাস এবং স্বীয় যোগ্যতায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বখতিয়ার খলজি নদীয়া বিজয়ের পর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করলেও অমুসলিমদের কোন ক্ষতি করেননি। তাই মুসলিম শাসকদের প্রতি অমুসলিম অধিবাসীদের পূর্ণ আস্থা গড়ে উঠেছিল।[৫৭]

বাংলায় বলবন শাসন : সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের[৫৮] দিল্লিতে সিংহাসন আরোহণ করার ফলে বাংলায়ও বলবন শাসন আরম্ভ হয়। এর ফলে শাসনকার্যেও শৌর্য-বীর্য ফিরে আসে। গিয়াস উদ্দিন

---

৫০. মোহাম্মদ নূরনবী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে* ১৯৭১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৫১. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ. বি. এম. মাহমুদ এবং সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৫২. 'সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি মাত্র পনেরো বছর শাসন করেন। তিনি সুলতান ইলতুৎমিশের আক্রোশের শিকার হন এবং ১২২৭ খ্রি. সুলতান নাসিরুদ্দিনের যুদ্ধাভিযানের ফলস্বরূপ তিনি আটক ও নিহত হন।' দ্র. সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী*(কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৫ খ্রি.), পৃ. ২

৫৩. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে* ১৯৭১ *পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৫৪. 'সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন ইলকরি তুর্কি বংশোদ্ভূত। তিনি কুতুবুদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন। ১২১১ খ্রি. দিল্লির সুলতান হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাকেই দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। কারণ, মঙ্গলদের ভারত আক্রমণ, পশ্চিম সীমান্তে কর্তৃত্ব সুরক্ষা, বাংলায় বিদ্রোহ দমন, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে অভিযান, খলিফার সনদ লাভ, শাসন সংগঠন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তার সাফল্যময় অবদান রয়েছে।' দ্র. আব্বাস আলী খান, *বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২১

৫৫. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে* ১৯৭১ *পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৫৬. সুলতান ইলতুৎমিশের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। ১২৬৬ খ্রি. তার মৃত্যু হয়।' দ্র. আব্বাস আলী খান, *বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রগুক্ত, পৃ. ২১

৫৭. কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৫৮. সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৬৬ থেকে ১২৮৬ খ্রি. পর্যন্ত দিল্লির সুলতান হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেন। বলবনের সাফল্যের কারণেই দিল্লির মুসলিম সালতানাত নতুন করে জাগ্রত হয়।' দ্র. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

বলবন বাংলার বিদ্রোহী শাসককে উৎখাত করে নিজ পুত্র বুঘরা খানকে সিংহাসনে বসান। এ সময় বাংলার শাসনকার্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।[৫৯] এ যুগে সমগ্র বাংলা তিনটি অংশে বিভক্ত হয়– লখনৌতি[৬০], সাতগাঁও[৬১] ও সোনারগাঁও[৬২]।[৬৩] এ সময় ইসলামি শাসনব্যবস্থা অভাবনীয় বিস্তার লাভ করেছিল। অমুসলিমদের সাথে সম্প্রীতি সৃষ্টির ফলে তারাও সরল মনেই ইসলামি শাসনব্যবস্থা মেনে নিতে থাকে। হিন্দু ও মুসলিম উভয়পক্ষের জন্যই মসজিদ, দরগা ও ধর্মীয় উপাসনালয় গড়ে উঠে। এভাবে মুসলিম রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েও ধর্মীয় সম্প্রীতি বহাল থাকে।[৬৪]

ইলিয়াস শাহি শাসন : সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ[৬৫] ছিলেন সমগ্র বাংলার একচ্ছত্র স্বাধীন সুলতান।[৬৬] ইলিয়াস শাহ বাংলাকে স্বাধীন সাম্রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর একে একে সাতগাঁও, নেপাল, সোনারগাঁও, উড়িষ্যায় অভিযান চালান। এক পর্যায়ে দিল্লির সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ চম্পায়ন, গোরক্ষপুর ও কাশী বিজয় করেন।[৬৭] এর ফলে দিল্লির সিংহাসনের অধিপতি ফিরোজ শাহ তুঘলক[৬৮] ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও ফিরোজ শাহ তুঘলক ব্যর্থ হন ও অবশেষে ইলিয়াস শাহের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন।[৬৯] সিকান্দর শাহ[৭০], গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ[৭১] এ যুগের অন্যান্য শাসকবৃন্দ। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ ছিলেন ধর্মপ্রাণ শাসক। সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করে তিনি কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয়ও দেন।[৭২]

রাজা গণেশ : বাংলার ৫০০ বছরের মুসলিম শাসনের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে পনের খ্রিস্টাব্দে রাজা গণেশ নামক একজন হিন্দু শাসকের আবির্ভাব হয়।[৭৩] তার ষড়যন্ত্রের ফলে ইলিয়াস শাহি বংশের কয়েকজন সুলতান নিহত হন। মুসলিমদের উপর তার মারাত্মক বিদ্বেষ ছিল। বহু মুসলিম দরবেশকে তিনি হত্যা করেন। দরবেশদের নেতা নূর কুতুব আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে বাংলা আক্রমণের আহ্বান জানালে ইব্রাহিম শর্কি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হন। ফলে রাজা গণেশ নতি

---

৫৯. কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৬০. 'লখনৌতি তৎকালীন সময়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল।' দ্র. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৬১. 'সাতগাঁও তৎকালীন সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার শাসন কেন্দ্র ছিল।' দ্র. প্রাগুক্ত।

৬২. 'সোনারগাঁও তৎকালীন সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল।' দ্র. প্রাগুক্ত।

৬৩. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

৬৪. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৬৫. '১৩৪২ খ্রি. সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার অধিপতি হন। সে সময় এ অঞ্চলের রাজধানী ফিরোজাবাদে ছিল। ১৩৫৮ খ্রি. তার মৃত্যু হয়।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৬৮. '১৩৫৩ খ্রি. ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেন। তবে তিনি ইলিয়াস শাহকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পারেননি।' দ্র. প্রাগুক্ত।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৭০. 'সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পুত্র সুলতান সিকান্দার শাহ। তিনি শিল্পানুরাগী ছিলেন। ১৩৫৮-১৩৯৩ খ্রি. পর্যন্ত তার শাসনামলের প্রমাণ পাওয়া যায়।' দ্র. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

৭১. 'সুলতান সিকান্দার শাহের পুত্র সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। ১৩৯৩-১৪১১ খ্রি. পর্যন্ত তার রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

৭২. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৭৩. 'প্রায় ত্রিশ বছরকাল ছিল রাজা গনেশ ও তার উত্তরসূরিদের শাসনকাল।' দ্র. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

স্বীকার করেন। আপোষের শর্তানুযায়ী রাজা গণেশের পুত্র যদু ধর্মান্তরিত হয়ে জালাল উদ্দিন মাহমুদ[৭৪] নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন।[৭৫]

মাহমুদ শাহি শাসন : রাজা গণেশ কর্তৃক ইলিয়াস শাহি বংশ উৎখাতের পর ইলিয়াস শাহি বংশের এক উত্তরসূরি সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ[৭৬] রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। সিংহাসনের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। দরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জোর করে তাকে সিংহাসনে বসান।[৭৭] তার সময়েই খান জাহান আলি ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে খুলনার বাগেরহাট বিজয় করে মুসলিম সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। তার শাসনামলে বাংলায় কোন অরাজকতার ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি অসংখ্য মসজিদ, খানকাহ, মাদরাসা নির্মাণ করে মুসলিম সাম্রাজ্যের পুরনো জৌলুস ফিরিয়ে আনেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র রুকন উদ্দিন বরবক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথম হাবশি ক্রীতদাস আমদানি করে সৈন্য বাহিনীতে নিয়োগ দেন। এ হাবশিরাই মাহমুদ শাহি বংশের শেষ শাসক সুলতান জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহকে হত্যা করে।[৭৮]

হাবশি শাসন : বাংলার ইতিহাসে হাবশি শাসন একটি অন্ধকার অধ্যায়।[৭৯] রুকন উদ্দিন বরবক শাহ[৮০] হাবশিদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দান করেন। কিন্তু ক্রমেই তারা এত ক্ষমতা লোভী হয়ে উঠে যে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহকে[৮১] হত্যা করে শাসনভার গ্রহণ করে। হাবশি বংশের শেষ সুলতান শামস উদ্দিন মুজাফফর শাহ।[৮২]

হোসেন শাহি শাসন : হাবশি সুলতান মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন হুসেন শাহ[৮৩] হোসেন শাহি যুগের শুরু করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই অভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা স্থাপনে সচেষ্ট হন।

---

৭৪. '১৪১৮-১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি রাজধানী পান্ডুয়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তর করেন। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণাত্যের বৃহৎ অংশ তার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।' দ্র. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস : *মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি.]*(ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৭৯

৭৫. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৭৬. 'সুলতান নাসিরুদ্দিন শাহের সময় শাসনকাল ১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি. পর্যন্ত। এ সময় বাংলায় মুসলিম সামরিক শক্তির সঞ্চার হয়েছিল। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও উদার শাসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ তার অধীনে ছিল। পশ্চিমে ভাগলপুর, পূর্বে ফরিদপুর, উত্তরে গৌড় পান্ডুয়া এবং দক্ষিণে ত্রিবেণী পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।' দ্র. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ*(কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ৫৬

৭৭. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬

৭৯. হাবশি শাসন ১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হাবশি শাসনকাল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি কাল অধ্যায়। ছয় বছর হাবশি শাসনকালে মোট চারজন শাসক– বরবক শাহ, মালিক আন্দিল, দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ ও শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।' দ্র. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৮০. 'সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহ সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের পুত্র। পিতার রাজত্বকালে তিনি সাতগাঁওয়ের শাসক হিসেবে সফলতা প্রদর্শন করেন। তার সময়ে হাবশি শাসকগণ বেশ প্রাধান্য লাভ করেন। ১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি. পর্যন্ত তার শাসনামল বিস্তৃত ছিল।'দ্র. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৮১. 'সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ ১৪৮১-১৪৮৬ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেন।' দ্র. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*(কলকাতা : ভারতী বুক স্টল, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ২১৬

৮২. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৮৩. '১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি. পর্যন্ত আলাউদ্দিন হুসেন শাহ রাজত্ব করেন। তার সুশাসনের কারণে তাকে বাংলার মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে গণ্য করা হয়।' দ্র. J.N. Sarkar, *The History of Bengal : Muslim Period [1200-1757 AD]*(Delhi : B.R. Publishing Corporation, 2003 AD), p. 142

হাবশিদের বিতাড়িত করে তিনি সে স্থলে মুঘল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ দেন। হোসেন শাহি যুগে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধন হয়।[৮৪]

সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয় : সম্রাট আকবরের[৮৫] বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয়। বাংলায় তৎকালীন কররানি শাসক দাউদ খান[৮৬] প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। এর পরিণতি হিসেবে সম্রাট আকবর বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন।[৮৭] সম্রাট জাহাঙ্গিরের[৮৮] সময় বাংলা সম্পূর্ণরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে উত্তর ভারতের সাথে বাংলার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাংলায় সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। মুঘলদের বাংলায় আগমনের ফলে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলার যে সংযোগ স্থাপিত হয় তা পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলার ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করে।[৮৯]

বাংলার বার ভূঁইয়া : সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হলেও বাংলার পরাক্রমশালী কিছু জমিদার মুঘলদের এ শাসন মেনে নেয়নি। এরা ছিল শক্তিশালী। এদের নিজস্ব সেনাবাহিনী ও নৌবহর ছিল। এরা সম্মিলিতভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বাংলার ইতিহাসে এরাই 'বার ভূঁইয়া' নামে খ্যাত। বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশা খাঁ[৯০] ও তার পুত্র মুসা খাঁ[৯১]। তারা বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন।[৯২] এছাড়া ফতেহ খান, ইবরাহিম মোড়ল, প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, শামস খান বিশাল জমিদারি স্থাপন করেন।[৯৩]

বাংলার সুবাদারগণ : বার ভূঁইয়াদের দমন করার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গির ইসলাম খান চিশতিকে[৯৪] সুবাদার নিয়োগ করে বাংলায় পাঠান। যুদ্ধে সুনিপুণ কৌশল ও বিচক্ষণতা কাজে লাগিয়ে ইসলাম খান

---

৮৪. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৮৫. 'সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রি. দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হলেও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট আকবর। আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মুঘল সাম্রাজ্য কেবল পাঞ্জাব, আগ্রা ও দিল্লির মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্রাট আকবর মুঘল সাম্রাজ্য বাংলায়ও বিস্তৃত করেন।' দ্র. J.N. Sarkar, *The History of Bengal : Muslim Period [1200-1757 AD]*, ibid, p. 188

৮৬. '১৫৭২-১৫৭৬ খ্রি. পর্যন্ত দাউদ খান বাংলা শাসন করেন।' দ্র. J.N. Sarkar, *The History of Bengal : Muslim Period [1200-1757 AD]*, ibid, p. 189

৮৭. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৮৮. '১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। ১৬০৫ খ্রি. আকবরের মৃত্যুর পর 'নুরুদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর' নামধারণ করে ৩৬ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন।' দ্র. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৮৯. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৯০. 'ঈশা খাঁ ছিলেন সোনারগাঁওয়ের জমিদার। তার বাংলো বাড়ি কিশোরগঞ্জে অবস্থিত। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার তৎকালীন জমিদার কুইচ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে বাড়িটি নির্মাণ করেন। ঈশা খাঁর জন্ম ১৫২৯ খ্রি. ও মৃত্যু ১৫৯৯ খ্রি.।' দ্র. এ.এন.এম. নূরুল হোক, *ঈশা খাঁ*(ঢাকা : ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৯৫

৯১. 'মুসা খাঁ ছিলেন ঈশা খাঁর পুত্র। জন্ম ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দে ও মৃত্যু ১৬২৪ খ্রি.। বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা জেলার অর্ধেক, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা, রংপুর, বগুড়া, পাবনা জেলার কিছু অংশ তার দখলে ছিল। ১৬০২ খ্রি. নৌপথের যুদ্ধে রাজা মানসিংহের কাছে মুসা খাঁ পরাজিত হলেও তিনি মানসিংহের কাছে মাথা নত করেননি। সোনারগাঁওয়ের পাশাপাশি খিজিরপুর, কদমরসুল, যাত্রাপুর, ডাকচর, শ্রীপুর ও বিক্রমপুরেও তার সামরিক ঘাঁটি ছিল।' দ্র. A.F. Salahuddin Ahmed, *Bangladesh: Past and Present*(New Delhi : A.P.H. Publishing Corporation, 2004 AD), p. 64

৯২. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৯৩. 'ফতেহ খান সিলেটের দক্ষিণাঞ্চলের, ইব্রাহিম মোড়ল কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের, প্রতাপাদিত্য যশোরের, চাঁদ রায় বিক্রমপুরের ও শামস খান বীরভূমের জমিদার ছিলেন।' দ্র. কমল চৌধুরী, *বাংলার বারো ভূঁইয়া ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৪৪

৯৪. 'সুবাদার ইসলাম খান চিশতি ১৬০৯ খ্রি. মুসা খাঁর দুর্গ আক্রমণ করেন। মুসা খাঁ পরাজিত হন। তিনি ১৬১০ খ্রি. ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। জমিদারি শক্তিকে ভূলুণ্ঠিত করে সমগ্র বাংলায় মুঘল

বার ভূঁইয়াদের দাপট নষ্ট করতে সক্ষম হন। তিনি তার বিচক্ষণতার সাহায্যে বার ভূঁইয়াদের একতা নষ্ট করেন। ফলে তাদের দমন করা সহজ হয়। বার ভূঁইয়াদের তৎকালীন নেতা মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ফলে অন্যান্য বার ভূঁইয়ারা নিজেরাই দুর্বল হয়ে নতি স্বীকার করে। ফলে মাত্র চার বছরে বিশাল বাংলায় মুঘল শাসন কায়েম হয় যা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় সফল হয়নি।[৯৫]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের[৯৬] সময় ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর জুমলা[৯৭] বাংলার সুবাদার নিয়োজিত হন। মাত্র তিন বছর তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। পর্তুগিজ দস্যুদের হাত থেকে তিনি বাংলাকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি প্রশাসনিক কাজকে বেশ দক্ষতার সাথে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। রাজধানী তৎকালীন রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। জনসাধারণের কল্যাণে বহু পদক্ষেপ নেন ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন।[৯৮]

মীর জুমলার মৃত্যুর পর সুবাদার শায়েস্তা খান[৯৯] বাংলার শাসন কাজে নিয়োজিত হন। তিনি দুই দফায় দীর্ঘ ২২ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। তখন চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অধীনে ছিল। তিনি চট্টগ্রাম থেকে মগ দস্যুদের বিতাড়িত করেন ও চট্টগ্রাম জয় করেন। শায়েস্তা খাঁর সুবাদারি আমল বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময় ছিল। এসময় বাংলার প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সফলতা লক্ষ করা যায়। তার সময়ে নির্মিত স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে বড় কাটরা, ছোট কাটরা, লালবাগের কেল্লা, পরি বিবির মাজার, হুসনি দালান, চক মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১০০]

বাংলার নবাবি শাসন : মুর্শিদকুলি খানের[১০১] সময় বাংলায় নবাবি আমলের সূত্রপাত হয়। তিনি মুঘল প্রথা ভেঙ্গে সুবেদারি ও দেওয়ানি এক হাতে গ্রহণ করেন। নবাবি আমল শুরুর আগে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সুষ্ঠু ছিল না। নবাবি আমল থেকেই রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজকর্মের অগ্রগতি সাধিত হয়।[১০২]

শাসন প্রতিষ্ঠা তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। দ্র. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি.]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৯৫. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৯৬. 'মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র। ১৬৫৮ খ্রি. ধর্মাট ও সামুগড়ের উত্তরাধিকারের যুদ্ধে জয়ী হয়ে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। আগ্রা জয় করে নিজেকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা দেন। খাজওয়া ও দেওয়াই যুদ্ধে আরেক ভাই দারাকে পরাজিত করে ১৬৫৯ খ্রি. দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার উপাধি ছিল 'আলমগীর বাদশাহ গাজী'। ১৭০৭ খ্রি. তিনি মৃত্যুবরণ করেন।' দ্র. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস [৭১২-১৯৭১ খ্রি.]*(ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২২২

৯৭. 'মির জুমলা বাংলায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধি ছিলেন। মীর জুমলার জন্ম ১৫৯১ সালে এবং মৃত্যু ১৬৬৩ সালে। তার উপাধি ছিল মু'আজম খান, খান-ই-খানন, সিপাহ সালার এবং ইয়ার-ই-বাফাদার। মুঘল আমলে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি সাফল্যময় ভূমিকা পালন করছিলেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্তনীতি মীর জুমলার শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।' দ্র. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*(ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনালয়, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৮০

৯৮. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

৯৯. 'শায়েস্তা খান সম্পর্কের দিক হতে আওরঙ্গজেবের মামা এবং মমতাজ মহলের ভাই। শায়েস্তা খানের শাসনকাল প্রথম দফায় ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৮ খ্রি. পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১৬৭৯ থেকে ১৬৮৮ খ্রি. পর্যন্ত।' দ্র. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি.]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

১০০. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

১০১. 'মুর্শিদকুলি খানের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ হাদি। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। এর পূর্বে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে উড়িষ্যার দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি উড়িষ্যার নায়েব সুবেদারি এবং পরবর্তী বছর বিহারের দিওয়ানি লাভ করেন।' দ্র. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি.]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

১০২. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর সুজাউদ্দিন খান[১০৩] ও তারপর সরফরাজ খান[১০৪] নবাবি লাভ করেন। কিন্তু সরফরাজ খান যোগ্য শাসক না হওয়ায় ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে তাকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে আলিবর্দি খান[১০৫] নবাবি লাভ করেন। এ সময় বারবার মারাঠাদের আক্রমণে জনজীবন অতিষ্ঠ ছিল। প্রায় দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টার পর তিনি মারাঠাদের দমন করতে সফল হন। আলিবর্দি খান ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে আফগান বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারান। তার মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা[১০৬] নবাবি লাভ করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজদের সাথে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ বিরোধের পরিণতি হিসেবে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। পলাশির যুদ্ধের ফলেই বাংলা সুদীর্ঘ কালের জন্য স্বাধীনতা হারায় ও দক্ষিণ এশিয়ার ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলার আধুনিক যুগ : বাংলার ধন সম্পদ ঐশ্বর্যের কথা সুদূর ইউরোপেও প্রচারিত ছিল। মুঘল আমল পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ইউরোপিয় সামুদ্রিক ব্যবসায়ী জাতি বাংলায় পদচিহ্ন রাখে, যাদের মধ্যে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ এবং ইংরেজরা প্রধান।[১০৭] ওলন্দাজ এবং পর্তুগিজরা স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে অবস্থান করলেও ইংরেজদের আধিপত্য ছিল সুদীর্ঘ দুইশ' বছর। মূলত ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমেই বাংলায় আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

ইংরেজ আমলের সূচনা : নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে মীর জাফর[১০৮] ইংরেজদের সাথে গোপন চুক্তি সম্পন্ন করে। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এবং বর্ধমান, মেদিনিপুর ও চট্টগ্রাম– এ তিনটি জেলার রাজস্ব ইংরেজদের দিয়ে দেন। এরপর মীর কাশিমের[১০৯] সাথে ইংরেজদের বিরোধ বাঁধলে সে সুযোগে পুনরায় মীর জাফর ইংরেজদের সাথে হাত মিলায়। ইংরেজদের নীতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় বাংলার নবাব ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ১২ হাজার পদাতিকের বেশি সৈন্য রাখতে পারবে না। এতে মূল সামরিক শক্তি ইংরেজদের হাতেই ন্যস্ত থাকে। তাতে নবাবদের পক্ষে ইংরেজদের বিরোধিতা করার কোন সুযোগই অবশিষ্ট থাকেনি।

---

১০৩. 'সুজাউদ্দিন খান ছিলেন মুর্শিদকুলি খানের জামাতা। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্ষমতা হাতে নেন। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন।' দ্র. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি.]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

১০৪. 'সরফরাজ খান সুজাউদ্দিন খানের পুত্র। সুজাউদ্দিন খানের মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদের ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ১ বছর ক্ষমতায় ছিলেন।' দ্র. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি.]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

১০৫. 'আলিবর্দি খানের প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলি। মির্জা মুহম্মদ আলি জাতিতে তুর্কি এবং শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। সুজাউদ্দিন খানের ক্ষমতাকালীন সময়ে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে মির্জা মুহম্মদ আলি রাজমহলের ফৌজদারি লাভ করেন এবং আলিবর্দি খান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।' দ্র. ড. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

১০৬. 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন। সমরনীতি, শাসন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকেই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। একদিকে তিনি যেমন পরিবারের সদস্যগণের একাংশের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হন তেমনি অন্য দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথেও বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে পলাশির যুদ্ধে তিনি পরাজিত এবং নিহত হন।' দ্র. J.N. Sarker, *The History of Bengal : Muslim Period [1200-1757AD]*, ibid, p. 468

১০৭. দিলীপ কুমার সাহা ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

১০৮. 'মীর জাফর ছিল নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি।' দ্র. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

১০৯. 'মীর কাশিম ছিলেন মিরজাফরের জামাতা।' দ্র. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব মীর জাফরের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র নাজিম-উদ-দৌলাকে ইংরেজগণ নবাব করেন। তবে সিদ্ধান্ত হয় তিনি নামেমাত্র নবাব থাকবেন। আর শাসন পরিচালনার জন্য নায়েব থাকবেন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম[১১০] এ বছরেই ইংরেজদের হাতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি নিযুক্ত করেন। সমগ্র দেশের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইংজেরদের হাতে ন্যস্ত হয়। ইংরেজদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবাব নির্ধারিত বৃত্তি লাভ করে রাজস্ব থেকে রাজ্যের ব্যয়ভার বহনের জন্য। বাকি টাকা ইংরেজরা নিজেরা খরচ করবে। এতে অর্থনৈতিক শক্তিও ইংরেজদের হাতে চলে যায়।[১১১]

দ্বৈত শাসনের[১১২] ফলে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অনাহারে ও পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১১৩] একে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'[১১৪] বলে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে ব্রিটেনে বাংলাদেশে কোম্পানির দ্বৈত শাসনের কুফলের দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অবগত হয়। ফলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস[১১৫] বাংলায় গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হয়ে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত করেন এবং নবাবকে সরিয়ে কোম্পানির পক্ষে সকল শাসনভার নিজেই গ্রহণ করেন।[১১৬]

ইংরেজদের শোষণ, ভিনদেশি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, দেশিয় রীতি ও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, অত্যাচার নিপীড়নে এদেশের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। সে কারণে প্রায়ই অনেক জায়গায় বিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকে। আবার অনেক স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।[১১৭] এ সকল বিদ্রোহের ফলে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যার প্রভাব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার উপরও পড়ে। এ দুর্দিনে রাজা রামমোহন রায়[১১৮] ও হাজি শরিয়ত উল্লাহ[১১৯] সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিদের জাগরণের সূত্রপাত ঘটান।[১২০]

---

১১০. 'মুঘল সম্রাট শাহ আলমের প্রকৃত নাম ছিল আলি গওহর। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ষোড়শ মুঘল সম্রাট যিনি একটি ভগ্নপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট হন।' দ্র. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি.]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

১১১. কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

১১২. 'দ্বৈত শাসন তৎকালীন বাংলায় নিযুক্ত ইংরেজ গভর্নর রবার্ট ক্লাইভের সৃষ্টি। রবার্ট ক্লাইভ যতদিন বাংলার গভর্নর ছিলেন ততদিন দ্বৈত শাসনের কারণে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরেই দ্বৈত শাসন সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে।' দ্র. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি.]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

১১৩. কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৭

১১৪. 'ইংরেজদের দ্বৈত শাসনের ফলাফল হলো ১১৭৬ খ্রি. বা ১৭৬৯-১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। দ্বৈত শাসনের ফলে সৃষ্ট প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা, ইংরেজ কর্মচারীদের অর্থলিপ্সা, ভূমি রাজস্বের ক্রমবৃদ্ধি, অনাবৃষ্টির কারণে উৎপাদন হ্রাস এবং ফসলহানির ফলে এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। উপরন্তু, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পরই শুরু হয় মহামারী, যাতে ১ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে।' দ্র. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি.]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

১১৫. 'আঠারো শতকের সত্তুরের দশকে যখন ইংরেজরা মারাঠা, হায়দ্রাবাদ এবং মহিশুর– এ তিন শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হয় ঠিক সে সময় ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার, বিচার বিষয়ক সংস্কার, পররাষ্ট্র নীতি সংস্কার প্রভৃতি সংস্কার সাধন করেন।' দ্র. শ্রী হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতবর্ষের ইতিহাস [ব্রিটিশ যুগ]*(কলকাতা : ইষ্ট এন্ড কোং, ১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ৮১

১১৬. কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯

১১৮. 'রাজা রামমোহন রায়কে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের প্রথম আধুনিক লোক বলা হয়। ১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবি, ফারসি এবং সংস্কৃত– এ তিন ভাষায়ই পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৮০৩ সালে

বঙ্গভঙ্গ : অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠিত হয় যার রাজধানী হয় ঢাকা। আর পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রদেশ যার রাজধানী হয় কলিকাতা। তৎকালীন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ[১২১] বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে বাংলার মুসলিমদেরকে সংগঠিত করেন।[১২২] বঙ্গভঙ্গের পিছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক কারণ জড়িত ছিল। তৎকালীন সময়ে অবিভক্ত বঙ্গই ছিল আয়তনে ও জনসংখ্যায় সর্ববৃহৎ। এত বড় প্রদেশের শাসন একজন গভর্নরের পক্ষে সমস্যাবহুল ছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের নেপথ্যে ইংরেজ শাসকদের রাজনৈতিক কারণ নিহিত ছিল। সে সময় ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তুঙ্গে উঠে যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতায় এবং আন্দোলনে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'[১২৩] অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন কিছুটা হলেও দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এছাড়া স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম সমাজকে বুঝাতে সচেষ্ট হন যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ব বাংলার মুসলিমরা নিজেদের চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সবকিছুতে সুবিধা পাবে। কলকাতার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। বঙ্গভঙ্গের পূর্বে শিল্প, বাণিজ্য, অফিস, আদালত, বিশ্ববিদ্যালয় সবই ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ব বাংলার জনগণ নিজ প্রদেশে এ সকল সুবিধা ভোগ করতে পারত।[১২৪] এছাড়া ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের প্রতি উদারনীতি ও মুসলিমদের প্রতি বিরূপনীতি অনুসরণ করত। মুসলিমরা ব্রিটিশদের দ্বারা নির্মমভাবে শোষিত হত। বঙ্গ বিভাগের দ্বারা পূর্ব বাংলার মুসলিমগণ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করার স্বপ্ন দেখে।

বঙ্গ ভঙ্গের ফলে মুসলিম ও হিন্দু– দুই পক্ষের মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিমরা উন্নত সমাজব্যবস্থার আভাস পাচ্ছিল। তাই তাদের গর্ব ও মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া পূর্ব বঙ্গে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।[১২৫] অন্যদিকে, হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা এ বঙ্গভঙ্গের

'তুহফত-উল-মুয়াহহেদিন' নামে আরবি ও ফারসি ভাষায় একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, যাতে তিনি একেশ্বরবাদ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।' দ্র. শ্রী হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতবর্ষের ইতিহাস [ব্রিটিশ যুগ]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

১১৯. 'হাজি শরিয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তিনি ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মাদারিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ পালনের জন্য মক্কা শরিফে যান এবং বহু বছর সেখানে দিনাতিপাত করে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে নিজ দেশে ফিরে আসেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামি শাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় হজ্জ করতে যান এবং ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় জ্ঞান অর্জন করেন। সুফি মতবাদের উপরেও তার বিশেষ দখল ছিল। তারপর কায়রোতে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে নিজ দেশে ফিরে এসে মুসলিমগণের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেন।' দ্র. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

১২০. কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯

১২১. 'নবাব খাজা সলিমুল্লাহর জন্ম ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯১৫ সালে। তিনি ১৯০১ থেকে ১৯১৫ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকার নবাব ছিলেন। তিনি ঢাকার চতুর্থ নবাব এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তার অবদান স্মরণীয়।' দ্র. সরদার ফজলুল করিম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*(ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৬

১২২. মোস্তফা ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশ স্টাডিজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১২৩. 'কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। অ্যালেন হিউম নামের একজন ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অবসর গ্রহণের পর ভারতেই থেকে যান এবং সমাজ সংস্কারের জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সে লক্ষ্যে তিনি যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এ কাজে তিনি তৎকালীন ভারতের বড়লাট ডাফরিনের সহায়তা পান।' দ্র. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

১২৪. মোস্তফা ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশ স্টাডিজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

ফলে ক্ষুব্ধ হয়। তারা মনে করে 'বঙ্গভঙ্গ' হচ্ছে বাঙালি জাতির স্বকীয়তা নষ্ট করার পথ।[১২৬] হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে স্থিমিত করার জন্য ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলিম লীগ'[১২৭] নামে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও জননেতা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয় ও তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দু লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের এরূপ মনোভাবের কারণে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ফুলকির মত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১২৮]

লাহোর প্রস্তাব : ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১২৯] এতে ভারতীয় কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে পূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাইলে কংগ্রেস তা অস্বীকার করে। মুসলিম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাবে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করে যেখানে কংগ্রেস এককভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে শাসন পরিচালনা শুরু করে। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। এ অবস্থায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনে অন্যরকম চিন্তাভাবনার উদ্রেক হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' উত্থাপন করে ভারতবর্ষে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন।[১৩০] হিন্দুরা 'লাহোর প্রস্তাব' কে মেনে নিতে পারেনি। তাদের মতে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চল পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[১৩১]

ভাষা আন্দোলন : ভাষা সংস্কৃতির ঐক্যই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর যখন আঘাত আসে তখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও সাধারণ বাংলাভাষী জনগণ তা মেনে নেয়নি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এক প্রস্তাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।[১৩২] ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান[১৩৩] গণপরিষদের উপস্থাপিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করায় পূর্ব বাংলার জনগণ ও গণপরিষদের বাঙালি সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে ক্রমে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি

---

১২৬. মোস্তফা ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশ স্টাডিজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

১২৭. '১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে আগা খান দ্বারা পরিচালিত ছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ দ্বারা পরিচালিত এ দলের কাজ ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা।' দ্র. কায়কোবাদ মিলন, *মুসলিম লীগের ইতিহাস*(ঢাকা : জয়তী, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১১

১২৮. মোস্তফা ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশ স্টাডিজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১২৯. প্রাগুক্ত।

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

১৩৩. 'লিয়াকত আলি খান পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার জন্ম ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তানের দেশ ভাগে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে রাজনীতি শুরু করেন।' দ্র. Farooq Naseem Bajwa, *Pakistan : A Historical and Contemporary Look*(Karachi : Oxford University Press, 2014 AD.), p. 130

হয়। পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতার মাধ্যমে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেক শহিদের প্রাণের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা অর্জিত হয়।[১৩৪]

বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম : ভারত উপমহাদেশের প্রতিটি আন্দোলনে সর্বদা বাঙালি মুসলিমগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। প্রতিটি সংগ্রামে তাদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রতিবারই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র তাদের দাবিয়ে রাখতে অপচেষ্টা করেছে। পাকিস্তান অর্জনের জন্য বাঙালি মুসলিমদের অবদানও কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু স্বতন্ত্র পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালি মুসলিমদেরই বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল বাঙালি মুসলিমদের পক্ষ থেকে একটি যৌক্তিক দাবি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের এ স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সবসময় পাশ কাটিয়ে আসত। একসময় বাঙালিরা বুঝতে পারে যে, আসলে আন্দোলন ছাড়া স্বায়ত্তশাসন সম্ভব নয়। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধিকার আন্দোলন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের পক্ষ থেকে ছয় দফা দাবি[১৩৫] উত্থাপন করেন যার প্রধান দাবি ছিল বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন। এ ছয় দফা দাবিকেই বাঙালি জাতির 'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয়।[১৩৬]

১৯৭০-এর নির্বাচনে বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভের প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বায়ত্তশাসনের দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিলেও পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠক শেষে অসমঝোতা প্রকাশ করেন। ইয়াহিয়া খানের এ আচরণের প্রতিবাদে বাঙালির স্বাধিকার দাবি স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। এ ভাষণে তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেন। ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা গভীর রাতে অকস্মাৎ ঢাকা শহরের বুকে যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য গণহত্যাগুলোর মধ্যে স্থান করে নেয়। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতারের পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন।[১৩৭]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দীর্ঘকালের বহু শাসকের শাসন পেরিয়ে আজকের এ বাংলাদেশের আবির্ভাব হয়েছে। শাসনব্যবস্থার এ বৈচিত্র্যময়তার মধ্য দিয়ে বাংলার আর্থিক অবস্থার সুদিন যেমন অতিবাহিত হয়েছে, তেমনি দুর্দিনও অতিবাহিত হয়েছে। এ যাবতকালের আর্থ-সামাজিক অবস্থাই বর্তমান আর্থিক অবকাঠামোর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই বাংলার ইতিহাস বিবেচনা করতে গেলে কোন শাসনামলকেই অবহেলা করা সম্ভব নয়। বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করে আরও দেখা যায় যে, এক শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে অন্য শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা যাওয়ার কারণে প্রতিবারই

---

১৩৪. মোস্তফা ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশ স্টাডিজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

১৩৫. '৬ দফা দাবিগুলো হল– পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রসংঘ, অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা থাকবে, মুদ্রা ও অর্থ সম্পর্কিত ক্ষমতা উভয় প্রদেশের অনুকূলে হতে হবে, অঙ্গরাজ্যগুলোর কর ও শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকতে হবে, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি উভয় প্রদেশের অনুকূলে থাকতে হবে এবং আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা থাকতে হবে।' দ্র. এস এম শহিদুল্লাহ, *ছয় দফার ইতিহাস*(ঢাকা : অনন্যা প্রকাশন, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২০-২২

১৩৬. কে.আলী, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১

১৩৭. মোহাম্মদ নূরনবী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে* ১৯৭১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

অর্থব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বাংলা যখন হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল তখন আর্থিক কাঠামো যেমন ছিল, মুসলিম শাসকগণ ক্ষমতা দখলের পর সে আর্থিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে।

আবার, পরবর্তীতে ইংরেজদের শাসনামলে অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্রিটেনকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদিত হত ভারত উপমহাদেশে। কিন্তু তার ফলাফল ভোগ করত ব্রিটিশ রাজতন্ত্র। পরবর্তীতে ব্রিটিশদের শাসনামলের সমাপ্তি ও ভারতবর্ষের বিভক্তি বাংলার অর্থনীতিকে আরেক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। আবার, পাকিস্তান শাসনামলেও আর্থিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। কারণ আর্থিক কার্যাবলি পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত হলেও তার ফলাফল ভোগ করত পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। এ অর্থনৈতিক বৈষম্যই স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি ছিল। অর্থাৎ, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি, ক্ষমতার লড়াই সর্বক্ষেত্রে অর্থব্যবস্থা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি ইংরেজ শাসনামল এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামল দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সর্বশেষ ফলাফল হল স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে অর্থনৈতিক দিক থেকেও অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উপমহাদেশের এ অংশে অর্থনৈতিক যে ধ্বংসাবস্থা সৃষ্টি করেছিল পরবর্তীতে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত তার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আবার পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর উপর অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিল তার ফলশ্রুতিতে যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ একটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল তার পিছনে মূখ্য শক্তি হিসেবে বাঙালি মুসলিমগণের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।[১৩৮] কিন্তু পাকিস্তানের সূচনালগ্ন থেকেই এ বাঙালি জনগণের উপর শুরু হয় শাসন, শোষণ, উৎপীড়ন, নিপীড়ন ও নির্যাতন যা বাঙালি জাতির মধ্যে নতুন করে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। এর ফলশ্রুতিতেই ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন ও ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের সূচনা করে।[১৩৯]

পাকিস্তান শাসনামলের অর্থনৈতিক বৈষম্য : স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পিছনে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আর্থিক বিনিয়োগ ছিল অধিক। যার কারণে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাও স্থানান্তরিত হত পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টিলগ্নে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় ছিল, পরবর্তীতে শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী আচরণের কারণে সে ভারসাম্য বিলীন হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ঘাটতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী অর্থনৈতিক নীতির দরুণ ব্যাংকিং এবং ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৪০]

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ৩৬টি তফসিলি ব্যাংক ছিল। এ সকল ব্যাংকের মোট ১ হাজার ১৩০টি শাখার মধ্যে মাত্র ৩৬২টি শাখা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যা মোট ব্যাংকিং শাখার মাত্র ৩২ শতাংশ। আর যে কারণে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরাই বেশি ব্যাংকিং সেবা লাভ করত। সে সাথে ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে যে বিনিয়োগ হত তার প্রায় ৯০ শতাংশের

---

১৩৮. মোহাম্মদ নূরনবী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীনকাল থেকে* ১৯৭১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

১৩৯. ডঃ আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস*(ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৮৫

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

অংশীদার হত পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এ সকল বৈষম্যমূলক আচরণই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণায় নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্মলাভ করে।[১৪১]

যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি : ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে 'বাংলাদেশ' নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন নয় মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ব্যাপক ধ্বংসলীলা, তাণ্ডব ও গণহত্যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের ত্রাণ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সেক্টরভিত্তিক যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় শুধু সরকারি ও বেসরকারি খাতেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১২ হাজার ৪৯৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন বাঙালি অর্থনীতিবিদের ভাষ্যমতে যুদ্ধ চলাকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, ঢাকাস্থ জাতিসংঘের কার্যক্রম প্রকাশ করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[১৪২]

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংক-এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ব্যাংক জমা ছিল ৩৬২ কোটি টাকা। পাকিস্তানি বাহিনী নিশ্চিত পরাজয় জেনে ১৯৭১-এর ১৫ ডিসেম্বর ১০০ কোটি টাকার নোট পুড়িয়ে দেয়। বাকি ২৬২ কোটি টাকারও কোন হদিস পাওয়া যায়নি। এছাড়া, যেহেতু পাকিস্তান আমলে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সিংহভাগই পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধিকারে ছিল সেহেতু বাঙালিদের জমাকৃত টাকার পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি টাকা, যা আমানতকারিরা যুদ্ধ চলাকালীন ব্যাংকিং খাতে ক্ষতির দরুণ হারাতে বাধ্য হয়। এ অর্থ আমানতকারিদের ফেরত দিতে বাংলাদেশ সরকারও বাধ্য নয়। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের জরিপ থেকে জানা যায় যে, শুধু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যে ব্যাংক ব্যালেন্স, নগদ অর্থ ও কলকারখানার মূল্যবান সামগ্রী পাচার হয় তার মূল্যমান ছিল ৭৮৫ কোটি টাকা।[১৪৩]

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করলে সমগ্র বাংলাদেশ উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বধ্যভূমি, পাকবাহিনীর বন্দী শিবির থেকে পাওয়া মরদেহ, কংকাল ও নির্যাতনের আলামতে জাতি শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের অবকাঠামো পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির নজির ছিল ভয়াবহ। প্রশাসনিক শৃঙ্খলাকে ঢেলে সাজানো ছিল তখন সময়ের দাবি। সুষ্ঠু প্রশাসনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ছাড়া একটি ধ্বংসপ্রায় দেশকে পুনর্গঠনের আর কোন উপায় ছিল না। এ ছাড়া ভারত থেকে ফেরত আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন ছিল আরেকটি জটিলতা। যুদ্ধকালীন তাণ্ডবে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ভঙ্গুর। সড়ক, সেতু, রেললাইন প্রভৃতি বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। এ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে জনগণের চলাচল স্বাভাবিক করা ছিল আরেকটি বড় সমস্যা। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভঙ্গুর অবস্থার কারণে বিভিন্ন সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠী দুর্নীতি, চোরাচালানি, অবৈধ বাণিজ্য শুরু করেছিল। তাদের প্রতিহত করাও ছিল আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া স্বাধীনতা

---

১৪১. ডঃ আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

১৪৩. প্রাগুক্ত।

বিরোধী দালাল, পাক যুদ্ধবন্দী ও বিহারিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়াও ছিল সে সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১৪৪]

আইন-শৃঙ্খলা সমস্যা : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময় অধিকৃত অস্ত্র জমা দেয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। কারণ যুদ্ধের সময় অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র সাধারণ মানুষের হাতে চলে যায়। যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ছিল তারা অস্ত্র জমা দেয়। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অস্ত্র জমা দেয়নি। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্য। এ সকল অস্ত্রের সাহায্যে তারা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানিতে লিপ্ত হয়। এসব দুষ্কৃতিকারীর কারণে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়। এ ছাড়া তৎকালীন বিরোধীদলগুলো সংসদীয় গণতন্ত্র না মেনে গণ আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। তারা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ, অস্ত্র, ব্যাংক ও ধনীদের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনসহ নানাবিধ অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়। হত্যা, ছিনতাই, নারী নির্যাতন ও অপহরণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।[১৪৫]

স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্র : স্বাধীনতা বিরোধী কিছু গোষ্ঠী রাজাকার ও আলবদর বাহিনীকে যুদ্ধের সময় সাহায্য-সহযোগিতা করে। সে সাথে ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, চিকিৎসাবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘৃণ্য দালালদেরকে শাস্তি না দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেন। কিন্তু তারা এ ক্ষমার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।[১৪৬]

শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও ত্রাণ কমিটি গঠন : যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি বাঙালি ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা দেশে ফিরে আসে। এ সময় সরকারের অবস্থান দৃঢ় না হওয়ার কারণে এই প্রায় এক কোটি লোকের চাপ বাড়তি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। যে সব বাঙালি প্রাণ রক্ষার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়িঘর পাকিস্তানি বাহিনী জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয় ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি লুটপাট করে নেয়। প্রত্যাবর্তনের পর কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের ভিটা-বাড়ি খুঁজে পেলেও সকলে তা পায়নি। আবার কারো কারো ভিটা-মাটি অন্যরা দখল করে নিয়েছিল। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে এ বাড়তি লোকের পুনর্বাসন করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বিভিন্ন সাহায্য সংস্থাকে আহ্বান জানানো হয় সরকারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। ত্রাণ কমিটির কর্মকাণ্ড গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা এবং স্থানীয় কর্মীদের মধ্য থেকে ত্রাণ কমিটির সদস্য নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণে বিদেশি সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং ত্রাণ কমিটির মাধ্যমে তা বিলিয়ে দেয়া হয়।[১৪৭]

---

১৪৪. ডঃ আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯
১৪৫. কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫০
১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫১
১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫২

দালাল আইন : যুদ্ধের সময় এদেশের সে সকল ব্যক্তি বা সংগঠনের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকবাহিনীর সহায়তা করে তাদের 'দালাল' হিসেবে অভিহিত করা হয়। কেউ রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে, কেউ অর্থনৈতিক কারণে ও কেউ কেউ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যও দালালে পরিণত হয়। তাই স্বাধীনতার পর এ দালাল বাহিনী দেশের আপামর জনসাধারণের ক্রোধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক দালাল ছাড়াও নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে অন্যের প্রতি আক্রোশ পোষণ করত। এ পরিস্থিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশ দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ, ১৯৭২'[১৪৮] প্রণয়ন করে দালালদের বিচার করা হবে বলে আশ্বাস দেন। যেসব লোক বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকবাহিনীকে তাদের অবৈধ অবস্থানে সহায়তা করেছে; আকার ইঙ্গিত, প্রতিশ্রুতি বা আচরণ দ্বারা বৈষয়িক সহায়তা দান করেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় যারা বাঁধা দান করেছে– সেসব লোককে এ দালাল আইনের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।[১৪৯]

পরিত্যাক্ত সম্পত্তি দখলিকরণ আইন : পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ধনী ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তানে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। কাঁচামালের সহজলভ্যতা, স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে তারা এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে নিজেদের পরাজয়ের আশংকায় তারা কোটি কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পত্তি ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। সরকার এসব পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল নিয়োগ দেয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর আইন-কানুন ও পরিচালনারীতি সকলই সরকারের দায়িত্বে ছিল। দায়িত্ব পালনের ভার ছিল সরকার নির্ধারিত পরিচালনা পর্ষদের উপর।[১৫০]

কর মওকুফ ও জমির সিলিং : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেন। জমির সিলিং হিসেবে পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি নির্ধারণ করেন এবং আইন অমান্যকারীর জন্য শাস্তির বিধান রাখেন। সংগ্রামের সময় শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বেতন মওকুফ করেন।[১৫১]

শিক্ষা সংস্কার : যুদ্ধের তাণ্ডবে প্রায় ২১ হাজার ৮৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনঃনিমাণের জন্য ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দেই প্রায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ নেয়া হয়। গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে ৩৬ হাজার বিদ্যালয় সরকারি করা হয়। ৯ শত মহাবিদ্যালয় ভবন ও ৮ শত

---

১৪৮. 'মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব রাজাকার, আল বদর, আস শামস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছে তাদের বিচারের জন্য 'বাংলাদেশ দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ, ১৯৭২' প্রণয়ন করা হয়। এ আইনটি ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রণীত হয়। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এ আইনের আওতায় ২ হাজার ৮৮৪টি মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় ৭৫২ জনকে সাজা দেয়া হয় যার মধ্যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত, যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছিল।' দ্র. শফিক আহমেদ, *একাত্তরের দালালেরা*(ঢাকা : মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২

১৪৯. কে.এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪

১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৫

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৮

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ করা হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বপ্রথম স্বায়ত্তশাসিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই ড. কুদরত-ই-খুদার[১৫২] নেতৃত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন[১৫৩] গঠিত হয় যা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেয়।[১৫৪]

কৃষি সংস্কার : যুদ্ধের সময় কৃষিখাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৭৯ কোটি টাকা। এ খাতের বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮৪ কোটি টাকা। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রথমেই এ খাতে বরাদ্দ প্রদান করে প্রায় ৬৩ কোটি টাকা। ভূমিহীন কৃষকদের জন্য ১২ লক্ষ একর জমি বিনামূল্যে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য ৫০ টাকা মণ হিসেবে সর্বনিম্ন মূল্য নিশ্চিত করা হয়। পাট রপ্তানির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঢাকাতে পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১৫৫]

অর্থনৈতিক সংস্কার : যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনর্বিন্যস্ত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'পরিকল্পনা কমিশন'[১৫৬] গঠন করেন।[১৫৭] ১৯৭৩-৭৮ অর্থবছরের জন্য তৎকালীন সরকার অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা[১৫৮] গ্রহণ করেন। এতে ৫ হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে খরা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের বন্যা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ 'জাতীয়করণ আইন' পাস করে পাট, বস্ত্র, চিনিকল, ব্যাংক, বীমা রাষ্ট্রীয় আয়ত্তে আনা হয় যার ফলে ৮০-৮৫ শতাংশ শিল্প, ব্যাংক ও বীমা সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসে। ব্যাংকগুলো জাতীয়করণ করে নতুন ৬টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলো হল– সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী, উত্তরা ও পূবালী ব্যাংক যার প্রতিটির মূলধন নির্ধারিত হয় ৫ কোটি টাকা করে। জাতীয়করণ করা ১২টি ব্যাংকের মধ্যে ১০টি ছিল পাকিস্তানি যার মধ্যে ৭টি ছিল ২২ পরিবারভুক্ত ৭টি পরিবারের মালিকানাধীন। জাতীয়করণ পরবর্তী এ সকল ব্যাংকের মূলধন নির্ধারিত হয় ২০ কোটি টাকা করে।

---

১৫২. 'ড. কুদরত-ই-খুদার জন্ম ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি একজন বাংলাদেশি রসায়নবিদ, শিক্ষাবিদ এবং গ্রন্থকার। শিক্ষায় অবদানের জন্য তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।' দ্র. বরেণ্য : ড. কুদরত-ই-খুদা, https://www.jugantor.com, published on 12.04.2020 AD, visited on 12.01.2023 AD

১৫৩. 'প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন ড. কুদরত-ই-খুদা।' দ্র. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, http://www.shed.gov.bd, visited on 12.01.2023 AD

১৫৪. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮

১৫৬. 'পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জানুয়ারি এক সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। পরিকল্পনামন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিকল্পনা কমিশনে একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য ছিলেন।' দ্র. www.plancomm.gov.bd, visited on 12.01.2023 AD

১৫৭. মুনতাসীর মামুন ও মোঃ মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*(ঢাকা : সুবর্ণ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ২৫৭

১৫৮. 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৭৩-১৯৭৮ খ্রি.। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১ জুলাই থেকে তা কার্যকর হয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।' দ্র. Planning Commission, *The First Five Year Plan : 1973-78*(Dhaka : Ministry of Planning, 1973 AD), p. 1

ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে ব্যাংকিং খাতে যে সংকট ছিল তা ধীরে ধীরে দূরিভূত হতে থাকে। এ সকল ব্যাংককে নতুন শাখা খোলার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এ সকল ব্যাংকের শাখা ছিল ১ হাজার ৮৯টি যা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১ হাজার ২৫৭-তে উন্নীত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এ সকল ব্যাংকের আমানত ছিল ৩১৩ কোটি টাকা যা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়ে ৬৯৬ কোটিতে উন্নীত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস), বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বিএসবি) ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেএস) এ সময়ে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দেই তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার অর্থসংক্রান্ত অস্থায়ী ঘোষণা প্রদান করে ও বাংলাদেশ ব্যাংক পাকিস্তানি মুদ্রা বাতিল আদেশ জারি করে। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ[১৫৯] ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পাস হয় এবং পাকিস্তানি ৫, ১০ ও ৫০ টাকার নোট বাতিল করে বাংলাদেশ সরকার নতুন ১, ৫, ১০ ও ১০০ টাকার নোট চালু করে।[১৬০]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশকে পুনর্গঠনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালী করা ছিল প্রধান কাজ। কারণ, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের উপর থেকে নিজেদের আধিপত্য সরিয়ে নিলেও যুদ্ধের তাণ্ডবে বাংলাদেশকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। তাই তাদের শোষণের অবসানের পর বিশ্বের বুকে একটি নবপ্রতিষ্ঠিত ও ভঙ্গুর জাতির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের জন্য অর্থনৈতিক কাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকাকালীন সম্পূর্ণ সময় জুড়েই বাংলাদেশের আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে গিয়েছেন। যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য তার নিরন্তর প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না।

---

১৫৯. '১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশ নম্বর ১২৭ বলে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এর কার্যক্রম শুরুর তারিখ ধরা হয়।' দ্র. Ministry of Law and Parliamentary Affairs, *The Bangladesh Bank Order, 1972*(Dhaka : Department of Public Relations and Publications, 1972 AD), p. 2

১৬০. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের অবকাঠামো পুনর্গঠনের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় ছিল দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করা। যুদ্ধবিধ্বস্ত ও ভঙ্গুর একটা জাতিকে পুনরায় বিশ্বের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে অর্থনৈতিক সংস্কারের কোন বিকল্প নেই। আর এ লক্ষ্যেই তৎকালীন সরকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থবির অবস্থা দূরীকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। একটি দেশের আপামর জনসাধারণের ভরসার স্থল হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এ জন্যই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অভাবনীয় সাফল্য বয়ে আনছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনিয়োগের বিভিন্ন মাধ্যম জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে সকল শ্রেণির জনগণকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে। জনগণের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিনিয়োগকেও কাজে লাগিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। তাই একটি দেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মূখ্য অবদান রাখছে।

যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক পদক্ষেপ : স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর বঙ্গভবনে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে পূর্ব অভিহিত 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান'-এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' হিসেবে নামকরণ করা হয়।[১৬১] জনাব মোহাম্মদ হামিদুল্লাহকে[১৬২] বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এটি ছিল বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দেশের অর্থনৈতিক আমূল পরিবর্তনের জন্য গৃহীত প্রথম পদক্ষেপ। সরকার আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ আর্থিক কাঠামো সৃষ্টি ও আসন্ন চ্যালেঞ্জ মুকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর বিশাল দায়িত্ব অর্পণ করে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গঠন, নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালুকরণ, বাংলাদেশি টাকা ছাপানো, মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা আনয়ন, বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন ও সংরক্ষণ এবং সরকারকে আর্থিক পরামর্শদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ 'The Bangladesh Banks (Nationalization) Order 1972' জারি করে রাষ্ট্রায়ত্ত সকল ব্যাংকের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয়। পাকিস্তান আমলের ব্যাংকগুলোর নাম সংস্কার করে নতুন নাম দেয়া হয়। পাকিস্তান আমলের ১২টি ব্যাংকের একত্রীকরণ করে নতুন ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন 'ন্যাশনাল ব্যাংক

---

১৬১. এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার :* ১৯৭১-৭৫(ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১২৯-১৩০

১৬২. 'এ.এন.এম. হামিদুল্লাহ ছিলেন একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। তার জন্ম ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ থেকে ১৮ নভেম্বর, ১৯৭৪ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।' দ্র. www.bb.org.bd, visited on 12.01.2023 AD

অব পাকিস্তান', 'ব্যাংক অব বাহাওয়ালপুর' এবং 'দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড'-কে একত্রিত করে প্রতিষ্ঠিত হয় সোনালী ব্যাংক।[১৬৩] পাকিস্তান আমলের 'হাবিব ব্যাংক' এবং 'কমার্স ব্যাংক'-এর সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন অগ্রণী ব্যাংক।[১৬৪] 'ইউনাইটেড ব্যাংক' ও 'ইউনিয়ন ব্যাংক' মিলিয়ে গঠন করা হয় জনতা ব্যাংক।[১৬৫] 'মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক', 'স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক' ও 'অস্ট্রেলিয়া ব্যাংক' একত্রিত করে প্রতিষ্ঠিত হয় রূপালী ব্যাংক।[১৬৬] 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক'-এর নতুন নাম হয় পূবালী ব্যাংক।[১৬৭] 'ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন'-এর নতুন নাম হয় উত্তরা ব্যাংক।[১৬৮]

যুদ্ধ পরবর্তীকালে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদান : স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়াও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোও ছিল সরকারের অধীনে।[১৬৯] আশির দশকের শুরুতে ব্যাংকিং খাতকে গতিশীল করার জন্য কিছু বেসরকারি ব্যাংক ব্যাংকিং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এবি ব্যাংক প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসাবে যাত্রা শুরু করে।[১৭০] বর্তমানে ৪৩টি বেসরকারি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে যার মধ্যে ৩৩টি সুদভিত্তিক ও ১০টি ইসলামি শারি'আহভিত্তিক। এ ছাড়া আনসার ভি.ডি.পি. উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে। এ ছাড়া বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমেও ৯টি ব্যাংক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১৭১]

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মোট ৬১টি ব্যাংকের শাখা এখন শহরাঞ্চল অতিক্রম করে গ্রাম পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে। ফলে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো আধুনিকায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে গতিশীল ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে সরকারি ব্যাংকগুলোও তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে পূর্বের তুলনায় দ্রুততর সেবা নিশ্চিত করছে। অনলাইনের মাধ্যমে অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM)-এর সুবিধা এখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এ সকল কার্যাবলি পরিচালনার জন্য দক্ষ ও মেধাবী জনবলও নিশ্চিত করা হচ্ছে। ফলে এ ব্যাংকগুলোতে এখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে।

সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র মুনাফাকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে না দেখে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্যও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মেধাবৃত্তি প্রদান, হাসপাতাল নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করছে। মঙ্গাপীড়িত ও শীত প্রধান অঞ্চলগুলোর জন্য

---

১৬৩. সোনালী ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৬২
১৬৪. অগ্রণী ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৯২
১৬৫. জনতা ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩৯
১৬৬. রূপালী ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২১
১৬৭. পূবালী ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২১
১৬৮. উত্তরা ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৫
১৬৯. সম্পাদকীয়, মোহাম্মদ আবু তাহের, *ব্যাংকিং খাতের গতিশীলতা ও দেশের উন্নয়ন*(ঢাকা : দৈনিক ইনকিলাব, ইনকিলাব এন্টারপ্রাইজ এন্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২
১৭০. এবি ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১১৮
১৭১. Banks & FIs, www.bb.org.bd, visited on 12.01.2023 AD

প্রধানমন্ত্রী তহবিলে প্রয়োজনীয় সেবামূলক দ্রব্য সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সাহায্যমূলক ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংকগুলো দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কোটি কোটি টাকা মেধাবৃত্তি প্রদান করে তাদের শিক্ষার পথ সুগম করে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো এসএমই খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে যা মানবসম্পদ উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ সকল এসএমই ঋণ জামানতবিহীন হওয়ায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে আয় উপার্জনের স্পৃহা সৃষ্টি হচ্ছে যা দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করছে।

এ ছাড়া স্বল্প সময়ে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী আয় আনয়ন, অটোমেটেড টেলার মেশিনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা ব্যাংকিং সুবিধা, প্রবাসী ঋণ, মৎস্য ঋণ, দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে ৫ শতাংশ হারে সুদে ঋণ প্রদান, আমদানি বিকল্প শস্যখাতে ৪ শতাংশ হারে সুদে ঋণ প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আয়-উপার্জনের ধারা অব্যাহত রেখেছে।[১৭২] কৃষিবান্ধব ও গ্রীন ব্যাংকিং প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে ব্যাংকিং-এর আওতায় এনে তাদের উন্নয়নের মাধ্যমে এ ব্যাংকিং ব্যবস্থার কল্যাণে জাতীয় অগ্রগতি সাধন করে অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করা এবং সরকারের অগ্রগতিকে অনন্য সাধারণ গতি প্রদান করা– কোন কিছুই আর এখন অসম্ভব নয়। ব্যাংকিং খাতের উন্নয়ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে দেশে খাদ্য উৎপাদন ১ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন ছিল।[১৭৩] এর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদি জমিও হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তারপরেও ব্যাংকিং খাতের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের কৃষকদের ঋণ দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে। এভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ অগ্রগামী হয়ে বর্তমানে স্বল্প-মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হয়েছে ও উন্নয়নশীল দেশের পথে পা বাড়িয়েছে। ইতোমধ্যে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রণীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে দেশের ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান অব্যাহত রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। আর এ সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এ দেশের ব্যাংকিং খাতের শক্ত অবস্থানের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে যা দেশকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা : বাংলাদেশ বর্তমানে তার অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ইতিহাসে সবচেয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের জিডিপি থেকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ৪৬০.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের জিডিপিতে উত্তরণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে অভাবনীয় সাফল্যেরই প্রমাণ বহন করে। বাংলাদেশ বর্তমানে নমিনাল টার্মের[১৭৪] দিক থেকে বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে এবং ক্রয় ক্ষমতার সমতার[১৭৫] দিক

---

১৭২. সম্পাদকীয়, মোহাম্মদ আবু তাহের, *ব্যাংকিং খাতের গতিশীলতা ও দেশের উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১৭৩. প্রাগুক্ত।

১৭৪. 'অর্থনৈতিক অবস্থা প্রকাশের অভিহিত পদ্ধতিতে মজুরি, পুঁজি বাজারের মূল্যের উত্থান-পতন, সম্পদ ও সুদের হার সমন্বিত থাকে না এবং এটি একটি অপরিবর্তিত আর্থিক পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।' দ্র. Christina Majaski,

থেকে ২১তম বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। সম্প্রতি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নীত হয়েছে এবং আশা করা যায় ২০৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ চার ধরনের অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম ধাপটি ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। যেটি ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ম্লান অধ্যায়। এ সময় সমন্বিতভাবে ৪ শতাংশের কম এবং মাথাপিছু হিসেবে ৩ শতাংশেরও কম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল ১৯৯৬ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময় সমন্বিতভাবে এবং মাথাপিছু হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৪ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে উঠানামা লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে যার ব্যাপ্তি ছিল ২০০৪ থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ মেয়াদ কালে প্রবৃদ্ধির হার সমন্বিতভাবে ছিল প্রায় ৬ শতাংশ এবং মাথাপিছু হিসেবে ছিল প্রায় ৫ শতাংশ। চতুর্থ অধ্যায়ের মেয়াদ ২০১৩ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এ সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে লক্ষ্য করা যায়, যা বিগত দুই অর্থবছরে ৭ শতাংশকে অতিক্রম করেছে।[১৭৬]

বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি খাতসমূহ : বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্যের হারও নিম্নমুখী লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[১৭৭] ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ যা ২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত হিসাব করে পাওয়া গেছে ২৪.৩ শতাংশ এবং বর্তমানে এটি প্রায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত নেমেছে। মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির পিছনে মূল কারণ হিসাবে কাজ করেছে 'টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কর্মসূচী'। কৃষি, শিল্প ও সেবামূলক কার্যক্রম– এ তিন শাখা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পিছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। কৃষিখাতে আয় সন্তোষজনক হলেও বিগত বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কিছুটা নিম্নমুখী হয়েছে, যেখানে শিল্প ও সেবা কার্যক্রমের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়। কৃষিখাতে মোট জিডিপি এসে দাঁড়িয়েছে ১২.০৯ শতাংশ যেখানে গত অর্থবছরে তা ছিল ১২.৪৪ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্পখাতে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪.৬১ শতাংশ হয়েছে, যেখানে গত অর্থবছরে তা ছিল ৩৪.১৩ শতাংশ এবং সেবাখাতে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩.৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যেখানে গত অর্থবছরে তা ছিল ৫৩.৪২ শতাংশ।

শিল্পক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্প খাত, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও পানি সরবরাহ খাত, নির্মাণখাত– এগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিরাট একটা অংশ তৈরি পোশাক শিল্প খাত থেকে প্রাপ্ত রপ্তানি আয়, প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ, কৃষিখাতের অগ্রগতি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ব্যবস্থার অগ্রগতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস এবং সরকারের নিরাপত্তামূলক কর্মপরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১৭৮]

Nominal: What it Means in Finance and Economics, www.investopedia.com, visited on 13.01.2023 AD

১৭৫. 'ক্রয় ক্ষমতার সমতা বলতে দু'টি ভিন্ন মুদ্রার দীর্ঘস্থায়ী বিনিময় হয়।' দ্র. Gustav Cassel, *Abnormal Deviations in International Exchanges*(London : Royal Economic Society, 1918 AD), p. 413

১৭৬. Barkat-E-Khuda, *Economic Growth in Bangladesh and the Role of Banking Sector,* www.thefinancialexpress.com.bd, visited on 13.01.2023 AD

১৭৭. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *জিডিপি রিপোর্ট*(ঢাকা : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২

১৭৮. মোহাম্মদ আবু তাহের, *ব্যাংকিং খাতের গতিশীলতা ও দেশের উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১৯৭০ খ্রি. থেকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প খাতের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি হার লক্ষ্য করা যায়। চীনের পর বাংলাদেশ পশ্চিমা পণ্যের ব্র্যান্ডগুলোর দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সরবরাহকারী হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ তৈরি পোশাক শিল্প খাত থেকে আহরিত হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে যেখানে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে আয় ছিল ৬.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মার্চে তা ১১.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়েছে।[১৭৯]

শ্রম প্রধান দেশ হিসাবে প্রতিবছর ০.৫ মিলিয়ন বাংলাদেশি কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যায়। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্যমতে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বমোট প্রায় ১০.২৯ মিলিয়ন শ্রমিক বিদেশে কাজের জন্য অবস্থান করছে। প্রবাসী শ্রমিকের বৃদ্ধির কারণে তাদের প্রেরিত অর্থ থেকে বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ২১.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[১৮০]

আবাদি জমির হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও গত চার দশক ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অগ্রগতি সাধন করেছে। কৃষিক্ষেত্রে উদার বিনিয়োগ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নতুন সার ও প্রযুক্তিগত কৌশল আয়ত্তের জন্য কৃষকদের উৎসাহ প্রভৃতি বিষয়গুলো কৃষি খাতকে প্রভাবিত করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট উৎপাদন ছিল ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৯ বিলিয়ন মেট্রিক টন যা ২০২০-২১ অর্থবছরে হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৭ বিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গম উৎপাদন ছিল ১০ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৫৪ মেট্রিক টন যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৬৮ মেট্রিক টনে পৌঁছায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ধান ও গম উৎপাদনের জন্য আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৮২৭ একরে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্বে ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩২৮ একর।[১৮১]

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে ও দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার তার অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় খাতকে বিনিয়োগের জরুরি খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ খাতকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চালু করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে ৩ হাজার ১০৮ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়।[১৮২] ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। মোট ঋণের ৩০ শতাংশ ঋণ শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।[১৮৩] এ ছাড়া, উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির

---

১৭৯. Bangladesh Bank, *Quarterly Review on Readymade Garments (RMG) : January-March'22* (Dhaka : Research Department, External Economics Wing, 2022 AD), p. 2

১৮০. Bangladesh Bank, *Quarterly Report on Remittance Inflows in Bangladesh*(Dhaka : Research Department, 2022 AD), p. 3

১৮১. Bangladesh Bureau of Statistics, *Yearbook of Agricultural Statistics 2021*(Dhaka : Statistics and Information Division, Ministry of Planning, 2021 AD), p. 51

১৮২. এসএমই ফাউন্ডেশন, *পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন ২০২১-২২*(ঢাকা : রিসার্চ উইং, এসএমই ফাউ., ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৫

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

জন্য বর্তমান পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ২০০টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যার আওতায় ৩৫ হাজারের অধিক উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ৬০ শতাংশই নারী উদ্যোক্তা।[১৮৪]

আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলো বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দেশে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ব্যাংকই প্রধান হাতিয়ার। ব্যাংকগুলো ঢালাওভাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করে আসছে। বর্তমানে তৈরি পোশাক, প্রবাসী আয়, কৃষি ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়– অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যে অবদান রাখছে সেগুলোকে সচল রাখার পিছনে চালক হিসেবে ব্যাংকিং প্রক্রিয়াই কাজ করছে। বাংলাদেশ যেহেতু একটি আমদানিনির্ভর দেশ, সেহেতু দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার জন্য আমদানির মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি সহজলভ্য হওয়া খুবই প্রয়োজন। ব্যাংকগুলো এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া ব্যাংকগুলো অর্থ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায়ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতে ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

(ক) তৈরি পোশাক খাত : ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে রপ্তানি বিনিয়োগে শুধু বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শেয়ারই ছিল ৬০ শতাংশ। তৈরি পোশাক খাত সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগের আওতায় আছে যার দ্বারা ২০১৪ থেকে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ খাতের উন্নয়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সে সাথে আমদানি মূল্য পরিশোধের পরিমাণও প্রতি বছর বেড়ে চলছে। ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি মূল্য ২১ হাজার ৬২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৪৩ হাজার ৬৬৩ মার্কিন ডলার হয়েছে।[১৮৫] অসুস্থ, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং হতদরিদ্র গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য ব্যাংকিং খাত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী সকল অনুমোদনপ্রাপ্ত ডিলার ব্যাংকগুলো রপ্তানি আয়ের ০.০৩ শতাংশ সোনালী ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট একাউন্টে জমা করবে। উক্ত জমাকৃত ফান্ড মৃত গার্মেন্টস কর্মীদের পরিবার, শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়া গার্মেন্টসকর্মী এবং কিছু কিছু গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন দেয়ার কাজে ব্যয় হবে।[১৮৬] আবার, বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য শিল্পের পাশাপাশি রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্পের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোকেও গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড থেকে পরিবেশবান্ধব যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ আমদানির জন্য পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করছে।[১৮৭]

(খ) ফরেন রেমিট্যান্স : প্রবাসী শ্রমিকদের অর্জিত অর্থ দেশে পাঠানোর সহজ মাধ্যমগুলো বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম করে দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও ব্যাংকগুলোর বড় একটি অবদান রয়েছে। গত অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যে এ দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক গমনের কারণে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৮৮] যে বিষয়গুলো ব্যাংকিং প্রণালীকে প্রবাসী আয়ের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছে

---

১৮৪. এসএমই ফাউন্ডেশন, *পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন ২০২১-২২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১৮৫. Barkat-E-Khuda, *Economic Growth in Bangladesh and the Role of Banking Sector*, www.thefinancialexpress.com.bd, visited on 13.01.2023 AD

১৮৬. Bangladesh Bank, *Quarterly Review on Readymade Garments (RMG) : Jan-Mar'22,* ibid, p. 11

১৮৭. ibid, p. 10

১৮৮. Bangladesh Bank, *Quarterly Report on Remittance Inflows in Bangladesh, Jul-Sep'22,* ibid, p. 2

যেগুলো হলো– ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার মূল্যমান হ্রাস, দেশিয় ব্যাংকগুলোর উচ্চ মূল্যহার নির্ধারণ, ব্যাংকগুলোর ডলারের স্বল্পতা, রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং হুন্ডির ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় ব্যাংকের কড়া নজরদারি। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত মোট রেমিটেন্সের মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ৪ হাজার ৬৩১ দশমিক ৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট রেমিটেন্সের ৮১.৬৪ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ৯৪০.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট রেমিটেন্সের ১৬.৫৮ শতাংশ। বিশেষায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ৮০.৮১ মিলিয়ন যা মোট রেমিটেন্সের ১.৪২ শতাংশ এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ২০.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট রেমিটেন্সের ০.৩৬ শতাংশ।

(গ) কৃষি খাতে অবদান : বাংলাদেশ কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক'-এর পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যেখানে ২০০১-২০০২ অর্থবছরে কৃষি ব্যাংকের কৃষি খাতে বিনিয়োগ ছিল ১৫.৬৩ বিলিয়ন টাকা সেখানে ২০২০-২১ অর্থবছরে তা এসে দাঁড়িয়েছে ১৮২.২৯ বিলিয়ন টাকায়।[১৮৯] ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লীখাতের উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কৃষিখাতে প্রযুক্তিগত প্রসারের উদ্দেশ্যে ২৬ হাজার ২৯২ কোটি টাকার কৃষিঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণীত হয়। উক্ত অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ২টি ব্যাংক, ৩৯টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৮টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক মোট ২৫ হাজার ৫১১ দশমিক ৩৫ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.০৩ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ কৃষিঋণ প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৫ হাজার ৯৪৭ জন এবং নারী ঋণগ্রহীতাগণের গৃহীত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৯ হাজার ২৮৭ দশমিক ৯৬ কোটি টাকা।[১৯০]

(ঘ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার উন্নয়ন : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ খ্রিস্টাব্দে এ খাতে ঋণ দান প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। এ ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রিয় ব্যাংক নির্ধারণ করে না; বরং ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ হাজার ৩৩৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন টাকা যেখানে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১ হাজার ৪৩৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছেছে। এ ছাড়া ৪৯ হাজার জন নারী উদ্যোক্তা ৪৫.১ বিলিয়ন টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কম সুদে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভুত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিনিয়োগের মোট ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখার জন্য। এ ছাড়া বিনা জামানতে ২.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত ঋণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য।[১৯১] ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে বিতরণকৃত

---

১৮৯. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩৪

১৯০. বাংলাদেশ ব্যাংক, *২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী*(ঢাকা : কৃষি ঋণ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১০

১৯১. প্রাগুক্ত।

ঋণের পরিমাণ ১৩ হাজার ৫০৪ দশমিক ৫৬ কোটি টাকা, আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১০ হাজার ২৩০ দশমিক ৩৫ কোটি টাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ২৫ হাজার ২৭১ দশমিক ২০ কোটি টাকা, বকেয়া ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭৮৮ দশমিক ২৯ কোটি টাকা এবং শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ১৭ হাজার ১৬৩ দশমিক ১৩ কোটি টাকা।[১৯২]

পরিশেষে বলা যায়, একটি দেশের উৎপাদন, সেবা, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, বিনিয়োগ প্রভৃতি খাতগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। সমন্বিতভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন যে খাতে অধিক বিনিয়োগ করে, তখন সে খাতকেই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। আর বিনিয়োগপ্রাপ্ত সকল খাতের সম্মিলিত উন্নয়নই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। তাছাড়া, কোন ধরনের আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া সম্ভব নয়। আর কেবল অর্থনৈতিক কার্যাবলিই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেষ কথা নয়। নিজেদের আর্থিক কার্যকলাপের পরিধি বৃদ্ধির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক এবং সেবামূলক কাজ করে সার্বিক কল্যাণকেও ত্বরান্বিত করে। কাজেই বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৯২. বাংলাদেশ ব্যাংক, *শিল্প ঋণের প্রতিবেদন*(ঢাকা : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টস, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ১-১১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং

সুদ পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। অপরদিকে, সুদ শারি'আহসম্মত অর্থব্যবস্থার নিষিদ্ধ একটি দিক। ইসলামে সুদকে মানবসভ্যতার অর্থনৈতিক ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু, বর্তমানে সুদের অভিশাপ মানবসমাজকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুদি লেনদেনের সাথে সকলেই সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক কার্যাবলি এমনিভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে যে, ইচ্ছা করলেও সুদ পরিহার করে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। সুদের এ ভয়াল রূপকে পাশ কাটিয়ে শারি'আহসম্মত লেনদেনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সুদমুক্ত ব্যাংকিং তথা ইসলামি ব্যাংকিং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের আওতায় আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ প্রদানের কাজগুলো ব্যাংক দ্বারাই শারি'আহসম্মত উপায়ে সম্পাদনের চেষ্টা করা হয় বলে সুদের সাথে জনসাধারণের সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা থাকে না। তাই অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

বিশ্বে সর্বপ্রথম ইসলামি অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ও সুদমুক্ত ব্যাংকিং কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে মিশরে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মহান আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য মিশরে সুদবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলনের যুগান্তকারী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যার নাম ছিল 'ইসলামি সেভিংস ব্যাংক'।[১৯৩] কিন্তু তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসেরের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাংকটি টিকে থাকতে পারেনি। তথাপি, অল্প সময়ের জন্যে হলেও ব্যাংকটির সাফল্য ছিল সন্তোষজনক। পরবর্তীতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক' এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিশ্বে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও ইসলামি অর্থনীতির ধারণা বিকশিত হয়।[১৯৪]

যেখানে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণা বিকাশে সময় লেগেছে কয়েক শতাব্দী সেখানে মাত্র কয়েক দশকেই সুদমুক্ত ব্যাংকিংব্যবস্থা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। শুধুমাত্র আরব দেশসমূহেই নয়; কৃষিপ্রধান, মধ্য ও স্বল্প আয়ের দেশসমূহও সুদমুক্ত ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের চার্টার স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজ দেশের ব্যাংকিং খাতে ইসলামি শারি'আহভিত্তিক লেনদেন চালু করার আশাবাদ ব্যক্ত করে।[১৯৫] কালক্রমে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ সুদমুক্ত ব্যাংকিংব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিংব্যবস্থা নানা চড়াই-উৎড়াই পার করে মোট

---

১৯৩. সাজ্জাদ সালাদীন, *সুদ*(ঢাকা : আনিসা পাবলিকেশন্স ও রাহেলা প্রকাশন, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৯৪

১৯৪. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

১৯৫. ড. মুহা. কামরুজ্জামান, *ইসলামি ব্যাংকের ইতিহাস ও ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*(ঢাকা : রিমঝিম প্রকাশনী, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৭০

ব্যাংকিং সেক্টরের এক-চতুর্থাংশ দখল করে আছে।[১৯৬] সে সাথে সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহও তাদের গতানুগতিক ব্যাংকিংব্যবস্থার পাশাপাশি সুদমুক্ত ব্যাংকিং শাখা চালু করছে যা এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রতি আস্থার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

ইসলামি ব্যাংকিং-এর উদ্দেশ্য : ইসলামি ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য হলো সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমান্তরাল পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নীতিমালায় সমতা নিরূপণ করা এবং সে সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামি শার'ইর রীতিনীতি অবলম্বন করা। এ পদ্ধতিতে এমন একটি অর্থব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যেখানে সুদের বিষয়টি থাকে অনুপস্থিত।[১৯৭] ব্যাংকগুলো এ ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুদ পরিহারপূর্বক লেনদেন পরিচালনা করে যাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত সামাজিক ব্যবস্থা চালু হয় এবং সুষ্ঠু আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো তৈরি হয়।[১৯৮]

ইসলামি ব্যাংকিং একটি অংশগ্রহণমূলক কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে। সুদমুক্ত লেনদেনের পাশাপাশি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের অংশীদার হয়ে সামাজিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করে। অর্থাৎ, ইসলামি ব্যাংকিং এমন একটি কর্মপন্থা নির্দেশ করে যা ব্যক্তি কল্যাণের চেয়ে জনকল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণকে বেশি উৎসাহিত করে। এ ধরনের ব্যাংকিং মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী লোকের অনৈতিক দাবিকে কখনো সমর্থন করে না। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অর্জনকে বড় করে না দেখে না এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলোকে দৃষ্টির অগোচরেও রাখে না। সুবিধাবঞ্চিত ও নিরূপায় জনগোষ্ঠীর জরুরি প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের জীবিকা নির্বাহের সহযোগিতার জন্য বেশ কিছু বিনিয়োগ ক্ষেত্র তৈরি ইসলামি ব্যাংকিং-এর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।[১৯৯]

ইসলামি ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিনিয়োগ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। ইসলামি ব্যাংকগুলো তাদের আর্থিক লেনদেনগুলো এমন কিছু সুবিধাবঞ্চিত লোকদের জন্য প্রণয়ন করে যারা দারিদ্র্যসীমার কারণে ব্যাংকিং-এর আওতায় এসে লেনদেনের সামর্থ্য রাখে না। সে জন্য ইসলামি ব্যাংকিং মানুষের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে কর্মপদ্ধতিকে সাজিয়ে রাখে যাতে দারিদ্র্য মাত্রাকে হ্রাস করে আনার জন্য উৎপাদনশীলতাকে কাজে লাগানো যায়।[২০০]

ইসলামি ব্যাংকিং সম্পদ ও কল্যাণ উভয়প্রকার অর্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখে। সমাজের কোন জনগোষ্ঠীর জন্য কোন প্রকার সম্পদ উৎপাদন জরুরি এবং সে ক্ষেত্রে কোন ধরনের সম্পদ বণ্টন পদ্ধতি উপযুক্ত সে বিষয়ে ইসলামি ব্যাংকিং আলোকপাত করে। মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের সম্ভাব্য কারণগুলো হ্রাস করে বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে আরও

---

১৯৬. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি*(ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২৫

১৯৭. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১৯৮. S.M. Ali Akkas & Others, *Text Book on Islamic Banking*(Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, 2008 AD), p. 59

১৯৯. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

২০০. ড. মাহফুজুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১০

কয়েক ধাপ এগিয়ে নিতেও ইসলামি ব্যাংকিং সাহায্য করে। সাধারণ দেনাদার-পাওনাদার সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে ইসলামি ব্যাংকিং ভোক্তার সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে। এভাবে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু ও গুণগত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[২০১]

ইসলামি ব্যাংকিং-এর বর্তমান অবস্থা : নিচের সারণীতে বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মধ্যে ২০১৭ থেকে ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত বিগত ছয় বছরের ইসলামি ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত, বিনিয়োগ, তারল্য, রেমিটেন্স, কৃষি বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত তালিকা আকারে উপস্থাপন করা হলো :[২০২]

(শতকরা হার %)

বিবরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
মোট আমানত	২৩.১৩	২৩.৫০	২৪.৬৫	২৫.৩৩	২৭.৮৯	২৬.৮০
মোট বিনিয়োগ	২৩.৮১	২৪.০৪	২৪.৮২	২৫.৬৯	২৭.৮৮	২৮.৯৮
মোট তারল্য	৮.৯৮	৮.৫৮	৯.২১	১৪.৩২	১৫.৪২	১০.০৬
মোট রেমিটেন্স	২৩.৮১	৪৩.	৩৫.৩৪	৪০.৫১	৪৯.১৮	৩৭.৬৩
কৃষি বিনিয়োগ	৮.২৬	৭.০০	২.৫৭	১৩.৪১	১৮.৯৯	১৪.৩৫
বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত	০.৯৪	০.৯৭	০.৯৪	০.৯০	০.৯০	০.৯২

উপরোক্ত সারণীতে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে মোট আমানতের ২৩.১৩ শতাংশই ছিল ইসলামি ব্যাংকিং খাতের। পরবর্তীতে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ২৬.৮০ শতাংশে এসে পৌঁছেছে। আমানত হারের এ চিত্র দেখে ব্যাংকিং খাতে আমানতের দিক থেকে গ্রাহকদের ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রতি আগ্রহের চিত্র ফুটে উঠে।

(ক) ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত থেকে প্রাপ্ত বিনিয়োগের মধ্যে ২৩.৮১ শতাংশই ছিল ইসলামি ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগ। ইসলামি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের খাতসমূহের ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে বিনিয়োগের হারও ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ইসলামি ব্যাংকিং খাত থেকে প্রাপ্ত বিনিয়োগের হার ২৮.৯৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

(খ) ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট তারল্যের মধ্যে ৮.৯৮ শতাংশ ছিল ইসলামি ব্যাংকিং খাতের তারল্যের পরিমাণ। বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত স্থিতিশীল রাখতে হলে তারল্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার বিকল্প নেই। তবে ইসলামি ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগ ও আমানত উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত তারল্যের হার বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অতিরিক্ত তারল্য হারের ঊর্ধ্বগতি থাকা সত্ত্বেও তা বিনিয়োগ ও আমানতের স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখতে প্রতিবন্ধক নয়। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মোট অতিরিক্ত তারল্যের ১০.০৬ শতাংশই ইসলামি ব্যাংকিং খাতের অংশ।

---

২০১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

২০২. Bangladesh Bank, *Quarterly Report of Development of Islamic Banks in Bangladesh, Jul-Sep'22*, ibid, p. 2

(গ) ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে দেশের ব্যাংকিং খাত মোট যে পরিমাণ ফরেন রেমিটেন্স আহরণ করেছে তার মধ্যে ২৩.৮১ শতাংশই ইসলামি ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে আহরিত হয়েছে। পরবর্তীতে এ হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৭.৬৩ শতাংশে গিয়ে পৌঁছায়। রেমিটেন্স আদায়ে ইসলামি ব্যাংকিং খাতের এ ঊর্ধ্বগতি ইসলামি ব্যাংকের প্রতি প্রবাসীদের আস্থা এবং ফরেন রেমিটেন্স আদায়ে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।

(ঘ) ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মোট ব্যাংকিং খাত থেকে প্রাপ্ত কৃষি বিনিয়োগের মাত্র ৮.২৬ শতাংশ ছিল ইসলামি ব্যাংকিং থেকে প্রাপ্ত কৃষি ঋণ। পরবর্তীতে ইসলামি ব্যাংকগুলো কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করায় এ হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ইসলামি ব্যাংকিং খাত থেকে প্রাপ্ত কৃষি বিনিয়োগের হার ১৪.৩৫ শতাংশ।

(ঙ) ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মোট ব্যাংকিং খাতের মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত ছিল ০.৯৪। পরবর্তীতে ইসলামি ব্যাংকগুলোর এ অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিশেষে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ি এ অনুপাত ছিল ০.৯২।

পরিশেষে বলা যায়, দেশের জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে ব্যাংকে আনা এবং আমানতকে বিনিয়োগের কাজে লাগিয়ে তা থেকে মুনাফা অর্জনে ইসলামি ব্যাংকগুলো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। সুদের কুফল থেকে জাতিকে রক্ষা করে ও ধর্মীয় নীতিবোধ জাগ্রত করে শারি'আহসম্মত লেনদেন পরিচালনায় ইসলামি ব্যাংকিং খাত যুগান্তকারী অবদান রাখছে। আর ইসলামি ব্যাংকিং খাতের উপর নির্ভর করেই ইসলামি বিমা ব্যবস্থা, ইসলামি পুঁজিবাজার এবং ইসলামি ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ইসলামি ব্যাংকিং খাত মুদারাবা ও মুশারাকা খাতে যে বিনিয়োগ করছে তা এখনো পর্যাপ্ত নয়। শারি'আহসম্মত লেনদেনকে উৎসাহিত করার জন্য মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ আরও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, নারী উদ্যোগ, বেসরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ, সরকারি সংস্থাগুলোর অর্থ সংকট মুকাবেলার জন্য বিনিয়োগ কার্যক্রম, পল্লী উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগের খাত প্রসারিত করে সুদমুক্ত ব্যাংকিংকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলোর পক্ষে কাজ করা সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিশ্লেষণ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি অর্থনীতির ধারণা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনীতি বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে উন্নয়ন অর্থনীতি অন্যতম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংজ্ঞা, মাপকাঠি, উপাদান ইত্যাদি উন্নয়ন অর্থনীতির অধীনে আলোচিত হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাও উন্নয়ন অর্থনীতির অংশ। আপাতঃদৃষ্টিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অর্থনীতির আলোকে বিবেচনা করলে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পর্যালোচনা করার সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন উভয়ই পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়। তাই দেশের অর্থনীতিতে কোন কিছুর প্রভাব বিশ্লেষণের সময় উভয়েই সমান গুরুত্বের দাবিদার।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন : অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়ার দ্বারা একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বিবেচনা করে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা হয়।[১] এটি কোন নির্দিষ্ট খাতের অগ্রগতিকে বিবেচনা না করে সামগ্রিকভাবে সকল খাতের সম্মিলিত অগ্রগতিকে বিবেচনা করে। অর্থনীতিবিদগণ একে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যার মাধ্যমে জাতীয় আয় দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমবর্ধমান থাকে। একে প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করার কারণ হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের প্রতিটি খাতের অগ্রগতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রতিটি খাতের অগ্রগতি নির্দিষ্ট কিছু শক্তির সম্মিলিত কার্যপ্রণালীর ফলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ সম্মিলিত শক্তিগুলো দীর্ঘকাল ধরে চলমান অবস্থায় থাকে এবং প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক অগ্রগতির নির্ধারকসমূহ ঊর্ধ্বমুখীভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এ ঊর্ধ্বগতি দীর্ঘমেয়াদে গিয়ে অথনৈতিক উন্নয়নে রূপ লাভ করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে যে নির্দেশকগুলো গুরুত্বপূর্ণ– অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলো তার মাঝে অন্যতম। সাধারণভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে জাতীয় উৎপাদন অথবা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে বুঝায়।[২] অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সামষ্টিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জনগণের জীবন যাত্রার মানকে নির্দেশ করে, কর রাজস্বের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে। 'প্রবৃদ্ধি' শব্দটি পরিবর্তনের হারকে নির্দেশ করে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চলমান বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে হারে পরিবর্তিত হয় তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

---

১. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি*(ঢাকা : সুদিপ্ত পাবলিকেশন্স, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

প্রবৃদ্ধি তিন ধরনের হতে পারে।[৩] ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি, ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি এবং শূন্য প্রবৃদ্ধি। পূর্বের বছরের তুলনায় বর্তমান বছরের জাতীয় আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি বলে। পূর্বের বছরের তুলনায় বর্তমান বছরের জাতীয় আয় যদি হ্রাস পায় তাহলে তাকে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি বলে। পূর্বের বছরের তুলনায় বর্তমান বছরের জাতীয় আয় যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে তাকে শূন্য প্রবৃদ্ধি বলে।

জাতীয় আয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাব : জাতীয় আয়কে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে এর অর্থ হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির হার দ্বারাই বুঝা যায়।[৪] কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির হার ছাড়াও আরও অনেক নির্ধারকের উপর নির্ভর করে। সে সকল নির্ধারককে অনেক সময় সংখ্যাগতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে সংখ্যাগত মান দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করলেও প্রবৃদ্ধির হার উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের দিকে অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার সময় মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিকে বিবেচনা করা শুরু হয়। সে সময় মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমার্থক হিসেবে ধারণা করা হত। এ ধারণাকে 'Trickle Down Theory'[৫] নামে অভিহিত করা হত। এ তথ্যের অধীনে অর্থনীতিবিদগণের অনুন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদগণের মতামত ছিল যে, সম্পদকে প্রাথমিকভাবে বাড়তে দেয়া হোক। সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি পরে বিবেচনায় আনা যাবে। সে সময় শুধুমাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু বর্ধিত জাতীয় আয় সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণের জন্য কিভাবে ব্যবহার করা হবে সে বিষয়টি নিয়ে সে সময় অর্থনীতিবিদগণ ভাবেননি। কিন্তু জাতীয় আয়কে সকল স্তরের জনগণের কাজে লাগানোর জন্য যদি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হয় তাহলে তা বিবেচনায় আনাটা খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। সে সময় দেখা যায় শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিই সামনে আসে। সে সময় একটি দেশের মোট ভোগযোগ্য সম্পদের চেয়েও অধিক পরিমাণে উৎপাদনকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক হিসেবে দেখা হত।

'Trickle Down Theory'-এর ব্যর্থতা প্রথম বুঝা যায় ষাটের দশকে।[৬] কারণ এতদিনে তৃতীয় বিশ্বের অনেক অনুন্নত দেশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও খুব একটি উন্নয়নের মুখ দেখেনি। বরং দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাস না পাওয়ায় আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সে জন্য সত্তরের দশকের শুরু থেকেই দারিদ্র্য

---

৩. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪. রিজওয়ানুল ইসলাম, *উন্নয়নের অর্থনীতি*(ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৫-৭

৫. 'অর্থনীতিবিদগণ ধারণা করতেন যে, জাতীয় আয় যত বাড়বে তার সুফল ধীরে ধীরে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। সে সময় ধারণা করা হত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া মানে নিম্ন আয়ের জনগণের আয়ও বৃদ্ধি পাওয়া। আর আয় বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায়।' দ্র. Thomas Sowell, *Trickle Down Theory and Tax Cuts for the Rich*(California : Hoover Institution Press, 20212 AD), p. 8

৬. Ben Olinsky and Asher Mayerson, *Trickle-Down Economics and Broken Promises : How Inequality Is Holding Back Our Economy*(Washington DC : Center for American Progress, December 4, 2013 AD), p. 1

হ্রাস এবং আয়ের জ্বষম্য নিয়ে গবেষণা শুরু হলে দেখা যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে খুব একটা পৌঁছায়নি। তা ছাড়া গবেষণায় কৃষিতে অপূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থানের বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়। সবচেয়ে অবাক হওয়ার মত বিষয়টি হলো, সে সময় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি যেমন পেয়েছে, তেমনি সে সকল দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটেছে।

গবেষণায় এ ধরনের ফলাফলের পর সারাবিশ্বে অর্থনীতিবিদগণ দারিদ্র্য হ্রাসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভূমিকা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। বাস্তবতা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে মূলত অর্থনীতির ক্ষুদ্র অংশে অর্থাৎ, শিল্প অথবা বাণিজ্যিক খাতে। কারণ, শিল্পখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় উৎপাদনও বেশি হয়। কিন্তু জনসংখ্যার বিরাট একটা অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল।

কৃষি জমির অসম বণ্টন এবং বৃহদায়তন শিল্পের প্রসারের কারণে প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির ক্ষুদ্র একটি অংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যদি সে ক্ষুদ্র অংশে বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হয় তাহলে উন্নয়ন খুব একটা সাধিত হয় না। তাই সে সময় দেখা যায়, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল মূলত বৃহৎ এবং মধ্যম পর্যায়ের খামারে যা থেকে প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীন শ্রমিকগণ বিশেষ কোন সুবিধা পায়নি। আর পুঁজি কেন্দ্রিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রসারের সুফল দরিদ্রদের কাছে পৌঁছায়নি। এ ধরনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই আয়ের বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে না। তখনই অর্থনীতিবিদগণ অনুধাবন করলেন যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপের সাথে সাথে আয়ের সুষম বণ্টনের জন্য এবং দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎস : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মূলত শ্রমের উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎস হিসেবে আরও অন্যান্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।[৭] যেমন :

(ক) শ্রমের প্রবৃদ্ধি : সাধরণভাবে ধারণা করা হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। শ্রমের যোগান বাড়লে উৎপাদনের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।[৮] উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষণ হিসেবে দেখা হয়।

(খ) মূলধন গঠন : উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, জনসংখ্যার তুলনায় মূলধন গঠনের হার বেশি হওয়ায় তা প্রবৃদ্ধিতে রূপ নিয়েছে।[৯] মূলধন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আবার শ্রমের প্রবৃদ্ধির তুলনায় মূলধন প্রবৃদ্ধির হার বেশি হলে জনগণের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। সাধারণত সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মাধ্যমেই মূলধন গঠিত হয়। তাই চলতি সময়ে ভোগ হ্রাস করে সঞ্চয় বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত না হয়ে ভবিষ্যতে মূলধন জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োজিত হবে; এতে মূলধনের গঠন বাড়বে।

---

৭. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৮. Richard R. Nelson, *The Sources of Economic Growth*(Cambridge : Harvard University Press, 2000 AD), p. 9

৯. ibid, p. 52

কৌশলগত উন্নয়ন : মূলধনের মজুদ এবং শ্রমের পরিমাণ ঠিক রেখে মোট উৎপাদন বাড়লে কৌশলগত উন্নয়ন গঠন হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[১০] কারণ মূলধন এবং শ্রমের সাথে সাথে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তার দ্বারা কৌশলগত উন্নয়ন সম্ভব হয়। ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে গণ্য হবে বলে ধারণা করা যায়। মূলধন, শ্রম এবং প্রযুক্তির সম্মিলনের কারণেই উন্নত দেশসমূহে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বলা যায়। আর কৌশলগত উন্নয়নের ফলে মূলধনের উপর ক্রমহ্রাসমান বিধি প্রযোজ্য হয় না বিধায় জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পিছনে কৌশলগত উন্নয়নের অবদান পরিলক্ষিত হয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্ধারকসমূহ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বল্পমেয়াদি কোন বিষয় নয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেকগুলো নির্ধারকের উপর নির্ভর করে। নির্ধারকগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদান যেমন আছে, তেমনি অনর্থনৈতিক উপাদানও আছে। বিভিন্ন নির্ধারকের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে তা এক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নে রূপ নেয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্ধারকসমূহকে অর্থনৈতিক নির্ধারক ও অ-অর্থনৈতিক নির্ধারক– এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়।[১১] নিম্নে এতদসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো :

(ক) অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ : সাধারণত যে সকল নির্ধারক সরাসরি উৎপাদনে কাজে লাগে সেগুলোকেই অর্থনৈতিক নির্ধারক বলে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো :

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ : ভূমি, আবহাওয়া, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, পানি, বনজ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ এ রকম সবকিছু প্রাকৃতিক সম্পদের আওতায় পড়ে।[১২] যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি সে দেশের উন্নয়ন ঘটার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে সরাসরি উৎপাদনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। তাই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য যদি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবেই।

(২) মানবসম্পদ : দক্ষ ও উন্নত মানবসম্পদ উৎপাদনের উপকরণকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি চলমান থাকা আবশ্যক।[১৩] কারণ দক্ষতাকে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে আধুনিকায়ন না করলে বিশ্বের সাথে তাল মিলানো সম্ভব হয় না।

(৩) মূলধন গঠন : উৎপাদনের জন্য মূলধন প্রয়োজন। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। মূলধন বিনিয়োগকে বৃদ্ধি করে।[১৪] বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন কৌশলও উন্নত হয়। আবার

---

১০. Richard R. Nelson, *The Sources of Economic Growth*, ibid, p. 233

১১. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৫

১২. Shunsuke Managi, *Technology, Natural Resources and Economic Growth : Improving the Environment for a Greener Future*(UK : Edward Elgar Publishing Limited, September 29, 2011 AD), p. 3

১৩. Andreas Savvides and Thanasis Stengos, *Human Capital and Economic Growth* (California : Stanford University Press, 2008 AD), pp. 14-19

১৪. Michael J. Baskin and Lawrence J. Lau, *Capital Formation and Economic Growth* (Washington DC : National Academies Press, 1991 AD), p. 47

মূলধন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবকাঠামো, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি ঘটে। তাই মূলধন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

(৪) উদ্যোক্তা : অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন যেমন প্রয়োজন তেমনি কাজগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে এমন ঝুঁকি গ্রহণকারী মানসিকতার উদ্যোক্তাও দরকার। উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্ত থাকলেও উপকরণগুলো কোথায়, কিভাবে, কি পরিমাণে কাজে লাগাতে হবে তার সঠিক ধারণা কেবল উদ্যোগ গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরাই দিতে পারে।[১৫] আর এ ধারণা থাকলেই হয় না। উদ্যোগ থেকে যদি পর্যাপ্ত লাভ নাও হয় অথবা ক্ষতি হয় তাহলে তা সামাল দেয়ার মনোভাবও থাকতে হয়। আর দক্ষ উদ্যোক্তাই এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারে। তাই দক্ষ উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম উপকরণ।

(৫) প্রযুক্তি : বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, এমন আবিষ্কার যা প্রযুক্তির উন্নয়নে সহায়ক, পণ্য উৎপাদনে সহায়ক, এমন উন্নয়ন যা প্রচলিত প্রযুক্তির আধুনিকায়নে সহায়ক প্রভৃতি প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিজনিত কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব।[১৬] স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তির বিকল্প নেই। প্রযুক্তি ছাড়া বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়।

(৬) শ্রম বিভাগ ও মাত্রাগত উৎপাদন : উৎপাদনের সাথে জড়িত কাজগুলোকে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব বিন্যস্ত করে দেয়ার মাধ্যমে কাজে গতিশীলতা আনার প্রক্রিয়াকে শ্রম বিভাগ বলে। আবার পারিপার্শ্বিক সকল উপাদান অপরিবর্তিত রেখে উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহারের মাত্রা পরিবর্তন করে উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।[১৭]

(৭) অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন : একটি দেশের অর্থব্যবস্থা যে খাতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে তার উপরই অর্থনীতির কাঠামো নির্ভর করে। যখন একটি দেশ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হয় তখন এ পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্য অনেক দিক থেকেই পরিবর্তন আসে। জনগণের জীবনযাত্রা, মানসিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ইত্যাদি বিভিন্ন দিকেই পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তন দেশের পণ্য ও সেবার উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে দেশ এগিয়ে যায়।

(খ) অ-অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ : যে উপাদানগুলো সরাসরি উৎপাদনে কাজে লাগে না, কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রবৃদ্ধিজনিত কাজে অংশ নেয় তাদের অ-অর্থনৈতিক নির্ধারক বলে। নিচে অ-অর্থনৈতিক নির্ধারক বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

---

১৫. David B. Audretsch, Max C. Keilbach, Erik E. Lehmann, *Entrepreneurship and Economic Growth* (New York : Oxfor University Press, 2006 AD), p. 57

১৬. David C. Mowery, Nathan Rosenberg, *Technology and the Pursuit of Economic Growth* (Cambridge : Cambridge University Press, 1991 AD), p. 3

১৭. O'Sullivan and Steven M. Sheffrin, *Economics : Principles in Action*(New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2003 AD), p. 157

(১) সামাজিক উপাদানসমুহ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি জনগণের মনোভাব, সামাজিক মূল্যবোধ, জীবনযাত্রা মানোন্নয়ন, সমাজে প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি, অনুশাসন, প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই অর্থনৈতিক কার্যাবলি আবর্তিত হয়। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সামাজিক উপাদানসমূহ অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

(২) রাজনৈতিক উপাদান : একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে সরকারের পক্ষে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হয়। তাতে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তাই রাজনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক।[১৮]

(৩) সুশাসন ও প্রশাসনিক দক্ষতা : সরকারের নির্ধারিত প্রতিটি বিভাগ যদি নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারে তাহলে প্রতিটি খাতে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিটি বিভাগ দুর্নীতির পরিবর্তে সুশাসনের দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে পারে।[১৯] তাতে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়; প্রশাসনিক দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। আর সরকার প্রবৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজের জন্য তার বিভিন্ন বিভাগের উপরই নির্ভর শীল। তাই সুশাসন ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

(৪) ধর্মীয় উপাদান : ধর্মীয় সহনশীলতা, পারস্পরিক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সম্প্রীতি, সহাবস্থান প্রভৃতির ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা দৃঢ় হয়।[২০] সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকলে সরকারের পক্ষে প্রবৃদ্ধিজনিত কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করা সহজ হয়। আর ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা বজায় থাকলে উন্নয়ন সাধিত হলেও তা বেশিদিন টিকে থাকে না। তাই ধর্মীয় উপাদানসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণার মাঝে সাদৃশ্য থাকলেও মূলত দু'টি ভিন্ন বিষয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাণগত ধারণা প্রকাশ করে। অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন গুণগত ধারণা প্রকাশ করে। তবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে আর্থিক ও অনার্থিক– উভয় ধরনের নির্দেশকই বিদ্যমান। তাই একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করার জন্য প্রবৃদ্ধির উৎস ও নির্দেশকসমূহ পরিমাপ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

---

১৮. মোহাঃ শাহজাহান, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল*(ঢাকা : এসজেএফ বাংলাদেশ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৫৮৬

১৯. আবুল বারকাত, *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*(ঢাকা : মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৯৬

২০. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১-৩৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিশ্লেষণ

অর্থনৈতিক সমীক্ষা একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য কোন খাতে, কি পরিমাণ সম্পদ কাজে লাগানো উচিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে সে ধারণা পাওয়া যায়। আবার, জাতীয় কোন খাতে উন্নয়নের ঘাটতি রয়েছে, কোন কোন খাতে বাজেট সরবরাহ দরকার তার নির্দেশনাও অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা সামষ্টিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক পরিস্থিতি এবং যে সকল খাত বিশেষ নজরদারির দাবি রাখে সে সকল খাত নিয়ে আলোচনা করে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২ এর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হলো:

সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা : করোনা ভাইরাস মাহমারির কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার যে অধঃপতন হয়েছিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তার কিছুটা উন্নয়ন শুরু হয়েছিল। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পুনরায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে যার প্রভাব বাংলাদেশের উপর পড়ে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বৈশ্বিক অর্থনীতির ৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত এ হার ৩.৫ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা যায়।[২১] বিশ্বব্যাংকের অনুমান অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনীতি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধি পাবে ৩.২ শতাংশ।[২২] আইএমএফ-এর হিসাব অনুযায়ী এ হার ২০২২ এবং ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে উভয় অর্থবছরেই ৩.৬ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উপর বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার মোট ২৮টি প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়।[২৩]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ৭.২৫ শতাংশ এবং মাথা পিছু আয় লক্ষ্য করা যায় ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার।[২৪] মুদ্রাস্ফীতির হার পরিলক্ষিত হয় ৫.৮ শতাংশ।[২৫] রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আমদানি ব্যয় প্রায় ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৪০.১ ও ৬১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২৬] ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাস পেয়েছে প্রায় ১.৯

---

২১. United Nations Department of Economic and Social Affairs, *World Economic Situation and Prospects 2022*(Nrw York : United Nations Publication, 2022 AD), p. 1

২২. World Bank Group, *Global Economic Prospects, January, 2023*(Washington DC : World Bank Publications, 2023 AD), p. 3

২৩. International Monetary Fund, *World Economic Outlook Update : Inflation Peaking Amid Low Growth*(Washington DC : IMF Publication Services, 2023 AD), p. 1

২৪. Staff Correspendence, *Bangladesh Economy Grows 7.25% in FY22 : BBS*(Dhaka : The Daily Star, September 13, 2022AD), see. https://www.thedailystar.net/business/news/bangladesh-economy-grows-725-fy22-bbs-3020436, visited on 16.02.2023 AD

২৫. Bangladesh Bureau of Statistics, *Consumer Price Index and Inflation Rate, December 2022*(Dhaka : Statistics and Information Division 2022 AD), p. 1

২৬. Bangladesh Bureau of Statistics, *Foreign Trade Statistics, November 2022*(Dhaka : Statistics and Information Division 2023 AD), p. 1

শতাংশ।[২৭] উক্ত অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল সময়ে বৈদেশিক রেমিট্যান্স সংগৃহীত হয় ১৭.৩১ মার্কিন ডলার ও বৈদেশিক রিজার্ভের অবস্থান দাঁড়ায় ৪৪.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, আর্থিক প্রণোদনা, পদ্মা ব্রিজের মত মেগা প্রজেক্ট– এ দিকগুলো বিবেচনা করে বলা যায় বাংলাদেশ আর্থিক সংকট এবং করোনা মহামারির কারণে সংঘটিত আর্থিক মন্দা কাটিয়ে পূর্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ফিরে যাবে।

জিডিপি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ : ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি হ্রাস পেয়ে তা ৭.৮৮ শতাংশ থেকে ৩.৪৫ শতাংশে নেমে আসে। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৯৪ শতাংশে পৌঁছায়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাথপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট জাতীয় আয় যথাক্রমে ছিল ২ হাজার ৪৬২ এবং ২ হাজার ৫৯১ মার্কিন ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ হাজার ৭২৩ এবং ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার।[২৮] করোনা প্রাদুর্ভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষি খাত। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি খাতে ৩.৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ হার কিছুটা কমে ৩.১৭ শতাংশে নেমে আসে। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে এ হার অনেকখানি হ্রাস পেয়ে ২.২০ শতাংশে নেমে আসে।[২৯]

২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ১১.৬৩ শতাংশ থেকে অনেকখানি হ্রাস পেয়ে ৩.৬৯ শতাংশে নেমে আসে। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ১০.২৯ শতাংশ হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.৪৪ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃহৎ পরিসেবা খাতে প্রবৃদ্ধি ১.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৯৩ শতাংশ থেকে ৫.৭৩ শতাংশে পৌঁছায়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প এবং পরিসেবা খাতের হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১.৫০, ৩৭.০৭ ও ৫১.৪৪ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ হার ছিল যথাক্রমে ১২.০৭, ৩৬.০১ ও ৫১.৯২ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয়ের হার ৭৮.৪৪ শতাংশ হয়। মোট জাতীয় সঞ্চয় ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ২৫.৩৪ শতাংশ যা ২০২১-২২ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ২১.৫৬ শতাংশ হয়। মোট দেশিয় সঞ্চয় ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৩০.৭৯ শতাংশ যা ২০২১-২২ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ২৫.৪৫ শতাংশ হয়। বিনিয়োগ ও জিডিপির অনুপাত ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩১.০২ শতাংশ ছিল যা ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.৬৮ শতাংশ হয়।[৩০]

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দা দেখা দেয়ায় বাজার ব্যবস্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এপ্রিল ২০২২-এ International Monetary Fund (IMF)-এর রিপোর্ট অনুয়ায়ী উন্নত দেশে মুদ্রাস্ফীতি অনুমান করা হয়েছে ৫.৭ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশে

---

২৭. AKM Zamir Uddin, *Taka Falls against USD once again*(Dhaka : The Daily Star, September 13, 2022AD), see. https://www.thedailystar.net/business/economy/news/taka-falls-against-usd-once-again-3117926, 16.02.2023 AD

২৮. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যান : ২০২১-২২ অর্থবছরের জিডিপির সাময়িক হিসাব এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব*(ঢাকা : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৩

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. xi

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. xii

এর পরিমাণ ৮.৭ শতাংশ যা জানুয়ারি ২০২২ এ ছিল যথাক্রমে ৩.৯ ও ৫.৯ শতাংশ। বাংলাদেশে গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে গড় মূল্যস্ফীতি হয় ৫.৮৩ শতাংশ যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৫.৫৬ শতাংশ।[৩১]

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের যোগান অব্যাহত রাখা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল লোকজন যাতে ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারে সে জন্য ১ কোটি মানুষকে বিশেষ রেশন কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে।[৩২]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে ১৫ বছর বয়সের বেশি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী ছিল ৬.৩৫ কোটি যার মধ্যে ৬.০৮ কোটি জনগোষ্ঠীই বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত ছিল। জরিপ অনুযায়ী কৃষি খাতে জড়িত জনবলের হার ছিল ৪০.৬০ শতাংশ যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ২.১০ শতাংশ কম। অন্যদিকে সেবা খাতে জড়িত জনবল ২০.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.০ শতাংশে পৌঁছায়। ২০১০-১১ অর্থবছরের ভিত্তিতে বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক অনুয়ায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে নামমাত্র মজুরি হারের সূচক বেড়েছে ১৮০.৮৩। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৬.১৭ লাখ কর্মক্ষম লোক কর্মসংস্থান নিয়ে প্রবাসে গেছে যার পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫.৭৬ লাখ।[৩৩] ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসীদের থেকে রেমিটেন্স সংগৃহীত হয়েছে ২৪ হাজার ৭৭৭ দশমিক ৭১ মার্কিন ডলার যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের চেয়ে ৩৬.১০ শতাংশ বেশি। রেমিটেন্স পাঠানোর খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার ২.৫০ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করেছে।[৩৪]

আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা : ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি যা মোট জাতীয় উৎপাদনের ৯.৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব ৩ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি যা মোট জাতীয় উৎপাদনের ৮.৩০ শতাংশ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বহির্ভূত উৎস থেকে সংগৃহীত আয়কর রাজস্ব ১৬ হাজার কোটি টাকা যা মোট জাতীয় উৎপাদনের ০.৪০ শতাংশ। কর বহির্ভূত রাজস্ব ৪৩ হাজার কোটি টাকা যা মোট জাতীয় উৎপাদনের ১.০৮ শতাংশ। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজস্ব আয় দাঁড়ায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার ১১৬ কোটিতে যা পূর্বের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৩৯ শতাংশ বেশি এবং মূল লক্ষ্যমাত্রার ৫৭.৮৭ শতাংশ।[৩৫]

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত হয় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রকৃত রাজস্ব আদায় হয় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৭১ কোটি

---

৩১. International Monetary Fund, *World Economic Outlook Update : Inflation Peaking Amid Low Growth*, ibid, p. 5

৩২. বিশেষ প্রতিনিধি, *রেশন কার্ড পাবে ১ কোটি পরিবার, ঘোষণা শিগগিরই : প্রধানমন্ত্রী*(ঢাকা : বাংলা ট্রিবিউন, আগস্ট ২১, ২০২২খ্রি.), দ্র. https://www.banglatribune.com/national/759124, visited on 16.02.2023 AD

৩৩. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২*(ঢাকা : অর্থ বিভাগ, জুন ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৯-২৫

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৩৫. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, *২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের বিবরণী*,(ঢাকা : গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৫

যা পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৮.৮১ শতাংশ বেশি এবং যা মূল লক্ষ্যমাত্রার ৬২.২৬ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫০০ কোটি যা মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৪.৯৩ শতাংশ এবং পূর্বের অর্থবছরের চেয়ে ১০.১১ শতাংশ বেশি।[৩৬]

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরে হয় ২ লক্ষ ৭ হাজার ৫৫০ কোটি যা পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় ৫.০১ শতাংশ বেশি। সরকার প্রতিনিয়ত দক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি মোট জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশের মধ্যে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট ঘাটতির সহ্যমাত্রা ৫.১ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে প্রকৃত বাজেট ঘটতি ২০১৯-২০ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে যথাক্রমে দাঁড়ায় ৪.৭ ও ৪.৩ শতাংশ।[৩৭]

বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদান ২০১৯-২০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের পরিমাণ হয় ৫ হাজার ৮৯৯ মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৬৩ শতাংশ বেশি। বিদেশি ঋণের পরিমাণ ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ৫৫ হাজার ৮২৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যা মোট জাতীয় উৎপাদনের ১২.২৩ শতাংশ।[৩৮]

২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছিল যথাক্রমে ১৫.০ ও ১৭.৮ শতাংশ। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৯.৪৫ ও ১৩.৩২ শতাংশ হয়েছে যা পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১৩.৩৫ ও ৯.০৬ শতাংশ।[৩৯]

ঋণের ভারিত সুদ হার ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৭.৪৮ শতাংশ যা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ ৭.১০ শতাংশে পৌঁছে। আমানতের ভারিত গড় সুদহার ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৪.৪৪ শতাংশ যা ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ৪.০২ শতাংশে এসে পৌঁছায়। ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সুদের হার সম্পর্কিত নীতি, ব্যাংকের হার ও পুনঃআদায়ের স্কিমের সুদহার হ্রাসকরণ ইত্যাদি কারণে বাজারভিত্তিক সুদহার হ্রাস পেয়েছে। পুঁজি বাজারের মূলধন ও মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ইনডেক্স অনুযায়ী জুন ২০২১-এর তুলনায় এপ্রিল ২০২২ শেষে মূলধন ও বৃহৎ সূচক বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৪.৪১ ও ৬.৫৯ শতাংশ। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর বাজার মূলধন ও সঠিক মূল্য সূচক বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৬.০৩ ও ১১.৬৭ শতাংশ।[৪০]

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি : করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে জ্বশ্বিক অর্থনীতি বিঘ্নিত হলেও ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন শুরু হয়। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে একদিকে বিশ্ববাজার পরিস্থিতি যেমন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তেমনি অন্যদিকে মূল্যস্ফীতিও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।[৪১] এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২

---

৩৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ২০২১-২২ *অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের বিবরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৩৭. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪১. International Monetary Fund, *World Economic Outlook Update : War Sets Back the Global Recovery*(Washington DC : IMF Publication Services, April 2022 AD), p. 1

অর্থবছরে জুলাই-এপ্রিল সময়ে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৫.১৪ শতাংশ বেশি।[৪২]

জুলাই-মার্চ ২০২১-২২ সময়ে আমদানি ব্যয় হয়েছে ৬৬ হাজার ৪৯৮ দশমিক ৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৩.৮৪ শতাংশ বেশি। রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে ২২ হাজার ৩০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১২ হাজার ৬৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৪৩]

বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় এবং ফরেন রেমিটেন্স কমে যাওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরে চলতি হিসাব খাতে ১২ হাজার ৮৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা দেয়। তবে বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা কর্তৃক ঋণপ্রাপ্তির কারণে মূলধন ও আর্থিক উভয় হিসাবে উদ্বৃত্ত ঘটে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি মাসে সার্বিক লেনদেন ভারসম্য ২ হাজার ২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা দেয়। তবে পূর্বের অর্থবছরের একই সময়ে এ উদ্বৃত্ত ছিল ৬ হাজার ৮৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ হয়েছে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৪৪]

কৃষিখাতে পরিকল্পনা : ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪৬৫.৮৩ লক্ষ ও সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৯.৫০ লক্ষ মেট্রিকটন। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারিতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০.৫৯ লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। বার্ষিক পর্যায়ে যার পরিমাণ ২৭.৬৯ লক্ষ মেট্রিকটন।[৪৫] ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে কৃষকদের ভর্তুকির জন্য ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং বীজ উৎপাদনের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[৪৬]

শিল্প খাত : রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য বিশেষ তহবিল ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের জন্য চলতি মূলধন সুবিধা ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের জন্য চলতি মূলধন সুবিধা প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে শিল্প খাতে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে উৎপাদন সূচক ১৮.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৭.৬৫ শতাংশে পৌঁছে।[৪৭]

বিদ্যুৎ খাত : জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২২ হাজার ৬৬ মেগাওয়াট। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি ঘন্টায় ৫৬০ কিলোওয়াট। জ্বালানির ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে ফার্নেস ওয়েলের মাধ্যমে ২৭.৪৬ শতাংশ, ডিজেলের মাধ্যমে ৫.৮৫ শতাংশ, কয়লার মাধ্যমে ৮.০১ শতাংশ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে ১.০৪ শতাংশ,

---

৪২. Bangladesh Bank, *Annual Export Receipts of Goods and Services 2021-2022*(Dhaka : Statistics Department, 2022 AD), p. iv

৪৩. Bangladesh Bank, *Annual Import Payments of Goods and Services 2021-2022*(Dhaka : Statistics Department, 2022 AD), p. iv

৪৪. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৪৫. Bangladesh Bureau of Statistics, *Yearbook of Agricultural Statistics 2021*(Dhaka : Statistics and Information Division 2022 AD), pp. xvii-xviii

৪৬. কৃষি মন্ত্রণালয়, *২০২১-২২ অর্থবছরের পরিচালনা বাজেট*(ঢাকা : বাংলাদেশ সচিবালয়, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩

৪৭. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

জলবিদ্যুৎ ১.০৪ শতাংশ, প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে ৫১.৩৫ ও আমদানিকৃত বিদ্যুৎ ৫.২৬ শতাংশ। উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ ৫.০০ শতাংশ, সরকারি মালিকানায় ৪৫৪.০০ শতাংশ, বেসরকারি মালিকানায় ৪৪.০০ শতাংশ ও যৌথ উদ্যোগে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৬.০০ শতাংশ।[৪৮]

পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত : দেশের সকল স্তরে কাজের গতিশীলতা আনয়নের জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত দেশে মোট মহাসড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ২২ হাজার ৪৩৩ কিলোমিটার। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে, ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের নতুন সংযোজন। ২০১৬ থেকে ২০৪৫ খ্রি. পর্যন্ত মোট ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৬২ টাকার ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। দেশে মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩ হাজার ৯৩ কিলোমিটার। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৯টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সেবা প্রদান করছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত দেশে মোট মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৮.১৫ কোটি। এ সময়ে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২.২৮ কোটি।

মানবসম্পদ উন্নয়ন : মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩০ তম। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ২৪.১৩ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যয়িত হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতগুলোতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১,৫৫,৫২২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন : ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আর্থিক প্রণোদনা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, দুস্থ, বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের জন্য ভাতা চালু প্রভৃতি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।

বেসরকারি বিনিয়োগ খাত : ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট জিডিপিতে মোট বিনিয়োগের হার ৩১.৬৮ শতাংশ, যার মধ্যে ২৪.০৬ শতাংশ বেসরকারি বিনিয়োগ। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ১ হাজার ৮০৩ দশমিক ৪ মার্কিন ডলার।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় উল্লেখযোগ্য খাতসমূহের চলমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। অর্থনৈতিক খাতসমূহে পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। জনসাধারণের সার্বিক জীবনযাত্রার মান ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিণতিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার যে প্রভাব বাংলাদেশের উপর পড়েছিল, সরকারের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের কারণে তা অনেকাংশেই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

---

৪৮. সম্পাদনা পরিষদ, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২*(ঢাকা : বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি অর্থনীতির ধারণা

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন বিভিন্ন রকম আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সেভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় নানা ব্যক্তির প্রয়োজনে ভিন্নতা বিদ্যমান। প্রয়োজনের ভিন্নতার পাশাপাশি প্রয়োজনের শ্রেণিও ভিন্ন হয়। প্রয়োজনে যদি ভিন্নতা থাকে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন কখনো একেবারে একই সময়ে, একইভাবে পূরণ করা সম্ভব না। সে ক্ষেত্রে সঠিক নির্বাচন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সঠিক সময়ে সঠিক সম্পদের সদ্ব্যবহারই প্রয়োজন পূরণের মূল উপায়। সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে প্রয়োজনকে নির্বাচন করে তা পূরণের জন্য সঠিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে অর্থনীতি বলে। আর প্রয়োজন নির্বাচন এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারজনিত কার্যাবলি যদি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয় তখন তা ইসলামি অর্থনীতির আওতায় পড়ে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন।'[৪৯] তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ সা. আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। রসুল সা. বলেছেন, 'হালাল রিযক অন্বেষণ করা আল্লাহ তায়ালার ফরয ইবাদতের পর সবচেয়ে বড় ফরয।'[৫০] অর্থনীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা রিযক অন্বেষণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আর ইবাদত গৃহীত হওয়ার জন্য রিযক হালাল হওয়া অত্যাবশ্যক। রিযক উপার্জন কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হলে তা হারাম বলে সাব্যস্ত হয়। কারণ রিযক অন্বেষণ এবং ভোগ করার প্রক্রিয়া কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হলে সে জীবনকে তাওয়াক্কুলের সাথে বা আল্লাহর উপর ভরসা করে পালন করা জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে অভিহিত করা যায় না।[৫১]

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব যুগ থেকে শুরু করে যে সুদখোর এবং পুঁজিপতিদের দৌরাত্ম্য জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল সে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে তৎকালীন ও বর্তমান মুসলিম উম্মাহকে পরিশুদ্ধ করার জন্য রসুল সা. আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত পন্থায় কল্যাণকর কার্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যই পৃথিবীতে আবির্ভুত হন। তার গৃহীত পদক্ষেপেই হালাল ও সুশৃঙ্খল পন্থায় উপার্জনের পথে বর্তমান পর্যন্ত মানব জাতিকে পরিচালিত করছে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে রসুল সা. হালাল পথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার যে প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন তা-ই ক্রমে ইসলামি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নামাজ শেষ হওয়ার পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় ও আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযক) অন্বেষণ কর।'[৫২] আবার রিযক অন্বেষণের ক্ষেত্রে ইসলামে মানবজাতিকে লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারি, মজুতদারি, জুয়া, ছিনতাই, প্রতারণা, চুরি,

---

৪৯. আল কুরআন, ৩ : ১৯

৫০. আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবন আলি আল বাইহাকি, *আল সুনানুল কুবরা*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি.), খ. ৬, পৃ. ২১১, হাদিস নং ১১৬৯৫

৫১. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৬০-৬১

৫২. আল কুরআন, ৬২ : ১০

ডাকাতি, দখলদারি এ সকল অবৈধ কাজকে ইসলামে হারাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। সম্পদের সুষম বণ্টনের নিশ্চয়তা প্রদান করে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। যাকাতকে ফরয ঘোষণা করে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে, 'তোমরা নামায কায়িম কর ও যাকাত প্রদান কর।'[৫৩] যাকাত ইসলামের ৫টি রুকনের মাঝে অন্যতম। এ যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের যথাযথ বণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামি অর্থনীতির উদ্দেশ্য।[৫৪]

অপরপক্ষে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অপব্যয়, অযথা কার্পণ্য এবং অযাচিত বিলাসতাকে বর্জন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না। কারণ অপব্যয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।'[৫৫] পক্ষান্তরে অনর্থক কৃপণতাকেও আবার আল্লাহ নিরুৎসাহিত করেছেন।[৫৬] ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন। এ মধ্যম পন্থা একমাত্র ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব। অহেতুক কৃপণতা, ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।'[৫৭]

ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে সুদ ও ঘুষের দৌরাত্ম্য এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যা অর্থনৈতিক বাজারব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল। পবিত্র কুরআনে সুদের বিরোধিতা করে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।'[৫৮] ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য বৃহত্তর পর্যায়ে কল্যাণ সাধন। আর বৃহত্তর পর্যায়ে কল্যাণ সাধনের জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন অত্যাবশ্যক। ইসলামি অর্থব্যবস্থার কার্যাবলি এমন প্রক্রিয়ায় নির্দেশিত হয় যে, এ ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হয়। ইসলামি অর্থব্যবস্থা জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ রিযকদাতা ও তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।'[৫৯] অর্থাৎ জীবিকার নিশ্চয়তা স্বয়ৎ আল্লাহ তা'আলাই প্রদান করেছেন। মানুষের দায়িত্ব কেবল আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় তা ভোগ করা। আর আল্লাহর নির্ধারিত পন্থাই ইসলামি অর্থনীতির মূলভিত্তি।[৬০]

আবার ইসলামি অর্থব্যবস্থা অর্জিত সম্পদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য মিরাস আইন বাস্তবায়ন করেছে। ব্যক্তির মৃত্যুর পরও যাতে তার সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যয় সম্ভব হয় সে জন্যই ইসলামি অর্থব্যবস্থায় মিরাসকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[৬১] মিরাসের সঠিক বণ্টন যাতে সম্ভব হয় সে জন্য সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে নির্দেশনা এসেছে।[৬২] রসুল সা. বলেন,

---

৫৩. আল কুরআন, ২ : ৪৩
৫৪. মুহাম্মদ আলী ও এম.এম. আবদুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৬
৫৫. আল কুরআন, ৭ : ৩১
৫৬. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, *ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*(ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৭
৫৭. আল কুরআন, ৯ : ৩৪
৫৮. আল কুরআন, ২ : ২৭৫
৫৯. আল কুরআন, ৫১ : ৫৮
৬০. মুহাম্মদ আলি ও এম. এম. আবদুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮
৬২. আল কুরআন, ৪ : ১১-১২, ১৭৬

'উত্তরাধিকারীকে স্বচ্ছল ও আত্মনির্ভরশীল রেখে যাওয়া তাদেরকে নিঃস্ব ও দরিদ্র রেখে যাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম।'[৬৩] আবার শ্রমিকদের[৬৪] মাঝে তাদের পাওনা যাতে সঠিকভাবে বণ্টিত হয় সে জন্য রসুল সা. বলেছেন, 'তোমরা শ্রমিকের পাওনা বা মজুরি তার শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই আদায় করে দাও।[৬৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যে অফুরন্ত নি'আমত দান করেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুষমভাবে বণ্টিত করে সকল পর্যায়ের মানুষের অভাব পূরণের যে ব্যবস্থা করা হয় সেটাই ইসলামি অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে যদি মানবসৃষ্ট কোন অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ বণ্টনের চেষ্টা করা হয় তাহলে দেখা যায় কখনো সমাজের কোন এক জনগোষ্ঠীর হাতে হয়ত প্রচুর সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে পড়বে আবার অন্য কোন জনগোষ্ঠীর হাতে সম্পদ একেবারেই পৌঁছাবে না। অর্থব্যবস্থা প্রয়োজনের উদ্দেশ্যই হলো সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন। এ ক্ষেত্রে ধনীদরিদ্র সকল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে অর্থব্যবস্থার আওতায় আনা আবশ্যক। কিন্তু মনুষ্যপ্রণীত কোন অর্থব্যবস্থা আজ পর্যন্ত তা সম্ভবপর করে তুলতে পারেনি। একমাত্র মহান আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা ও রসুল সা.-এর সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজের সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব। সামাজিক কল্যাণই হলো ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। সম্পদ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত না থেকে যাতে সর্বস্তরের জনগণ তা ভোগের অধিকার লাভ করে ইসলামি অর্থনীতি সে দিকেই পথনির্দেশ প্রদান করে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার ইতিহাস : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীতে অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক এবং নির্দিষ্ট নৈতিক কোন রূপ ছিল না।[৬৬] ইসলাম অর্থব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী রূপ প্রদান করেছে তা যুগে যুগে, কালে কালে ইসলামি চিন্তাবিদগণ সমাধান করে গেছেন। এমনকি প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় চলমান অর্থনীতি সম্বলিত রাষ্ট্রও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থব্যবস্থা চর্চার অনুমোদন দিচ্ছে। সর্বস্তরের জনগণের জন্য কল্যাণকর এমন একটি অর্থব্যবস্থার ইতিহাস মানুষ খুব স্বল্প হারে জ্ঞাত। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রাচীন বহু সভ্যতাই নদ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইসলামি সভ্যতা আরব্য উপদ্বীপে যখন আবির্ভূত হয় তখন আরবদের সভ্যজীবনকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় তেমন কোন প্রাকৃতিক উপকরণ ছিল না।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব অঞ্চল অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ইসলামই আরব অঞ্চলকে আলোর পথে নিয়ে আসে। ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আসে। ইসলামের বদৌলতে আরবরা বহু গোত্রের বিভাজন থেকে মুক্ত হয়ে একটি সভ্য জীবন ব্যবস্থার অধীনে আসতে পেরেছে। আরবরা সভ্য জীবনব্যবস্থার অধীনে এসে

---

৬৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈর আল বুখারী, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৮৯, হাদিস নং ৬২৭৭

৬৪. মুহাম্মদ আলি ও এম. এম. আবদুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৬৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪০১, হাদিস নং ২৪৪৩

৬৬. Adam Abdullah & Others, *Islamic Economics : Principles & Analysis*(Kuala Lampur : International Sh'ariah Research Academy for Islamic Finance, 2016AD), p. 139

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দরুণ সারা পৃথিবীতে নিজেদের সুনাম বর্ধিত করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু ইসলামের বদৌলতে আরবরা সমগ্র বিশ্বের কাছে গৃহীত এবং সমাদৃত হয়েছে, সেহেতু বিশ্বজুড়ে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রণীত হওয়া তখন সময়ের দাবি ছিল।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা স্বয়ং মহান আল্লাহ প্রণীত এবং সে অনুসারে রসুল সা.-এর নির্দেশিত একটি অর্থব্যবস্থা হওয়ায় সৃষ্টিকুলের কারোর পক্ষে একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাধ্য ছিল না। ইসলামি অর্থব্যবস্থা তদানীন্তন আরব সমাজে সুষ্ঠুরূপে স্থান করে নিতে পেরেছিল বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের কাছে আরবরা সমাদৃত হয়েছিল। আর আরবরা যেহেতু বৈশ্বিক সম্প্রসারণের দিকে ঝুঁকেছিল, সেহেতু বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলানোর জন্য একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অর্থব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। আরবদের বৈশ্বিক সম্প্রসারণের কারণেই মূলত ইসলামি অর্থব্যবস্থা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। সে সময়ে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার অঞ্চলগুলো ইউরোপের চেয়ে উন্নত ছিল।[৬৭]

প্রযুক্তিগত এবং শিল্পের দিক থেকে ইউরোপের চেয়ে আরব এবং উত্তর আফ্রিকানরা এগিয়ে ছিল। ইসলাম যখন আরবের ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে জায়গা করে নিতে উদ্যত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রযুক্তিগত ও শিল্পগত দিক থেকে অগ্রগতি সাধন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুসলিম বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বণিকদের সাথে যে সকল চুক্তি সম্পাদন করত তা খুবই প্রশংসনীয় ছিল। শুধুমাত্র নিজ অঞ্চল ছাড়াও দূরবর্তী দেশের সাথে চুক্তি রক্ষা ও বাণিজ্যিক কার্য সম্পাদনে তাদের দক্ষতা ছিল যা বহির্বিশ্বের ব্যবসায়িক জগতে সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক কার্যক্রম ব্যবসায়িক অধিপতিদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হত না। সে ক্ষেত্রে বণিকরা নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে বিনিয়োগকারীদের অর্থকে যথার্থভাবে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করত।

আবার কখনো কখনো বণিকরা বিনিয়োগকারীর সাথে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করত। সে সকল অংশীদারি কার্যক্রমের মধ্যে মুসলিম ছাড়াও অন্য ধর্মবলম্বীদের অংশগ্রহণেরও সুযোগ ছিল। মুসলিমদের দূরবর্তী দেশসমূহে ব্যবসা পরিচালনার এ ক্ষমতার কারণেই অনেক দুর্গম এলাকাতেও বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে শুরু করে দূর প্রাচ্যের অনেক দুর্গম এলাকা এ বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের আওতায় আসে। সে সময় আরব্য মুদ্রাগুলো এতটাই গৃহীত হয়েছিল যে, আফ্রো-ইউরেশিয়ার বিস্তৃত এলাকা হতে আরব্য মুদ্রা ব্যবহার করে লেনদেন করা যেত। দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন আফ্রিকা ও উত্তরে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলেও আরব্য মুদ্রা গ্রহণযোগ্য ছিল। এ বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের কারণেই সে সব এলাকায় ইসলামের প্রচার আরো সহজ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরের প্রয়োজন পড়ে তখন মুসলিম দেশগুলো তাল মিলাতে ব্যর্থ হয়।

---

৬৭. ডঃ মুহম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*(রাজশাহী : বুকস প্যাভিলিয়ন, ১৯৮৯ খ্রি.),পৃ. ১৬৯

আঠারো শতকের শেষের দিকে এবং ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে যে প্রযুক্তিগত রূপান্তর সাধিত হয় বহির্বিশ্বে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো তাতে অনেক এগিয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক প্রযুক্তির সাথে সাথে পশ্চিমা দেশগুলো সম্পদ উত্তোলন ও উৎপাদনশীল খাতে সেগুলো ব্যবহারে সমন্বয়ের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে থাকে। অটোম্যান বুর্সা রেশম ও তুলা শিল্পের জায়গা মেশিন উৎপাদিত পণ্যাদি দখল করে নেয়। তাছাড়া বাষ্পচালিত জাহাজ ও রেল যোগাযোগের অগ্রগতির বদৌলতে সামরিক ও বাণিজ্যিক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। আঠারো শতকের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলোতে যে সকল পণ্যের চাহিদা ছিল তা অটোম্যানরা সরবরাহ করত। সে সময় যেহেতু অটোম্যান সালতানাত টিকে ছিল তাই পণ্য সরবরাহের দায়িত্বের পাশাপাশি বাণিজ্যিক শর্তাবলি নির্ধারণ, তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও পরিচালনার কাজও অটোম্যানরাই পালন করত।

তৎকালে যেহেতু মুসলিম বিশ্ব এক সালতানাতের অধীনে ছিল সেহেতু অটোম্যানদের জন্য ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনুসরণ করেই বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আঠোরো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পশ্চিমারা যখন প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত হতে শুরু করে তখন মেশিনের সাহায্যে পূর্বের চেয়ে উন্নততর ও কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে লাগল। পণ্যের গুণাগুণ তুলনামূলকভাবে পূর্বের চেয়ে ভাল হওয়ায় ও কম খরচে উৎপাদনযোগ্য বলে তখন থেকে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমারা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। অটোম্যানরা ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনুসরণ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করত। পরবর্তীতে যখন অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন হয় তখন মুসলিম বিশ্ব বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রিয়ভাবে ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনুসৃত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে ইসলামি অর্থব্যবস্থা যেভাবে চলছে তার পিছনে পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব বিদ্যমান। পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বে পদার্পণ করে মুসলিমদের অনেক পণ্যের বাজার দখল করে নেয়। ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে বেশ কিছু পশ্চিমা দেশ নিজেদের আর্থিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইমপেরিয়াল অটোম্যান ব্যাংক ও ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইমপেরিয়াল ব্যাংক অব পার্সিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদ বা রিবাভিত্তিক ব্যাংকিং ও পশ্চিমা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ইসলামি অর্থব্যবস্থার উপর প্রাধান্য পায়। বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিরোধীরা বিকল্প অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে যা বর্তমানে প্রচলিত ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনেক অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম আইনবিদ ইসলামি অর্থব্যবস্থা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেন। কিন্তু সেগুলো সবই বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব পায়নি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থা নিয়ে সৌদি আরবের মক্কানগরিতে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'মক্কা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ১৮০ জন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। এ মক্কা সম্মেলনকেই বর্তমান ইসলামি অর্থব্যবস্থার মাইল ফলক হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইসলামি অর্থনৈতিক জ্ঞানের উৎস : হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত যত নবী-রসুল এসেছিলেন সকলকে পৃথিবীতে প্রেরণের একটিই উদ্দেশ্য ছিল– মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ও মানবজাতির জন্য কল্যাণকর একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।[৬৮] মানবকুলের অন্যান্য

---

৬৮. Fahda Noor Ahmed Kamar, *Islamic Financial System : Principles & Operations*(Kuala Lampur : International Sh'ariah Research Academy for Islamic Finance, 2019 AD), pp. 154-167

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরিচালনার যত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা এবং জীবনব্যবস্থার একটি অংশ। বরং অন্যান্য সকল সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। এমনকি, মহান আল্লাহর ইবাদত কবুলের প্রধান শর্তও হচ্ছে বান্দার হালাল আয়-উপার্জন। সঠিকভাবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে রিযকের ব্যবস্থা করাও ইবাদতের একটি অংশ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য রিযক নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সে রিযক উপার্জন করার পদ্ধতি বান্দার বেছে নেয়া দায়িত্ব। রিযক অর্জনের মাধ্যমে যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে ইসলামি অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থাই তার একমাত্র পন্থা। রসুল সা. তাঁর উম্মতের জন্য সে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার উৎস হিসেবে সর্বাবস্থায় চারটি উৎস প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়– আল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এ যাবৎকাল পর্যন্ত এ চারটিই প্রধান উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। উৎসগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

আল কুরআন : ইসলামি আইনের শাশ্বত ও চিরন্তন উৎস হলো আল কুরআন। মহান আল্লাহ কুরআনকে মানবজাতির পার্থিব জীবনের কল্যাণের পাথেয় ও পরকালের মুক্তির পাথেয় হিসেবে নাযিল করেছেন। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত যত আসমানি কিতাব পৃথিবীতে নাযিল হয়েছে তার সবগুলোরই চূড়ান্ত রূপ হলো আল কুরআন। কারণ সকল আসমানি কিতাব ও সকল নবী-রসুলগণই শেষনবী মুহাম্মদ সা.-এর আগমন এবং আল কুরআন নাযিলের প্রতি পূর্বাভাষ দিয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছর নবুওয়াতি জীবনে ফেরেশতা জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে পরবর্তী উম্মতদের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে আল কুরআন নাযিল হয়েছে। মান্না খলিল আল-কাত্তান কলেন,

"القرآن هو كلام الله الْمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الْمتعبد بتلاوته".

'কুরআন মাজিদ আল্লাহ তা'আলার বাণী। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর ইহা অবতীর্ণ। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত।'[৬৯]

আল কুরআনের উৎস হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতে, 'আল কুরআনের মূলভাব জিবরাইল আ. কর্তৃক রসুল সা.-এর ক্বলবে নাযিল করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুল সা. তা নিজ ভাষায় মানুষের মাঝে প্রচার করেন।' কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিম চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ মুতাজিলা সম্প্রদায়ের এ অযৌক্তিক দাবিকে নাকচ করে দিয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, কুরআনের ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু, শব্দ সকলই আল্লাহর নিজস্ব। আল কুরআন সর্বপ্রকার দোষত্রুটি ও সংশয় মুক্ত।

আল কুরআনের সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা হলো– কুরআন কোন না কোন কারণে, কোন না কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, কোন না কোন সমস্যার সমাধানকল্পে নাযিল হয়েছে। যদিও বিভিন্ন পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার সময়ে কুরআনের একেকটি আয়াত নাযিল হয়েছে, তাও কুরআনের নির্দেশ এবং সমাধানাবলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ঐ সমস্যাগুলোর সমাধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানবজীবনের যত সমস্যা আছে ও কিয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যা উদ্ভূত হবে এবং পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তির যত উপায় আছে তার সকলই আল কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত মানবজাতির টিকে থাকার প্রধান চাবিকাঠি। অন্যান্য সকল সমস্যার সমাধানের মত তাই অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির পথও কুরআনই নির্দেশ করে।

---

৬৯. মান্না খলিল আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফি 'উলুমিল কুরআন*(কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, তা.বি.), পৃ. ১৬

সুন্নাহ : মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কথা, কাজ এবং মৌন সম্মতিই হলো সুন্নাহ।[৭০] সুন্নাহকে প্রকৃতিগতভাবে হাদিস থেকে কিছুটা পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। হাদিস তত্ত্বীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আর সুন্নাহ ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অর্থাৎ, রসুল সা.-এর বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের সকল বক্তব্য, কাজ এবং মৌন সম্মতিকে হাদিসের মাধ্যমে তত্ত্বীয় রূপ দেয়া হয়েছে। কুরআনে মানবসভ্যতার জন্য হুকুম-আহকামকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়নি। রসুল সা. কুরআনের হুকুম-আহকামকে যখন শারি'আহ সম্পর্কিত কোন সমস্যা উদ্ভূত হবে তখন তার সমাধানের জন্য কিভাবে কুরআনকে প্রয়োগ করতে হবে তা নবীজি সুন্নাহর মাধ্যমে দেখিয়ে গেছেন। সুন্নাহর প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই সুন্নাহকে ইসলামি আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৭১]

মানুষের সামাজিক জীবনে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যা উদ্ভূত হতে বাধ্য। রসুল সা.-এর সুন্নাহসমূহকে হাদিসরূপে লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া সাহাবিদের যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। যেহেতু হাদিস সুন্নাহসমূহের লিপিবদ্ধ রূপ, সেহেতু সামাজিক জীবনের উদ্ভূত সমস্যার বাস্তব সমাধান হাদিসে খুঁজে পাওয়া খুবই সঙ্গত। আর লিপিবদ্ধ হাদিস থেকে অন্যান্য সকল সমাধানের মত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও খুঁজে পাওয়া খুবই যৌক্তিক। বর্তমানে শুধুমাত্র শাব্দিকভাবে হাদিস থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে আত্মিকভাবে হাদিসে বর্ণিত সুন্নাহকে হৃদয়াঙ্গম করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যেখানে সুন্নাহকে অর্থনৈতিক খাতে প্রয়োগ করার সহজ পন্থা বিদ্যমান সেখানে হাদিসই অর্থনৈতিক আইনের অন্যতম একটি উৎস তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইজমা : সময়ের প্রয়োজনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফক্বিহগণ সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে নতুন যে সমস্ত শারি'আহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত হয়েছেন সেগুলোই ইজমার অন্তর্ভুক্ত।[৭২] ইজমার সাথে সুন্নাহর পার্থক্য হলো সুন্নাহ শুধুমাত্র নবী কারিম সা.-এর যুগেই সীমাবদ্ধ ছিল ও তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে সাহাবিগণের মাঝেও সুন্নাহর প্রতিপালন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইজমার সুত্রপাত হয়ই সাহাবিগণের সময় থেকে। রসুল সা.-এর জীবদ্দশায় যখন কোন সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হত তখন রসুল সা.-এর নির্দেশ অনুসারে সমাধান করা হত। রসুল সা.-এর ওফাতের পর নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্ভূত সমস্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইজমার আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। কিন্তু সাহাবিগণ যেহেতু রসুল সা.-এর সুন্নাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত ও ইজমার সূচনা সাহাবিগণের যুগেই সেহেতু ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে ইজমার স্থান সুন্নাহর পরেই। সাহাবিগণ সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি অবগত থাকায় ইজমা প্রণয়নের সময় সুন্নাহকে ভিত্তি ধরেই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন।

কারণ যতই নতুন সমাধান প্রণয়ন করা হোক না কেন তা কুরআনসুন্নাহর বিপরীত হওয়া শারি'আহসম্মত নয়। আর সাহাবিগণ যখন কোন নির্দিষ্ট সমস্যা নিরসনকল্পে ইজমা প্রণয়ন করেছেন তা নির্দিষ্ট তদ্রূপ সমস্যার সমাধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একে সার্বজনীনভাবে সকল সমস্যার

---

৭০. মুহাম্মাদ বিন আলি আশ-শাওকানি, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল*(কায়রো : মাতবা'আহ সা'আদাহ, ১৩২৭ হি.), পৃ. ১৮৬

৭১. Yahia Abdul- Rahman, *The Art of Islamic Banking and Finance : Tools & Techniques for Community-Based Banking*(Canada : John Wiley & Sons, Inc., 2010 AD), pp. 55

৭২. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*(দামেশক : দারুল ফিকর, খ.১, ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫১৪

সমাধানে ব্যবহার করা বৈধ ছিল না। ইসলামি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও সময়ের তাগিদে ও সামাজিক বিস্তারের কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য মুসলিম উম্মাহর ফক্বিহগণ সর্বসম্মতভাবে ইজমা সহিহ হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো আবশ্যক বলেছেন তা হলো– সমস্যা উদ্ভূত হওয়া ও তার সমাধানের সময় পর্যাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ফক্বিহগণের উপস্থিতি আবশ্যক। স্থান নির্বিশেষে ফক্বিহগণের নির্দিষ্ট একটি সমাধানমূলক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা আবশ্যক ও ফক্বিহগণের ঐক্যমত মৌখিক বা লিখিত আকারে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

কিয়াস : সাহাবিগণ তাবি'ই এবং তাবি' তাবি'ইগণের পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য ইজতিহাদের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের ফক্বিহগণ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত।[৭৩] ইজতিহাদের জন্য ফক্বিহগণ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও পরবর্তী ফক্বিহগণের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নিজেদের যৌক্তিক বিবেক-বিবেচনাও প্রয়োগ করেছেন। কারণ ইসলামি আইনের প্রথম যুগে সমস্যার পরিধি যতটুকু বিস্তৃত ছিল পরবর্তীতে সময় যত অতিবাহিত হতে থাকে সমস্যার পরিধিও তত বিস্তৃত হতে থাকে। সে সাথে যুগের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃত হতে থাকে। পূর্বে যেখানে হয়ত অন্ধ অনুসরণ বা অনুসরণই একমাত্র পন্থা হিসেবে মানুষ অবলম্বন করত পরবর্তীতে জ্ঞানের বিস্তৃতির কারণে মানুষের বিবেক-বিবেচনার প্রয়োগ করার ক্ষমতা তৈরি হয়। ইজতিহাদ যেহেতু অবস্থা এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে করা হয় সেহেতু এটি পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনও করা যায়। কুরআন-সুন্নাহ অবশ্যই ইসলামি আইনের প্রধান উৎস। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিত্যনতুন সমস্যা সমাধানে ইজতিহাদ প্রতিনিয়ত বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাই অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের নিরসনেও ইজতিহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ক্বিয়াসের চারটি স্তম্ভ রয়েছে– আসল, ফার', ইল্লাহ্ ও হুকুম। আসল বলতে সে রায়কে বুঝায় যা ইতোমধ্যে কুরআন বা হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। আর ফার' বলতে বুঝায় নতুন যে সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে তার সমাধানের জন্য যে রায় প্রয়োজন তাকে। ক্বিয়াসের উদ্দেশ্য হলো আসল ও ফার'-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। অর্থাৎ সমস্যার সমাধান এমনভাবে করা যা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হবে না। ইল্লাহ্ বলতে বুঝায় নতুন রায় কার্যকর করার কারণকে। অর্থাৎ আসল যে কারণে প্রয়োগ করা হয়েছিল ফার'ও ঠিক একই কারণে কার্যকর করা হবে। আর সবশেষে হুকুম বলতে বুঝায় বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের জন্য শারি'আহসম্মত নির্দেশিত পন্থা যা সর্বশেষ ইজতিহাদের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।[৭৪]

ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি : বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সকল অর্থব্যবস্থা চলমান রয়েছে সেগুলোর কোনটাই আপামর জনসাধারণের জন্য সর্বাবস্থায় কল্যাণকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অর্থব্যবস্থাসমূহের ব্যর্থতার পিছনে মূল কারণ হলো সেগুলোর কোনটাই সর্বস্তরের জনগণকে এক সাথে কল্যাণের আওতায় আনার জন্য প্রণীত কোন অর্থব্যবস্থা না। কোন এক গোষ্ঠীকে সুবিধার আওতায় আনলে অন্য কোন গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহ বঞ্চিতই রয়ে যায়। ইসলামি অর্থব্যবস্থা একমাত্র ব্যবস্থা যা সর্বস্তরের জনগণকে কল্যাণের আওতায় আনতে সক্ষম। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে সঠিক গবেষণা ও জনসচেতনতার অভাবে এর মূলনীতিসমূহ এখনও সাধারণ মানুষের আয়ত্তের

---

৭৩. ড. আবদুল করিম যাইদান, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকাহ*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৯৪

৭৪. Prof. Dr. M. A. Mannan, *Islamic Economics : Theory and Practice*(Dhaka : Afser Brothers, 2014 AD), p. 73

বাইরে রয়ে গেছে। ইসলামি অর্থনীতি যে মূলনীতিগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :[৭৫]

(১) রব্বানিয়্যাহ নীতি বা আল্লাহপ্রদত্ত বিধান : ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধাননীতি হলো রব্বানিয়্যাহ তথা সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত উৎসের নীতি। অন্যান্য সকল অর্থব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে সম্পদের অভাবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের অভাবই একমাত্র অর্থব্যবস্থার উৎস হতে পারে না। কারণ অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা মানবসৃষ্টির আদিকাল থেকেই অনুভূত হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা আদম আ.-কে পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্ব থেকেই মানুষের প্রয়োজন পূরণের সকল উপাদান সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর সম্পদের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছেন। প্রয়োজন ও চাহিদা তো মনুষ্যসৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই ছিল।[৭৬]

মহান আল্লাহ মানুষকে সে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যে জ্ঞানগুলো তার অভাব পূরণের জন্য অত্যবশ্যক। সেখানে অভাব পূরণের জন্য অফুরন্ত সম্পদ ও সে সম্পদকে কাজে লাগানোর পন্থাও নির্দেশ করে দিয়েছেন। মানুষের দায়িত্ব সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত অফুরন্ত সম্পদকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের ব্যবস্থার উপযোগী করে তোলা। তাই অন্যান্য সকল অর্থব্যবস্থা সম্পদের অভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ইসলামি অর্থব্যবস্থা কখনো অভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা সম্ভব নয়। কারণ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কখনো সম্পদ প্রদানের ব্যাপারে কৃপণতা করতে পারেন না। তিনি শুধুমাত্র সম্পদের প্রতিনিধিত্ব প্রদানের ব্যাপারে নির্দেশনা দেন।

(২) ইনসানিয়্যাহ বা মানবতার নীতি : ইসলামি অর্থনীতি সম্পদ অর্জন এবং ব্যয়ের ব্যাপারে মানবসভ্যতার ভূমিকার উপরও আলোকপাত করে। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের শারীরিক এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সেখানে মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ভাল ও মন্দ উভয় দিক বিবেচনার সক্ষমতা নিয়েই পৃথিবীতে আসে। অর্থাৎ, সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা যেমন সৃষ্টিগত তেমনি ভালমন্দের পার্থক্য বুঝতে পারার দক্ষতাও সৃষ্টিগত। কিন্তু অনেক সময় অদূরদর্শীতার কারণে মানুষ সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে সম্পদের অর্জন, বণ্টন ও ভোগদখলের জন্য তার কোন পথ বেছে নেয়া উচিত। অন্যান্য অর্থব্যবস্থাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থার উপর প্রাধান্য দেয়া এ অদূরদর্শিতারই নামান্তর। সম্পদ অর্জনের প্রতি অযাচিত লোভ সর্বদাই মানুষের স্বভাবে থাকবে। কিন্তু স্রষ্টার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে যে লোভ সংবরণ করতে হবে। আর তা সংবরণের জন্যই স্রষ্টার নির্দেশিত পথে মানুষকে কাজ করতে হয়।

(৩) আখলাকিয়্যাহ বা নৈতিকতার নীতি : অর্থব্যবস্থার ইসলামি নীতি ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারে না যতক্ষণ না সে আখলাক বা চরিত্রগত দিকে স্বচ্ছ হয়। পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান কার্যকর করা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে কার্যকর কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ মানবজাতি কখনই শয়তানের ধোঁকা থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থেকে কোন কাজ করতে পারে না। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোও ঠিক তেমনই। অর্থব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও শয়তানের ধোঁকা সম্পূর্ণরূপে

---

৭৫. Adam Abdullah & Others, *Islamic Economics : Principles & Analysis*, ibid, pp. 32-36

৭৬. এ. জেড. এ. শামসুল আলম, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৯

মানুষকে প্রভাবিত করে। সে জন্য সম্পূর্ণ বিবেক ও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হয়ত অনেক সময় সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ জন্য দরকার প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা যাতে মানুষ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় সৃষ্টিকর্তার বিধানগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে। কারণ মুসলিম হিসেবে যে-কোন কাজ করার পূর্বে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ জেনে নেয়া সকলের দায়িত্ব।

প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও সুফি জালালউদ্দিন রুমির মতে, 'মানুষের শেষ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য দু'রকম পথ সামনে থাকে। একটি পথ সহজ কিন্তু তার পরিণতি ভয়াবহ। অপর পথটি দুর্গম কিন্তু তার পরিণতি সুখকর। পার্থিব জগতে মানুষ সহজ পথকে বেছে নিতে খুব সহজেই উৎসাহী হয়।' কারণ দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার কষ্ট সহ্য করার মত ধৈর্য্য ও মানসিক শান্তি সকলেই প্রয়োগ করার ক্ষমতা সর্বাবস্থায় রাখে না। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগসমূহের ব্যাপারেও সকলেই সহজ পন্থা বেশি প্রয়োগ করতে চায়। কারণ এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে স্বল্প পরিশ্রমে সহজেই সম্পদ অর্জন সম্ভব। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যদি সম্পদ অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে তুলনামূলকভাবে বেশি সময় পরিশ্রম ও ধৈর্য্য ধারণ করা দরকার; কিন্তু এর ফলাফল সুদূর প্রসারী। মানুষ অনেক সময় তার অদূরদর্শিতার জন্য সুদূর প্রসারী ফলাফলকে অবহেলা করে। ইসলামি অর্থব্যবস্থা সে সুদূর প্রসারী ফলাফল যাতে সুখকর হয় সে দিকেই আলোকপাত করে।

(৪) ওয়াসাতিয়্যাহ বা সংযমের নীতি : ইসলামি অর্থব্যবস্থা সংযমকে উৎসাহিত করে। আর সংযমের গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করার মাধ্যমে মানুষ যে-কোন ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'এভাবেই তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পার এবং রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হতে পারে।'[৭৭] এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে-কোন বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। ঠিক তেমনি, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের মধ্যেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা সর্বস্তরের জনগণের জন্য কল্যাণকর।

কারণ রাষ্ট্রের মোট সম্পদ যখন কোন নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর হাতে খুব বেশি পৌঁছে যায় আর কোন গোষ্ঠীর হাতে একেবারেই না পৌঁছে, তখনই অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং শ্রেণিভেদে পরিণত হয় যা একটি সময় সামাজিক বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয়। অন্যান্য অর্থব্যবস্থা প্রয়োগ করে আজ পর্যন্ত কখনই সম্পদ বণ্টনে সমতা আনা যায়নি। কারণ অন্যান্য অর্থব্যবস্থা যাদের দ্বারা তৈরি তারাও মানবীয় ত্রুটি বা গুণের ঊর্ধ্বে নয়। নফসের কুপ্রবৃত্তি তাদের মাঝেও বিদ্যমান। যারা নিজেরাই কুপ্রবৃত্তির বাইরে নয় তারা কখনই সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে সমতা আনার উপযোগী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে না। আর সে জন্যই আল্লাহ প্রদত্ত উৎস থেকে প্রণীত অর্থব্যবস্থা প্রয়োজন যা সর্বস্তরের জনগণকে সমতা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থব্যবস্থাই একমাত্র উপায়।

(৫) ওয়াকিয়্যাহ বা বাস্তবতার নীতি : আল্লাহ প্রদত্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কখনো বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। কারণ জীবন পরিচালনার জন্য কিছু নীতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই মেনে চলতে হয়। প্রকৃতিগত নিয়মকে বাদ দিয়ে কোন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে না। কারণ কিছু নীতিগত বৈশিষ্ট্য সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতির মাঝেই বিদ্যমান থাকে। সে জন্য ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, সার্বজনীন নীতিগুলো যদি অবহেলা করা হয় তাহলে

---

৭৭. আল কুরআন, ২ : ১৪৩

সামাজিক ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হয় না। যেমন, চাহিদা যোগানোর নীতি অর্থনীতির মূলভিত্তি। ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এ চাহিদা যোগানোর নীতিকে বাদ দিয়ে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব না। মূল প্রকৃতিগত নীতিগুলো বাদ দিয়ে যদি অর্থব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেটা আর সামাজিক কল্যাণের কাজে লাগে না। তখন সামাজিক ধ্বংস অনিবার্য। ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই যেহেতু সামাজিক কল্যাণ সাধন সেহেতু বাস্তবতার নীতিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম একটি মূলনীতি।

(৬) আলামিয়্যাহ বা সার্বজনীনতার নীতি : মহান আল্লাহ রসুল সা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' (আল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রসুল সা. কোন নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত হননি। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানবকুলের জন্য। সুতরাং রসুল সা.-এর সকল পন্থা যে কেবল মুসলিমদের জন্যই পাথেয় তা নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যও পাথেয়। রসুল সা.-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ দ্বীনের পূর্ণতা দান করেছেন। সে জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও রসুল সা. যে সকল পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন তা শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য না। ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে তা সকলের জন্য প্রযোজ্য। ইসলামি অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থব্যবস্থা যার উদ্দেশ্যই হলো সমাজের সর্বস্তরের লোককে একই রকম সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনা যাতে বৈষম্য দূর হয়। এ অর্থব্যবস্থা যদি সার্বজনীন না হয় তা সামাজিক কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে অকল্যাণই ঘটাবে। তাই সার্বজনীনতা ইসলামি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

(৭) আদল বা সুবিচারের নীতি : ইসলামি অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে মহান আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের যথাযোগ্য সঠিক ব্যবহার করা।[৭৮] আর আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে যদি অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয় তবেই সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় শোষণ, বঞ্চনা, সম্পদ আত্মসাৎ, জোর জুলুম ইত্যাদির কোন স্থান নেই। অন্যান্য অর্থব্যবস্থা যত সঠিকভাবেই প্রয়োগ করা হোক না কেন অবিচার, শোষণ এবং জুলুমের সম্ভাবনা সেখানে থেকেই যায়।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ওহিভিত্তিক উৎস। ওহিভিত্তিক উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক নীতি কখনো অবিচারের কেন্দ্র হতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে প্রতিটি কাজকেই হালাল ও হারামের মাপকাঠিতে পরিচালনা করেই ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে। কোন ব্যক্তির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে অন্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ বা ক্ষুণ্ন করা ইসলামি অর্থব্যবস্থার পরিপন্থী। ইসলামি অর্থব্যবস্থা সঠিকভাবে সকলের স্বার্থকে সামাজিকভাবে সমান বিবেচনা করে পরিচালিত হয়। আর সে জন্যই ইসলামি অর্থনীতিকে সুবিচারের নীতি বলা হয়ে থাকে।

(৮) ইহসান বা সদাচারের নীতি : মানুষের সাথে মানুষের সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৭৯] সমাজের কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে

---

৭৮. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৭৯. প্রাগুক্ত।

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সম্পদ পুঞ্জিভূত থাকলে আর কোন এক গোষ্ঠীর হাতে অপর্যাপ্ত সম্পদ থাকলে সমাজে রেষারেষি, হিংসা ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সে জন্যই যাকাত, ফিতরা, ওয়াক্বফ, সাদাকাহ, হিবা প্রভৃতি নিয়মের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে সকল শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্পদ ভোগের সমান সুযোগ দেয়া হয়েছে। আবার সকল শ্রেণির মানুষকে ইসলাম সম্পদ লাভ এবং ভোগের অধিকার না দিলে স্বাভাবিকভাবেই টিকে থাকার জন্য সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির জনগণ প্রতিনিয়ত অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির জনগণের সম্পদ জোরপূর্বক লুট ও আত্মসাতের চেষ্টা করত। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতি মহান আল্লাহর সৃষ্ট সকল সম্পদকে একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে সকল শ্রেণির মানুষের ভোগ দখলের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। তাতে সকল শ্রেণির জনগণ একজন আরেকজনের প্রতি সদাচারের নীতি অনুসরণ করবে যা সামাজিক কল্যাণকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবে।

(৯) সুদ বর্জন নীতি : ইসলামি অর্থনীতির সবচেয়ে বড় দিক হলো এ অর্থব্যবস্থায় সুদকে পরিপূর্ণভাবে বর্জন করা হয়েছে।[৮০] ইসলামি অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক লেনদেনের কোন স্তরেই সুদের কোন স্থান নেই। পবিত্র কুরআনে চার বার সুদকে বর্জনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সুদের কুফল আপাতদৃষ্টিতে জনগণ হয়ত বুঝতে পারে না। কিন্তু সুদ দীর্ঘ মেয়াদে গিয়ে কতখানি সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে তা ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর অন্য কোন ব্যবস্থাই সুদের কুফলকে অনুধাবন করতে পারেনি যা ইসলামি অর্থনীতি করতে পেরেছে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বিনিময়হীন অতিরিক্ত লেনদেনের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু সুদ বিনিময়হীন অতিরিক্ত লেনদেনেরই নামান্তর। বিনিময়হীন অতিরিক্ত লেনদেন অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুদের বিবিধ কুফলের কারণে মহান আল্লাহ সুদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি প্রদান করেছেন। সুদ অর্থনৈতিক শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। তাই ইসলামি অর্থব্যবস্থা সুদ বর্জন নীতি অনুসরণ করে চলে।

(১০) সুষম বণ্টনের নীতি : ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।[৮১] পুঁজিবাদে যেমন স্বেচ্ছাচারী হয়ে সম্পদ লাভের সুযোগ আছে, সমাজতন্ত্রে যেমন শোষণের মাধ্যমে সম্পদ লাভের সুযোগ আছে, ইসলামি অর্থনীতিতে তেমন সুযোগ নেই। ইসলামি অর্থনীতি সম্পদের সুষম বণ্টনে বদ্ধপরিকর। কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে ফেলাকে ইসলাম জোরালোভাবে নিরুৎসাহিত করে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, ইসলামি অর্থনীতি সম্পদ অর্জনকে নিরুৎসাহিত করে। ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের একচ্ছত্রভাবে মালিকানা মহান আল্লাহর। মানুষকে মহান আল্লাহ কেবলমাত্র সম্পদের প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন। তাও সে প্রতিনিধিত্ব হয় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে, পরিশ্রমের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সম্পদ অর্জন ও ভোগ করতে পারবে। ইসলামি অর্থনীতি সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে বৈরাগ্যবাদকে নিরুৎসাহিত করে, ঠিক তেমনি অনিয়ন্ত্রিতভাবে জোর-জুলুম করে সম্পদ অর্জনকেও নিরুৎসাহিত করে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বিপুল বিত্ত এবং বিলাসিতায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের সুযোগ নেই। ঠিক তেমনি এ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কৃপণতারও স্থান নেই। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বিশ্বাস করে যে, মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে ও কাজ

---

৮০. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৮১. প্রাগুক্ত।

অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। কিন্তু অর্থ-বিত্তের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণি ভেদাভেদ করা যাবে না। এভাবেই ইসলামি অর্থনীতি সম্পদের সুষম বণ্টনের নীতি অনুসরণ করে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি অর্থব্যবস্থাই হলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পন্থা। এ অর্থব্যবস্থায় আল্লাহর বিধান ও রসুল সা.-এর নির্দেশিত পদ্ধতিই মূলকথা। এ অর্থব্যবস্থার আলোকে জনসাধারণের লাগামহীন স্বাধীনতার সুযোগ নেই। সম্পদে আল্লাহর মালিকানা একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই সমাজের সর্বস্তরে উক্ত সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য নৈতিকতা, বাস্তবতা, সংযম, সদাচার ও সুবিচার নিশ্চিত করা জরুরি। আবার সম্পদের সুষম বণ্টনের উদ্দেশ্যেই সুদ বর্জন করা জরুরি। লেনদেনে সুদের অস্তিত্ব অল্প কিছু গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত করে এবং সম্পদকে সর্বস্তরের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে বাঁধা প্রদান করে। তাই, আপামর জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ইসলামি অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থার আলোকে পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা একমাত্র উপায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই দেশের অর্থনীতি আবর্তিত হয়। জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থকে সুরক্ষা প্রদান ও জনসাধারণের মূলধন ঘাটতি পূরণ করে উপযুক্ত খাতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতি সচল রাখতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। অর্থনেতিক কার্যাবলির পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়েই ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। আবার, আর্থিক নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায়ও ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতীতে আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের মাঝে ব্যাংকিং কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে ব্যাংকিং কার্যক্রমের পরিধি ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়েছে। তাই জরুরি বিষয় হিসেবে নিচে ব্যাংকব্যবস্থার ক্রমবিকাশের কাঠামো ও সামগ্রিক চিত্রের উপর আলোকপাত করা হলো :

বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থার ক্রমবিকাশ: বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা মূলত গড়ে উঠেছে উপমহাদেশের ব্যাংকব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে।[৮২] প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অর্থশাস্ত্রে যে সকল লেনদেন ব্যাংকিং লেনদেনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করা হত তথাকথিত সে সকল ব্যাংক পারিবারিক ভিত্তিতে পরিচালিত হত। পরবর্তীতে এক সময় মুঘল শাসনামলে ব্যাংকব্যবস্থা ধনী পরিবারের হাতে চলে আসে। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে এ সকল ব্যাংকারগণ তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যাংকব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের হাতেই কুক্ষিগত ছিল। ইংরেজরা নিজেদের আদলে এজেন্সি হাউজগুলো গড়ে তোলে এবং বর্তমান সময়ের বাণিজ্যিক ব্যাংকের গোড়াপত্তন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ যোগানের প্রয়োজন পড়লে বিভিন্ন শহরে একের পর এক ব্যাংক গড়ে উঠে। বর্তমান বাংলাদেশ যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত, পাকিস্তান জন্মের পূর্বে এ অঞ্চলে ২১টি ব্যাংক ছিল যাদের বেশিরভাগের মালিক ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের ভাঙ্গনের পর এ সব ব্যাংকের অনেকগুলোই বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধে দু'দেশের বৈরিতার কারণে অবশিষ্ট ব্যাংকগুলো শত্রুসম্পত্তির তালিকায় চলে যায়। হাইকোর্টের নির্দেশে ব্যাংকগুলো অবসানের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়।

ভারতবর্ষের বিভক্তি এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণের জন্য এগিয়ে আসেন একদল পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্যোক্তা।[৮৩] ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত হাবিব ব্যাংক ও মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক তাদের প্রধান কার্যালয় বোম্বে থেকে করাচিতে স্থানান্তর করলে সেখান থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শাখা বিস্তার করে। পরবর্তীতে হাবিব ব্যাংকের আদলে গঠিত হয় ইউনাইটেড ব্যাংক।[৮৪] অন্যদিকে, পাট ও তুলা ব্যবসায় অর্থ যোগানের পথ সুগম করার জন্য সরকারি উদ্যোগে ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করে তার ৫১ শতাংশ শেয়ার জনসাধারণের

---

৮২. আর এ হাওলাদার ও সৈয়দ আশরাফ আলী, *ব্যাংক এবং আর্থিক ব্যবস্থার রীতিনীতি*(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৪৭-৫০

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৮৪. প্রাগুক্ত।

কাছে ছেড়ে দেয়া হয় এবং ৪৯ শতাংশ শেয়ার সরকার নিজের কাছে রাখে। প্রদেশের ঋণব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত ঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে গঠিত হয় ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড[৮৫] ও ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন[৮৬]। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টি যথাক্রমে পূবালী ব্যাংক[৮৭] ও উত্তরা ব্যাংক নামধারণ করে।[৮৮]

স্বাধীনতার প্রবক্তা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য গুণী ব্যক্তিবর্গ সম্পদের সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাংকব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে আসছে। তাই স্বাধীনতার পরপরই ব্যাংকগুলো জাতীয়করণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে শূন্য থেকে নতুন করে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্বাধীনতাপূর্ব ১২টি ব্যাংকের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস করে ৬টি সরকারি ব্যাংকের সৃষ্টি হয়। ব্যাংকগুলোর নামকরণ করা হয়– সোনালী, রূপালী, জনতা, অগ্রণী, পূবালী ও উত্তরা।[৮৯] পরবর্তী সময়ে পূবালী ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংককে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতে ছেড়ে দেয়া হয়।[৯০]

বর্তমানে বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক'[৯১] দেশের ব্যাংকিং খাতের নীতিনির্ধারণের দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে দেশের ব্যাংকিং খাতকে দু'টো ভাগে ভাগ করা যায়– তফসিলি ব্যাংক এবং অ-তফসিলি ব্যাংক। দেশের তফসিলি ব্যাংকগুলো 'ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত)'[৯২]-এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৬টি। সেগুলো হলো– (১) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, (২) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, (৩) বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, (৪) জনতা ব্যাংক লিমিটেড, (৫) রূপালি ব্যাংক লিমিটেড ও (৬) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড।[৯৩]

দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংককে অনুমোদন দেয়া হয়, সেগুলো হলো– (১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, (২) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও (৩) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। বর্তমানে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৪৩টি। তার মধ্যে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক ৩৩টি ও

---

৮৫. 'পূবালী ব্যাংকের পূর্বনাম।' দ্র. পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৪৫

৮৬. 'উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের পূর্বনাম।' দ্র. উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৩২

৮৭. 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে পূবালী ব্যাংক নাম ধারণ করে।' দ্র. পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৮৮. 'ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে কার্যক্রম শুরু করে। তবে স্বাধীনতার পর তা উত্তরা ব্যাংক নাম ধারণ করে।' দ্র. উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৮৯. আর এ হাওলাদার ও সৈয়দ আশরাফ আলী, *ব্যাংক এবং আর্থিক ব্যবস্থার রীতিনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৯০. প্রাগুক্ত।

৯১. '১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির এক আদেশে কেন্দ্রিয় ব্যাংক গঠিত হয়। তবে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকেই এর কার্যক্রম শুরুর তারিখ বিবেচিত হয়। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকা শাখার সকল দায় ও পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত হয়।' দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৬৬

৯২. 'ব্যাংক কোম্পানি সম্পর্কিত বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নম্বর আইন। ৪ মে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত হয়। ৬টি খণ্ড, ১২৩টি ধারা ও ২টি তফসিল সম্বলিত আইন। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য করা হয়।' দ্র. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-751.html, visited on 16.02.2023 AD

৯৩. Bangladesh Bank, *Annual Report 2021-2022*(Dhaka : Department of Communications and Publications, 2022 AD), p. 305

ইসলামি শারি'আহভিত্তিক বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ১০টি। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৯টি। সেগুলো হলো– (১) ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড, (২) সিটি ব্যাংক এন.এ., (৩) কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন পিএলসি, (৪) হাবীব ব্যাংক লিমিটেড, (৫) এইচএসবিসি, (৬) ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান, (৭) স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, (৮) স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ও (৯) উরি ব্যাংক। দেশে ৫টি অ-তফসিলি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেগুলো হলো– (১) আনসার ভিডিপি ব্যাংক, (২) গ্রামীণ ব্যাংক, (৩) জুবিলী ব্যাংক, (৪) কর্মসংস্থান ব্যাংক ও (৫) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।[৯৪]

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। এ সকল ব্যাংক কৃষি ও শিল্পখাতে বিনিয়োগ করে থাকলেও মূল কাজ হিসেবে বাণিজ্যিক খাতে বিনিয়োগ, আমানত সংগ্রহ এবং আমদানি-রপ্তানিকেই গণ্য করে। দেশের আর্থিক খাতে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহই। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবেই কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তা সংগঠিত হয়ে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাগণ প্রয়োজনীয় মূলধন নিজেদের মধ্য থেকে সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা শুরুর ৩ বছরের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সমপরিমাণ মূলধনের শেয়ার আইপিও (Initial Public Offering-IPO)-এর মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হয়।[৯৫] সম্পূর্ণ অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে সরকারি মালিকানায় পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলিরই অনুরূপ। বর্তমানে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোনালী ব্যাংকের মোট শাখা ১ হাজার ২২৬টি এবং বিদেশে শাখার সংখ্যা ২টি[৯৬], জনতা ব্যাংকের মোট শাখা ৯১৭টি[৯৭], রূপালি ব্যাংকের ৫৮৩টি[৯৮], বেসিক ব্যাংকের ৬০টি[৯৯] ও বিডিবিএল এর শাখা ৩২টি[১০০]।

বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থার কাঠামো : স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রমের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় সকল কাজই ব্যাংককে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। ব্যাংককেন্দ্রিক যে-কোন গবেষণার জন্য তাই বাংলাদেশের ব্যাংকিং কাঠামো জানা খুবই জরুরি। কিছু ব্যাংক সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে কাজ করে। কোন কোন ব্যাংক কেবলমাত্র বাণিজ্যিক কাজ সমাধা করে। কোন কোন ব্যাংক বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার কোন কোন ব্যাংক বিদেশি মালিকানায় বাংলাদেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের যাত্রা শুরুর পর থেকে ব্যাংকিং খাত ৬টি জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংক, ৯টি বিদেশি ব্যাংক নিয়ে ব্যাংকিং যাত্রা শুরু করেছিল। তারপর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংকিং খাতের তাৎপর্যপূর্ণ প্রসার

---

৯৪. Board of Editors, *Quarterly Scheduled Banks Statistics, July-September 2022*(Dhaka : Bangladesh Bank, 2022 AD), p. ii

৯৫. আর এ হাওলাদার ও সৈয়দ আশরাফ আলী, *ব্যাংক এবং আর্থিক ব্যবস্থার রীতিনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৯৬. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৬

৯৭. জনতা ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৪

৯৮. রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২১

৯৯. বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৭

১০০. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২

ঘটে।[১০১] সে সাথে কিছু অ-তফসিলি ব্যাংক ও বিশেষ কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অ-তফসিলি ব্যাংক ছাড়া বাকি সকল ব্যাংক অর্থাৎ, সকল তফসিলি ব্যাংকই 'বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২' দ্বারা পরিচালিত হয়। যে ব্যাংকগুলো কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও 'বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২'[১০২] দ্বারা পরিচালিত হয় না সে সকল ব্যাংকগুলোকে অ-তফসিলি ব্যাংক বলে। নিম্নে বাংলাদেশে পরিচালিত ও কার্যরত সকল ব্যাংকের তালিকা তুলে ধরা হলো :[১০৩]

বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যরত তফসিলি ও অ-তফসিলি সকল ব্যাংকের তালিকা		
তফসিলি ব্যাংক : সরকারি		**অ-তফসিলি ব্যাংক**
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক	**বিশেষায়িত ব্যাংক**	
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড জনতা ব্যাংক লিমিটেড রূপালী ব্যাংক লিমিটেড সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বেসিক ব্যাংক লিমিটেড বিডিবিএল	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক জুবিলী ব্যাংক কর্মসংস্থ ন ব্যাংক পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
তফসিলি ব্যাংক : বেসরকারি		
বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যরত তফসিলি ও অ-তফসিলি সকল ব্যাংকের তালিকা		
বিদেশি ব্যাংক	**প্রচলিত ব্যাংক**	**ইসলামি ব্যাংক**
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া হাবিব ব্যাংক লিঃ সিটি ব্যাংক এন.এ. কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন লিঃ ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান উরি ব্যাংক হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ ব্যাংক আল-ফালাহ লিঃ	এবি ব্যাংক লিঃ ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ দি সিটি ব্যাংক লিঃ আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ পূবালী ব্যাংক লিঃ উত্তরা ব্যাংক লিঃ ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ প্রাইম ব্যাংক লিঃ সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ ঢাকা ব্যাংক লিঃ ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ ওয়ান ব্যাংক লিঃ বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ মিউচুয়াল ট্রা স্ট ব্যাংক লিঃ প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ ব্যাংক এশিয়া লিঃ ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ যমুনা ব্যাংক লিঃ ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ মেঘনা ব্যাংক লিঃ মিডল্যান্ড ব্যাংক লিঃ পদ্মা ব্যাংক লিঃ এনআরবি ব্যাংক লিঃ মধুমতি ব্যাংক লিঃ সীমান্ত ব্যাংক লিঃ কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ বেঙ্গল কমার্স ব্যাংক লিঃ সিটিজেন ব্যাংক লিঃ	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিঃ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এক্সিম ব্যাংক লিঃ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ গ্লোবাল ইসলামি ব্যাংক লিঃ

১০১. Board of Editors, *Quarterly Report on Scheduled Bank Statistics*, ibid, pp. i

১০২. '১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির ১২৭ নম্বর আদেশ বলে 'বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২' প্রণীত হয় এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রিয় ব্যাংক হিসাবে পরিণত হয়।' দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১০৩. Board of Editors, *Quarterly Report on Scheduled Bank Statistics*(Dhaka : Bangladesh Bank, April-June, 2022 AD), pp. 1-3

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর যে সকল ব্যাংক পাকিস্তান শাসনামল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল সেগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। এ ব্যাংকগুলোকে সাথে নিয়ে ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়– (১) সোনালী, (২) রূপালী, (৩) জনতা, (৪) অগ্রণী, (৫) পূবালী ও (৬) উত্তরা।[১০৪] ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে পূবালী ও উত্তরা ব্যাংককে বেসরকারি পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়।[১০৫] ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রূপালী ব্যাংক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১০৬] অবশিষ্ট তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক– (১) সোনালী ব্যাংক, (২) জনতা ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংক ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়।[১০৭]

দু'টি রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংকের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক হিসাবে।[১০৮] বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে দ্বি-খণ্ডিত করে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে 'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক'-এর যাত্রা শুরু হয়।[১০৯] বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড (বেসিক ব্যাংক) বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। পরবর্তীতে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার বেসিক ব্যাংকের শতভাগ মালিকানা অধিগ্রহণ করে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে বেসিক ব্যাংক পুনরায় বেসরকারি মালিকানায় আসে। কিন্তু ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার আবার বেসিক ব্যাংককে বিশেষায়িত ব্যাংকের মর্যাদা দেয়। অবশেষে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে বেসিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মর্যাদা লাভ করে।[১১০] বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা একত্রিত হয়ে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (বিডিবিএল) নামধারণ করে এবং বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। অবশেষে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মর্যাদা লাভ করে।[১১১]

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রিন্ডলেস ব্যাংক ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড একত্রিত হয়ে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সাথে একত্রিত হয়।[১১২] ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে 'দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড' নামে একটি শারি'আহভিত্তিক ব্যাংক আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড হিসেবে নামধারণ করে।[১১৩] ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ নামে একটি বিদেশি বেসরকারি ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন নামধারণ করে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে।[১১৪] ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন নাম পরিবর্তন

---

১০৪. আর এ হাওলাদার ও সৈয়দ আশরাফ আলী, *ব্যাংক এবং আর্থিক ব্যবস্থার রীতিনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১০৫. Board of Editors, *Quarterly Scheduled Banks Statistics, July-September 2022*, ibid, p. i
১০৬. রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১
১০৭. Board of Editors, *Quarterly Scheduled Banks Statistics, July-September 2022*, ibid, p. i
১০৮. Board of Editors, *Quarterly Scheduled Banks Statistics, July-September 2022*, ibid, p. i
১০৯. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন ২০১৪ (২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নম্বর আইন)
১১০. বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১১১. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
১১২. Standard Chartered Bank, *Financial Statements 2021*(Dhaka : Financial Administration Division, 2022 AD), p. 2
১১৩. আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৯৩
১১৪. Board of Editors, *Quarterly Scheduled Banks Statistics, July-September 2022*, ibid, p. i

করে ব্যাংক আল-ফালাহ নামধারণ করে।[১১৫] আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এবি ব্যাংক হিসেবে নামধারণ পূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১১৬]

সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নামধারণ করে।[১১৭] ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং শুরু করে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক নামধারণ করে।[১১৮] শাহজালাল ব্যাংক লিমিটেড ২০০১ খ্রিস্টাব্দে শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে ও ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নামধারণ করে।[১১৯] এক্সিম ব্যাংক ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং চালিয়ে আসছে।[১২০]

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড, দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড এবং ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে।[১২১] মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড, মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড, এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড যাত্রা শুরু করে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে।[১২২] এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড কার্যক্রম শুরু করে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে।[১২৩] সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড ব্যাংকিং শুরু করে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে।[১২৪] প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কাজ শুরু করে।[১২৫] কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের কাজ শুরু করে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে।[১২৬] ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ফারমার্স ব্যাংক 'পদ্মা ব্যাংক' নামধারণ করে।[১২৭] ২০২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড এবং এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড, শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং শুরু করে এবং এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড 'গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' নামধারণ করে।[১২৮] বেঙ্গল কমার্স ব্যাংক লিমিটেডও তাদের কার্যক্রম শুরু করে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে।[১২৯]

---

১১৫. Bank Al-Falah Limited, *Auditors Report 2021*(Dhaka : Financial Administration Division, 2022 AD), p. 9
১১৬. এবি ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১১৮
১১৭. সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৪৪
১১৮. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৭৫
১১৯. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৪৪২
১২০. এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২০২
১২১. Board of Editors, *Quarterly Scheduled Banks Statistics, July-September 2022*, ibid, p. i
১২২. ibid.
১২৩. গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩২২
১২৪. সীমান্ত ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১২৫
১২৫. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৩
১২৬. কমিউনিটি ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৩১
১২৭. Board of Editors, *Quarterly Scheduled Banks Statistics, July-September 2022*, ibid, p. i
১২৮. ibid.
১২৯. বেঙ্গল ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : আর্থিক প্রশাসন বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৫৮

বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যাবলির সামগ্রিক অবস্থা : বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যাবলির সামগ্রিক অবস্থা নিম্নরূপ :[১৩০]

[টাকার পরিমাণে]

বিবরণ	এপ্রিল-জুন'২১	জুলাই-সেপ্টেম্বর'২১	অক্টোবর-ডিসেম্বর'২১	জানুয়ারি-মার্চ'২২	এপ্রিল-জুন'২২
আমানত	১,৪৩৯,৭৬৩.২৭	১,৪৬২,৮৮৮.১৩	১,৫১২,৪৭২.৫৬	১,৫১৪,৮৯৫.৩৩	১,৫৭৩,৮২৩.৩২
অগ্রিম	১,১৩৮,৮৪৫.৫০	১,১৫৭,৯৬৬.৪৪	১,২১০,৫৮৯.০৬	১,২৩৬,৬৪৭.৬৫	১,২৯৮,৬৫৯.৩৩
ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিল	২৯,৪৬০.৮৯	৩৫,০১৯.১২	৩৭,৫৯৬.৯৬	৪০,৬৮৬.৯১	৪০,০৫৫.৬৭
আমানতের উপর ওজনযুক্ত গড় সুদের হার (%)	৪.১৪	৪.০৯	৪.০৬	৪.০৪	৩.৯৮
অগ্রিমের উপর ওজনযুক্ত গড় সুদের হার (%)	৭.৪৩	৭.৩৮	৭.৪২	৭.২৮	৭.২৪
ঋণ	১,১৬৮,৩০৬.৩৯	১,১৯২,৯৮৫.৫৬	১,২৪৮,১৮৬.০২	১,২৭৭,৩৩৪.৫৬	১,৩৩৮,৭১৫.০০
বিনিয়োগ	৩৪৬,৯২৯.৩৮	৩৭৪,৩৩৮.০৫	৩৮৭,৩৬২.৮৪	৩৭৭,৬৭৩.২৮	৩৮৮,১১৮.৪৪
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধার	৭৩,৬২৬.১৪	৭৫,২৯৬.৮৫	৭৪,৯৩৪.৯৩	৮৪,৫৭২.৪০	৯১,৬৫৯.৭৮

আমানত : এপ্রিল-জুন'২২ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ ৩.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা জানুয়ারি-মার্চ'২২ ছিল ০.১৬ শতাংশ এবং এপ্রিল-জুন'২১ থেকে এপ্রিলজুন'২২ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সর্বমোট ৯.৩১ শতাংশ আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে।

অগ্রিম : এপ্রিল-জুন'২২ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে মোট অগ্রিম-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.০১ শতাংশ যা জানুয়ারি-মার্চ'২২-এ ছিল ২.১৫ শতাংশ এবং এপ্রিল-জুন'২১-এ ছিল ২.৪২ শতাংশ। এপ্রিল-জুন'২১ থেকে এপ্রিল-জুন'২২ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মোট অগ্রিমের পরিমাণ ১৪.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিল : ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিলের পরিমাণ এপ্রিল-জুন'২২ অর্থমেয়াদে ১.৫৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে যা জানুয়ারি-মার্চ'২২-এ ৮.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এপ্রিল-জুন'২১ অর্থমেয়াদে পূর্বের ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদের তুলনায় ৫.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সুদের হার : এপ্রিল-জুন'২১ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আমানতের উপর সুদের হার ৪.১৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে এপ্রিল-জুন'২২-এ ৩.৯৮ শতাংশ হয়েছে। আবার, অগ্রিমের উপর সুদের হার এপ্রিল-জুন'২১-এ ছিল ৭.৪৩ শতাংশ যা এপ্রিল-জুন'২২-এ ৭.২৪ শতাংশ হয়েছে।

ব্যাংক ক্রেডিট : এপ্রিল-জুন'২২-এ ব্যাংক ক্রেডিটের পরিমাণ ৪.৮১ শতাংশ যে হার জানুয়ারিমার্চ'২২-এ ছিল ২.৩৪ শতাংশ এবং এপ্রিল-জুন'২১-এ ছিল ২.৪৯ শতাংশ।

---

১৩০. Board of Editors, *Quarterly Report on Scheduled Bank Statistics*, ibid, pp. 7-10

বিনিয়োগ : এপ্রিল-জুন'২২-এ বিনিয়োগের পরিমাণ ২.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা জানুয়ারি-মার্চ'২২-এ ২.৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং এপ্রিল-জুন'২১-এ ৬.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধার : বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ধারের পরিমাণ এপ্রিল-জুন'২২-এ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৩৮ শতাংশ যা জানুয়ারি-মার্চ'২২-এ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১২.৮৬ শতাংশ এবং এপ্রিল-জুন'২১-এ পূর্বের ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ১২.২৭ শতাংশ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র ফুটে উঠে। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি ব্যাংকিং কার্যাবলির পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। মোটকথা, বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত একটি সন্তোষজনক ও শক্তিশালী কাঠামোর উপর দণ্ডায়মান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা

ব্যাংক একটি দেশের অর্থনীতির প্রধান অংশ। দেশের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থের যোগানদাতা হিসেবে ব্যাংককেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। ব্যাংক জনগণের আর্থিক সম্পদের হিফাজত করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বিনিয়োগ করে আর্থিক কর্মকাণ্ডের চাকা সচল রাখে। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থব্যবস্থা যাই হোক না কেন, ব্যাংক ছাড়া তা পরিকল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। তাই অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকগুলোর ভূমিকা ও এতদসম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

অর্থব্যবস্থার ধারণা : সহজভাবে বলা যায় একটি দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য যে পদ্ধতি, রীতিনীতি এবং কর্মপ্রবাহ অনুসরণ করা হয় তাকে সে দেশের অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থব্যবস্থার ধারণাকে অনেক সময় অর্থনীতির সমপর্যায়ের মনে করা হয়। কিন্তু দু'টি বিষয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থনীতি চাহিদা ও সম্পদের অপ্রতুলতার মাঝে সমন্বয় সাধনের তত্ত্বীয় দিকটি আলোচনা করে। কিন্তু অর্থব্যবস্থা চাহিদা ও সমন্বয় সাধনের জন্য যে কার্যাবলি সম্পাদন করা দরকার তার ব্যবহারিক পদ্ধতিগত দিক নিয়ে আলোচনা করে। অর্থব্যবস্থা বৃহৎ অর্থনীতির একটা সংজ্ঞা। তবে, অর্থব্যবস্থাই মূলত অর্থনীতির মূল প্রতিচ্ছবি। বর্তমান বিশ্বে একটি জাতির টিকে থাকার ভিত্তিই হলো সে দেশের অর্থনীতি। সামাজিক অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অবস্থারও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। সামাজিক ভিন্নতার কারণে অর্থনৈতিক রীতিনীতিগুলোও ভিন্ন হয়। একটি দেশের সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান অর্থনৈতিক রীতিনীতিগুলোকেই সে দেশের অর্থব্যবস্থা বলে। একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠার পিছনে উৎপাদন, ভোক্তা, বণ্টন, বিনিয়োগ, বিনিময়, বাণিজ্যের ধরন এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং বলা যায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো কোন সমাজ বা ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদন, সম্পদ বণ্টন এবং প্রাপ্ত ও সেবার বিতরণের ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সঠিক সমন্বয় সাধন করে চলতে হয় যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের সর্বোচ্চ ফলাফল সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা প্রদান করা যায়।[১৩১] তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি বলা যায়। একটা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মূলত তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে কাজ করতে হয়।[১৩২] যথা :

- কি উৎপাদন করতে হবে?
- কিভাবে উৎপাদন করতে হবে? এবং
- কার জন্য উৎপাদন করতে হবে?

---

১৩১. মাওলানা আব্দুল্লাহ মাসুম, *ইসলামের অর্থব্যবস্থা*(ঢাকা : আইএফএ কনসালটেন্সি, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ১১৬

১৩২. মুফতি তকি উসমানি, অনূ. মাওলানা আবদুল্লাহ আল-ফারুক, *পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম*(ঢাকা মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৭৯

'কি উৎপাদন করতে হবে এবং কি পরিমাণ?'– এ প্রশ্নের উত্তরে সে দেশের অর্থব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণের প্রয়োজন এবং চাহিদা বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 'কিভাবে উৎপাদন করতে হবে?'– এ প্রশ্নের উত্তরে সে দেশের অর্থব্যবস্থাকে উৎপাদন প্রক্রিয়া, অর্থসংস্থান, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ, উৎপাদনের সময়সীমা, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

'কার জন্য উৎপাদন করতে হবে?'– এ প্রশ্নের উত্তরে সে দেশের অর্থব্যবস্থাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, উৎপাদিত পণ্য থেকে সুবিধা প্রদানের জন্য সমাজের কোন শ্রেণি বা গোষ্ঠীর জনগণকে লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এ তিনটি উন্নয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করে অর্থনৈতিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করলে অবশ্যই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব। এ ছাড়া এ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধিত হবে, তথ্য আদান-প্রদান ফলপ্রসূ হবে এবং কিভাবে তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সে দিকেও আলোকপাত করে।

অর্থব্যবস্থার প্রকারভেদ : অভাব, প্রয়োজন, চাহিদা এবং দুষ্প্রাপ্যতা হচ্ছে মানবজীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। মানুষের জীবনের অগণিত অভাব, প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টিকর্তা অসীম সম্পদের ভাণ্ডার প্রকৃতিতে সৃষ্টি করে রেখেছেন।[১৩৩] কিন্তু অনেক সময় এ অসীম সম্পদকে ইচ্ছা করলেই সরাসরি এবং সমপরিমাণে প্রয়োজন পূরণের উপকরণ হিসেবে কাজে লাগানো যায় না। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজন মত পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত করণের দ্বারা সম্পদকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সম্পদকে প্রকৃতি থেকে মানুষের হাতে পৌঁছে দেয়ার যে ব্যবস্থ্ তা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। মানুষের অভাব এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য আসলে কি বস্তু উৎপাদন করা প্রয়োজন, প্রয়োজনীয় উৎপাদিত বস্তুটিকে কিভাবে মানুষের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যায় ও উৎপাদিত সম্পদ কাদের জন্য উৎপাদিত হয়েছে এ সকল সমস্যার সমাধান করতে হয়। এ সকল সমস্যার সমাধান বের করে সম্পদকে মানুষের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন সমাজ এবং দেশকে বিভিন্ন রকম অর্থব্যবস্থার সাহায্য নিতে হয়। তন্মধ্যে যে সকল অর্থব্যবস্থা প্রধান তা হলো– পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, মিশ্র অর্থব্যবস্থা ও ইসলামি অর্থব্যবস্থা। নিম্নে বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার পরিচয় তুলে ধরা হলো :

(ক) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সম্পদ উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা অর্জন করা।[১৩৪] সে জন্য প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায়। এ অর্থব্যবস্থায় পুঁজি বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগ থেকে মুনাফা প্রাপ্তিই মূলকথা। অবাধ প্রতিযোগিতা পুঁজিবাজারের মূল হাতিয়ার। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় তাতে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে।

ষোল শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সম্পদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সমাজতন্ত্রের জন্য হুমকিরস্বরূপ হয়ে দাড়ায়।[১৩৫] ফলশ্রুতিতে

---

১৩৩. মাওলানা আব্দুল্লাহ মাসুম, *ইসলামের অর্থব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১৩৪. আবদুর রকীব ও শেখ মোহম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি*(ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ১৬

১৩৫. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.), *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩০

বৃহদায়তন শিল্পব্যবস্থা গড়ে উঠে। সমাজের যারা পুঁজিপতি আছে তাদের উপর শিল্পের মূলধনের যোগান দেয়ার দায়িত্ব পড়ে। তারা নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক ক্রয় করে উৎপাদনের চাকা সচল রাখার প্রচেষ্টা চালায়। এভাবেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কাজ করে থাকে।

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সম্পদ রূপান্তর করে সেটা এবং মূলধনকে কাজে লাগিয়ে তা ব্যবহারযোগ্য করে গড়ে তোলাকে উৎপাদন বলে। যে কোন দেশের অর্থনীতিতেই ভূমি, শ্রম, উদ্যোক্তা এবং মূলধন এ চারটি উৎপাদন উপকরণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে ভূমি বলতে প্রাকৃতিক মৌলিক উপকরণ– আগুন, পানি, বাতাস, গাছ, মাটি সব অন্তর্ভুক্ত। পুঁজিবাদে শ্রম বলতে বুঝায় মানুষের শারীরিক এবং মেধার শ্রম যা খাটিয়ে কাঁচামালকে ব্যবহারযোগ্য সম্পদে পরিণত করা যায়। পুঁজিবাদে মূলধন বলতে অর্থ, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতিকে বুঝায় যা শ্রম দ্বারা উৎপাদিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরাসরি তা ব্যবহার করা যায় না; বরং এ মূলধন ব্যবহারযোগ্য সম্পদ উৎপাদনে কাজে লাগে। সবশেষে পুঁজিবাদে উদ্যোক্তা বলতে বুঝায় এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যে ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বয় করে উৎপাদনের কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে। এ ক্ষেত্রে মুনাফা বণ্টনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা হলো– ভূমির মালিককে তার নির্ধারিত ভাড়া প্রদান করা হবে, শ্রমিককে প্রাপ্য মজুরি প্রদান করা হবে, পুঁজি সরবরাহকারী পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ পাবে এবং উদ্যোক্তা মুনাফা লাভ করবেন।

(খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন এবং ভোগের স্বাধীনতা থাকে না।[১৩৬] স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন সুযোগ থাকে না। সমাজের কোন জনগোষ্ঠীর জন্য কি উৎপাদন করা হবে, কিভাবে উৎপাদন করা হবে এবং কারা উৎপাদিত পণ্য থেকে লাভবান হবে তা নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে। এখানে উৎপাদনের উপকরণগুলো সমাজের হাতে ন্যস্ত থাকে। সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থা সংঘটিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার চেয়ে সামাজিক কল্যাণ বেশি বিবেচনা করা হয়। সে জন্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পণ্য ভোক্তারা কিনতে বাধ্য থাকে।

সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণ পুঁজিবাদের মত চারটি নয়; বরং দু'টি– ভূমি ও শ্রম।[১৩৭] মূলধনকে সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয় না। কারণ মূলধনকে পূর্ববর্তী একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়েই সর্বশেষ প্রাপ্য উৎপাদনে নিয়োজিত হতে হয়। আর উদ্যোগ গ্রহণে সমাজতন্ত্রে শ্রমের একটি সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য করা হয়। সমাজতন্ত্রে যেহেতু ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয় সেহেতু রাষ্ট্রই উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে। আবার ভূমি ও পুঁজির যোগানদাতাও রাষ্ট্র। তাই ভূমি, পুঁজি এবং উদ্যোগ গ্রহণের প্রাপ্য অংশ রাষ্ট্রের হাতেই থাকে। সুতরাং শুধুমাত্র শ্রমিকের পারিশ্রমিকই রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হয়। পারিশ্রমিক বাজার ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এখানে চাহিদা যোগানের কোন ভূমিকা এখানে নেই। বরং রাষ্ট্র যা নির্ধারণ করে শ্রমিক তাই পায়।

---

১৩৬. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১৩৭. খন্দকার আবুল খায়ের, *ইসলামী অর্থনীতির ভূমিকা*(ঢাকা : খন্দকার প্রকাশনী, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১১

(গ) মিশ্র অর্থব্যবস্থা : পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের সম্মিলন ঘটে মিশ্র অর্থব্যবস্থায়।[১৩৮] অর্থাৎ উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার সাথে সাথে সরকারি হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন পড়ে। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার সাথে সাথে সরকারি মালিকানাও বিদ্যমান। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত খাতে যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাতে মুনাফা অর্জন মূল লক্ষ্য হলেও সরকারি খাতে যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাতে সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি মূখ্য থাকে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রিয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা নেয়া হয়। তবে বেসরকারি খাতে গৃহীত উদ্যোগকেও এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়। বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে চাহিদা যোগানের ভিত্তিতে প্রাপ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে সরকারের হস্তক্ষেপ করা জরুরি হয়ে পড়ে। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা করে তাদের শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকার বদ্ধপরিকর থাকে।

(ঘ) ইসলামি অর্থব্যবস্থা : ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামি শারি'আহর আলোকে পরিচালিত হয়।[১৩৯] এ অর্থব্যবস্থা মানবসৃষ্ট সকল অর্থব্যবস্থার উর্ধ্বে। ইহকালিন এবং পরকালিন সফলতা অর্জনের জন্য এটা মহান আল্লাহ প্রদত্ত অর্থব্যবস্থা যা সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য কল্যাণকর। ইসলামি আইনের চারটি উৎস– কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস–এর উপর ভিত্তি করে এ অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়।[১৪০] ইসলামি অর্থব্যবস্থা মূলত মানবজীবনের কোন বিচ্ছিন্ন অংশের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং মানবজীবনের সার্বিক দিক নিয়েই এটি আলোচনা করে। কারণ ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রভাব শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক নয়; বরং সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান।

গতানুগতিক অর্থব্যবস্থা অনুযায়ী মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত। কিন্তু ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলকথা হলো সম্পদ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নি'আমত। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নি'আমত কখনো সীমিত হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে কোন সীমা-পরিসীমা দিয়ে পরিমাপের ক্ষমতা মানবকূলের নেই। কিন্তু আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রিযকের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ সম্পদ তার নির্ধারিত গণনায় কতটুকু আমরা কাজে লাগাতে পারব ইসলামি অর্থব্যবস্থা তা নিয়েই আলোচনা করে।[১৪১] মোটকথা বিশ্বজাহানের সকল সম্পদের মালিকানা একচ্ছত্রভাবে আল্লাহর। তাই আল্লাহর মালিকানাধীন সকল সম্পদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তাঁরই নির্দেশিত পন্থায় পরিচালিত হবে। তাঁরই দেখানো পথে মানুষ উৎপাদন, উত্তোলন, বণ্টন, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ভোগ ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করবে।

যেখানে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা সুদ নিভর্র , সেখানে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুদকে হারাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি একটি সুদমুক্ত মুনাফানিভর্র অর্থব্যবস্থা। পুঁজিবাদে সুদ এবং মুনাফার মাঝে কোন

---

১৩৮. মুফতী তকী উসমানী, অনূ. মাওলানা আবদুল্লাহ আল-ফারুক, *পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র ও ইসলাম*(ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৭৫

১৩৯. Prof. Dr. M. A. Mannan, *Islamic Economics : Theory and Practice*, ibid, p. 51

১৪০. Fahda Nur Ahmad Kamar & Others, *Islamic Financial System : Principles & Operations*, ibid, p. 154

১৪১. Adam Abdullah & Others, *Islamic Economics : Principles & Analysis*, ibid, p. 32

পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ইসলামি অর্থব্যবস্থা চোখে আঙ্গুল দিয়ে সুদ এবং মুনাফার মাঝে পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। পুঁজিবাদে সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে না বলে ব্যক্তি মালিকানার অধীনে শ্রেণি বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মাঝে একটি ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তনমূলক সম্পর্ক বিরাজ করে। ফলে শ্রমিক শ্রেণির শোষণের স্বীকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি ভেদাভেদের কোন সুযোগ নেই। যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভিত্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম। যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির কারণে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ধনী ও গরিবের বৈষম্য হ্রাস পায়। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের স্বাধীনতা কেবলমাত্র হালাল বস্তুর মাঝে সীমিত; হারাম বস্তু উৎপাদনের কোন সুযোগ এ অর্থব্যবস্থায় নেই।

বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থা : ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থা সকল প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। স্বাধীনতার পর তৎকালীন যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দেশকে উদ্ধারপূর্বক অর্থনৈতিকভাবে বলম্বী করে তোলার জন্য কিছুটা সমাজতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি ছিল। সমাজতন্ত্রের আলোকে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিকভাবে ১৫ লক্ষ টাকার সঠিক পরিমাণে মূলধনের যোগানদাতা বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, পাট, বস্ত্র ও চিনিকল, বিমান এবং শিপিং কর্পোরেশনকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয়। এতে দেশের মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮৫ শতাংশই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যায়।[১৪২]

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর সরকার পরিবর্তন হলে পরবর্তী সরকার এ ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আনে। পরবর্তী সরকারের শাসনামলে বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি পুঁজি প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি পুঁজিবাদেও বৈশিষ্ট্যও ধারণ করে। সে সময় থেকেই ব্যক্তি মালিকানায় কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা শুরু হয়। সরকারি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত এবং বেসরকারি নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠিত হয় বিধায় বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি হাসপাতাল, ব্যাংক, পরিবহণ ব্যবস্থা , ডাক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপশি বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা, পরিবহণ ব্যবস্থা, ব্যাংক, টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি এবং কুরিয়ার সার্ভিসও চালু রয়েছে। প্রতিবছর সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের জন্যও সরকার বাজেট বরাদ্দ করে।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান ছিল ক্রমান্বয়ে ৮৯ ও ১১ শতাংশ।[১৪৩] দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৩ ও ১৭ শতাংশ।[১৪৪] চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বরাদ্দের হার হয় যথাক্রমে ৫৬ ও ৪৪ শতাংশ[১৪৫]।

---

১৪২. এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার :* ১৯৭১-৭৫(ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৩০

১৪৩. Editorial Board, *First Five Year Plan*(Dhaka : Minstry of Planning, The Peoples' Republic of Bangladesh, 1997 AD), Chapter 3, Struture of the plan, p. 32

১৪৪. Editorial Board, *Second Five Year Plan*(Dhaka : Minstry of Planning, The Peoples' Republic of Bangladesh, 1997 AD), Chapter 3, Plan Size Targets and Sectoral Allocation, p. 41

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হয় যথাক্রমে ৪৪ ও ৫৬ শতাংশ।[১৪৬] অর্থাৎ দেখা যায় বেসরকারি খাতে বাজেট বরাদ্দের হার ক্রমাগত বর্ধিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর ব্যাংকের প্রভাব : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সাথে সম্পদের সদ্ব্যবহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর ব্যাংকের প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :[১৪৭]

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে ব্যাংকের ভূমিকা : বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবেলায় সরকারকে যেমন জরুরি পদক্ষেপ নিতে হয়, ঠিক তেমনি এ প্রকৃতিই তার অগণিত সম্পদ দিয়ে এ দেশের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে রেখেছে। শুধু প্রয়োজন শক্তিশালী ও সঠিক অবকাঠামো যা প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্বব্যবহারকে সঠিক রূপ দিতে পারবে। বাংলাদেশে যে সকল অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলো হলো– প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, পাথর, ইট, সাদা মাটি, কাঁচ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নগরায়ন, শিল্পায়ন, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোদমে এ সব প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক উত্তোলন, বণ্টন এবং এগুলো থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপযোগ গ্রহণের ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন এবং ব্যবহারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশে সপ্তম। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের গণনা অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত মোট ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে ২৭.০৩৮ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৪৮]

কয়লা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের গণনা অনুযায়ী বাংলাদেশে ২ হাজার ৭০০ মিলিয়ন টন কয়লার মজুদ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বাংলাদেশে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের গণনা অনুযায়ী ৩০৮ মিলিয়ন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ৯ মিলিয়ন টন সিলিকা মাটি, ০.৮ মিলিয়ন টন সিরামিক মাটি, ১ হাজার ২৩৫ মিলিয়ন টন কঠিন শিলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের বিশাল মজুদের পরিমাণ পাওয়া যায়।[১৪৯]

প্রাকৃতিক সম্পদের এ বিশাল মজুদকে কাজে লাগানোর জন্য সঠিক আইন জরুরি। ব্যাংকিং কাঠামোর উন্নয়ন ছাড়া ও ব্যাংকগুলো যদি সঠিকভাবে বিনিয়োগের কাজকে সহায়তা না করে তাহলে এ বিপুল সম্পদকে কাজে লাগানো সম্ভব না। তাই, নীতিনির্ধারকগণকে ব্যাংকিং খাতকে দক্ষ মধ্যস্ততাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে জরুরিভিত্তিতে তারা

---

১৪৫. Editorial Board, *Forth Five Year Plan*(Dhaka : Minstry of Planning, The Peoples' Republic of Bangladesh, 1997AD), Chapter 2, Implementation Strategies for the fourth five year plan, p. 17

১৪৬. Editorial Board, *Fifth Five Year Plan*(Dhaka : Minstry of Planning, The Peoples' Republic of Bangladesh, 1997AD), Chapter 3, Plan Size Sectorial Allocation and Projections, p. 57

১৪৭. Barkat E-Khuda, *Economic Growth in Bangladesh and the role of Banking Sector*(Dhaka : The Financial Express, January, 11, 2019 AD), See. https://thefinancialexpress.com.bd/ views/views/, visited on 21.11.2022 AD.

১৪৮. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫*(ঢাকা : জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৬-৬৮

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

ব্যাংকিং খাতকে প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদন এবং উত্তোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ নিয়ে বসে থাকলেই হবে না। সে সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য উপায়ে রূপান্তরিত করে তা থেকে উপযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সে জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সোচ্চার হতে হবে। আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকই প্রধান ভূমিকা পালন করে সেহেতু ব্যাংকিং খাতে এ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গতিশীল হতে হবে।

(খ) মূলধন গঠনে ব্যাংকের ভূমিকা : স্বাধীনতার পর বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ যখন নতুন পরিচিতি লাভ করে তখন ক্রমাগত বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় অসন্তোষজনক ছিল।[১৫০] যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দেশকে পরিত্রাণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অক্লান্ত চেষ্টার ক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে পুরোজাতি শোকে বিহব্বল হয়ে পড়ে এবং সে বছরে অর্থনীতি আরো একধাপ পিছিয়ে যায়। এ পরিস্থিতি আশির দশকের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। নব্বই দশকের পুরোটা সময়ে অর্থনীতি প্রতিবছর গড়ে ৪ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।[১৫১]

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের পর জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি অর্থখাতে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশার সঞ্চার বৃদ্ধি করে যার বাস্তবায়ন দেখা যায় ২০১১-১২ অর্থবছরে যখন প্রবৃদ্ধি ৫.১৩ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। ২০০৪ থেকে ২০০৮ অর্থবছরগুলোর মধ্যে অর্থখাতে গড়ে ৪.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার বছরেও বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৯ শতাংশ।[১৫২] ১৯৯০-এর দিকে যে বিষয়গুলো প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশি সহায়ক ছিল তা হলো অবকাঠামোগত মূলধন এবং মানবসম্পদ। সে সময়ের অবকাঠামোগত মূলধন এবং মানবসম্পদের প্রতুলতা দীর্ঘমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বেশ সহায়ক হয়েছে।

পরবর্তীতে কার্যক্ষম জনশক্তির যোগ্যতা ও দক্ষতার বিষয়টি সামনে আসে। কারণ প্রথম দিকে কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত জনবলের বিষয়টি মূখ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার বিষয়টি সামনে আসে তখন বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে আগ্রহী জনবলকে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ কায়িক শ্রমভিত্তিক বাজারগুলো প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটা অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সাহায্য করে না। বিভিন্ন দেশের মাঝে প্রবৃদ্ধির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় মূলত মূলধন গঠন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির দক্ষতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে বুঝা যায় যে, বর্ধিত সঞ্চয় যখন বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয় তখন সেটা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। ১৯৯১-২০০৬ বছরগুলোতে যে পুঞ্জিভূত অবকাঠামোগত মূলধন ছিল তা যথাযথভাবে যখন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হলো তখনই

---

১৫০. আর এ হাওলাদার ও সৈয়দ আশরাফ আলী, *ব্যাংক এবং আর্থিক ব্যবস্থার রীতিনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১১৩

১৫১. ড. জাইদী সাত্তার, *নব্বইদশক ছিল বাণিজ্যনীতির স্বর্ণযুগ*(ঢাকা : পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আগস্ট ৩১, ২০২১ খ্রি.), দ্র. https://www.pri-bd.org/news_and_events/, visited on 17.02.2023 AD

১৫২. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২*(ঢাকা : অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অক্টোবর ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৫২

তা প্রবৃদ্ধিকে বৃদ্ধি করল। মোটকথা পূর্ববর্তী সরকারি খাতে যে বিনিয়োগ ছিল তার সাথে যখন বেসরকারি খাতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেল তখনই তা প্রবৃদ্ধিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। পরবর্তীতে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের হারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটে যা প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সঞ্চয়, মূলধন গঠন, পুঞ্জিভূত করা এবং বিনিয়োগের সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে মূলধন গঠনের পরিমাণ মোট জিডিপির ৩১.৫৭ শতাংশ।[১৫৩]

সর্বজনস্বীকৃত একটি ধারণা হলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে শক্তিশালী ব্যাংকিং খাত অন্যতম প্রধান মাধ্যম। শক্তিশালী ব্যাংকিং খাত জনগণের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের মাঝে মধ্যস্থতা সৃষ্টি করে। দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ কোন কোন খাতে বণ্টিত হবে তা ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। জনগণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সহায়তা করে মূলধনকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য করে বলেই ব্যাংকিং খাতের গুরুত্ব এত বেশি। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার অর্থনৈতিক যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে তা শক্তিশালী ব্যাংকিং খাত ছাড়া পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

(গ) উদ্যোক্তা গঠনে ব্যাংকের ভূমিকা : বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য হ্রাসের এক ফলপ্রসূ খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[১৫৪] কারো অধীনে চাকুরির আশায় বসে না থেকে নিজের সঞ্চিত বা ঋণের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করে তা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে পারলে দেশের বিরাট একটা অংশ যেমন বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি পায় তেমনি এ সকল বিনিয়োগকারী আরো বহুলোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং সে সাথে দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এ সকল উদ্যোক্তা শ্রেণির সহায়তার লক্ষ্যে সরকার সব সময়ই সোচ্চার।

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কর্মক্ষম জনশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সরকারের মতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এটিই প্রধান খাত। বেসরকারি শিল্পখাতের অগ্রগতিতে ক্ষুদ্র, কুটির এবং মাঝারি শিল্প ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৫৫] দেশের ৩০ শতাংশ জিডিপি এ খাতের উপর নির্ভর করে এবং ৪০ শতাংশ বেসামরিক জনশক্তি এর আওতায় কাজ করে। দেশের শিল্প খাতের ৮০ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে দেশের মোট কর্মক্ষম জনশক্তির ২৫ শতাংশ লোক কাজ করে।[১৫৬] দেশের গুরুত্বপূর্ণ এ খাতে অপার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে দেশের সকল ব্যাংক উদ্যোক্তদের সন্তোষজনক হারে ঋণ প্রদান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে।

---

১৫৩. Gross Capital Formation (% of GDP)-Bangladesh. see. https://tradingeconomics.com/bangladesh/gross- capital-formation-percent-of-gdp-wb-data.html. visited on 17.02.2023 AD

১৫৪. Dr. Mahmood Ahmed, *Islamic Banking : A Solution for Global Financial Challenges*(Dhaka : Muktodesh Prokashon, 2018 AD), pp. 118-138

১৫৫. মনজু আরা বেগম, *বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প*(ঢাকা : দৈনিক যুগান্তর, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রি.), দ্র. https://www.jugantor.com/todays-paper/window/224925/, visited on 17.02.2023 AD

১৫৬. এম এ খালেক, *জনশক্তি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিয়ে ভাবতে হবে*(ঢাকা : দৈনিক যুগান্তর, ৪ আগস্ট, ২০২২ খ্রি.), দ্র. https://www.jugantor.com/todays-paper/sub-editorial/580194/, visited on 17.02.2023 AD

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১০ শতাংশ কাঙ্খিত জিডিপি অর্জনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাগণকে বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রনোদনা দিয়েছেন।[১৫৭] ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট হয়। সে লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত দেশের বিরাট একটি জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং খাতের আওতায় নিয়ে আসা বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের দ্রুত শিল্পায়নকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্বতন্ত্র্য বিভাগ চালু করে যার মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি। এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ঠিক করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের যে বিশেষ বিশেষ এলাকা যে বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিখ্যাত সে সব এলাকায় বিখ্যাত বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে উদ্যোক্তাদের ঋণ দিচ্ছে। ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদের বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। উৎপাদনশীল ও সেবামূলক খাতকে মূল লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী দেশের পুরো ব্যাংকিং খাতও উদ্যোক্তা গঠনে সোচ্চার হয়ে কাজ করছে।

(ঘ) মানবসম্পদ সদ্ব্যবহারে ব্যাংকের ভূমিকা : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[১৫৮] একটি প্রতিষ্ঠান যতই প্রযুক্তিনির্ভর হোক না কেন তা কোন অংশেই মানবসম্পদের গুরুত্বকে হ্রাস করে না। একটি দেশ বা প্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগতভাবে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য হয়ত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধন করে। কিন্তু সে অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার পিছনে দক্ষ ও যোগ্য জনগোষ্ঠীকেই সূচারুভাবে কার্য সমাধা করতে হয়। তাই দেশ, জাতি এবং প্রযুক্তির সফল পরিচালনার জন্য মানবসম্পদের গুরুত্ব কখনই অস্বীকার করা যায় না।

মানবসম্পদকে একটি প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু খুব কম প্রতিষ্ঠানই তার কর্মীদের মধ্য থেকে দক্ষতার সাথে কাজ আদায় করতে পারে। কারণ কর্মীর মধ্য থেকে দক্ষতাকে খুঁজে বের করার জন্যও এ বিষয়ে পারদর্শী জনবল দরকার হয়। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এমন এক খাত যেখানে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ জনবল নিয়োগ হয়। সে দিক থেকে চিন্তা করলে ব্যাংকিং খাত এ দেশের যুবসমাজের জন্য এক আকর্ষণীয় কর্মক্ষেত্র। এ বিপুল পরিমাণে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের সংগ্রহ, নির্বাচন, কার্য বিশ্লেষণ, প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন, প্রেষণা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং নিরীক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবশ্যই শক্তিশালী মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ থাকতে হবে।

ব্যাংকিং খাত একটি জ্ঞানভিত্তিক এবং সেবামূলক খাত। ব্যাংকিং খাতের কাজকর্মের ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল এ ব্যবসায় পরিচালনার জন্য বেশি প্রয়োজন। জনশক্তিকে তখনই সম্পদে পরিণত করা যায় যখন জনশক্তিকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায়। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো প্রতি বছর বিপুল

---

১৫৭. মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, *প্রেস রিলিজ*(ঢাকা : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন, ১৩ জুলাই ২০২১ খ্রি.), দ্র. https://smef.portal.gov.bd/site/view/news/-?page=2&rows=20, visited on 17.02.2023 AD

১৫৮. Shimul Ray, Sraboni Bagchi, Md. Shahbub Alam and Umme Salma Luna, *Human Resource Management Practices in Banking Sector of Bangladesh : A Critical Review*(Dhaka : IOSR Journal of Business and Management, 23, No. 7, July, 2021 AD), pp 4-6

পরিমাণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে তাদের শূন্যপদের বিপরীতে আবেদনপত্র পায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রবেশমূলক স্তরের জন্য আবেদনপত্র পেলেও কখনো কখনো এ নিয়োগ মধ্যমস্তর ও উচ্চ পর্যায়েরও হয়ে থাকে। এ বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও নির্বাচন শেষে তাদের নির্দিষ্ট পদের বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগ শেষে ব্যাংকিং খাতের মৌলিক কিছু প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের জন্য কার্য বিশ্লেষণ করা হয়। কার্য বিশ্লেষনের জন্য সাধারণত মৌলিক পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশ্নপত্র পূরণ, দলগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা পরিমাপ প্রভৃতি পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়। ব্যাংকিং খাত একটি প্রতিযোগিতামূলক খাত। এ খাতে প্রত্যেক কর্মী এক সাথে বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করে।

কার্যসম্পাদন দক্ষতার উপর এ খাতে কর্মীর পদোন্নতি নির্ভর করে। এ খাতে কর্মীর কার্য সম্পাদন দক্ষতা পরিমাপ করা হয় একটি গোপন বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে। এ প্রতিবেদন বিশেষ করে প্রবেশ স্তরের কর্মীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিজনিত কার্যক্রমের জন্য ব্যাংকসমূহ প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর কাজের সাথে পরিচিতি, নতুন কোন কাজের দক্ষতা অর্জন, নেতৃত্বায়ন, তত্ত্বাবধান করার যোগ্যতা অর্জন প্রভৃতি পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। কর্মীরা যে স্তরেরই হোক না কেন তাদের জন্য সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবশ্য কর্তব্য।

(ঙ) প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা : ব্যাংকিং-এর প্রাথমিক যুগে কেবল মাত্র আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান জনিত কাজকর্মের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে ব্যাংকের কার্যাবলি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। শুধুমাত্র কার্য পরিধির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। তা ছাড়া আর্থিক ও পরিসংখ্যান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানবসম্পদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। সে সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দক্ষতা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাছাড়া ই-ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এসএমএস ব্যাংকিং, এ্যাকাউন্ট ওপেনিং, ফান্ড ট্রান্সফারিং ইত্যাদি বিভিন্ন কাজকর্ম প্রযুক্তি ছাড়া বর্তমানে অসম্ভব।[১৫৯]

টেলিকমিউনিকেশনের প্রসার, তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রভৃতি প্রসারের কারণে ব্যাংকগুলোর জন্য প্রযুক্তিভিত্তিক কাজে সফল হওয়া সম্ভব হচ্ছে। ক্রেডিট স্কোরিং টুল ব্যবহার করে নিয়মিত ঋণ প্রদান কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টুল ব্যবহার করে ঋণের ঝুঁকি পরিমাপ করা হয়।

ঝুঁকিভিত্তিক মূলধনকে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের জন্য ভ্যালু এডেড রিস্ক টুল মেশিনের মাধ্যমে সহজেই অর্থ উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাচ্ছে।

ই-ব্যাংকিং-এর সহায়তায় নোট বহনের ঝুঁকি ও চাপ হ্রাস করে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে এমনকি বিদেশেও টাকা পাঠানো যাচ্ছে। বাংলাদেশে পরিচালিত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রযুক্তিগত প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। নব্বই দশকের শেষের দিকে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি দেশিয় বেসরকারি ব্যাংকগুলোও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মপন্থা অবলম্বনের দিকে এগিয়ে এসেছে।[১৬০] বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে কর্মরত বেশিরভাগ কর্মীই তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

---

১৫৯. সম্পাদনা পরিষদ, *সরকারের সাফল্যের দশ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা*(ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জুন, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৪-৬

১৬০. Mahmudul Hasan, *How innovations are transforming banking in Bangladesh*(Dhaka : The Daily Star, September 25, 2022 AD), see. https://www.thedailystar.net/business/news/how-innovations-are-transforming-banking-bangladesh-3127411, visited on 17.02.2023 AD

বাংলাদেশ একটি আমদানিনির্ভর দেশ। শিল্পায়নের জন্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি জিনিসপত্র সব সময়ই আমদানির প্রয়োজন পড়ে। আমদানির সাথে জড়িত সকল কাজই ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল। অর্থ বিনিয়োগ থেকে শুরু করে মূল্য প্রদান, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সকল কাজই ব্যাংকের মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া এলসি খোলার মাধ্যমে আমদানির কাজকে সহজ করতে ব্যাংকই একমাত্র ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকগুলো বাণিজ্যিক খাতে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও এ ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে রেডিমেট গার্মেন্টস খাতে ব্যাংকগুলো সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করছে। আমদানি খাতে ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত আমদানি খাতে ব্যয় ২.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৬১] এ বিপুল পরিমাণ আমদানির কাজকে ত্বরান্বিত করতে ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(চ) বৈদেশিক রেমিটেন্স আদায়ে ব্যাংকের ভূমিকা : বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে ব্যাংকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশে গৃহীত বৈদেশিক রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১৪.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[১৬২] বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের তড়িৎ অগ্রগতির কারণে এ রেমিটেন্স আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, দেশিয় ব্যাংকগুলোর বর্ধিত হার নির্ধারণ এবং হুন্ডি ও অবৈধভাবে বিদেশে শ্রমিক পাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের শক্ত অবস্থান রেমিটেন্স বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।[১৬৩]

(ছ) কৃষিখাতে ব্যাংকিং-এর অবদান : কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে সরকার ব্যাংকগুলোকে কৃষিখাতে স্বল্প হার মুনাফায় ঋণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে।[১৬৪] বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে কৃষকদের ঋণ প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে যেমন কিছু সমবায় প্রতিষ্ঠানকেও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ঋণ প্রদান কার্যক্রমকে সঠিকভাবে তত্ত্বাবধায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে সঠিক গোষ্ঠীর হাতে ঋণ পৌঁছায়। বর্গাচাষীদের জন্য ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ ফান্ড গঠন করা হয়েছিল।[১৬৫] ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর অর্থের ঘাটতি পূরণের জন্য পুনরায় তাদের বিনিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। এতদসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংকের শাখার সংখ্যাও বর্ধিত করা হচ্ছে।

(জ) অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা : ব্যাংকিং খাতের উপর ভিত্তি করেই দেশের মূল অর্থনীতি দাঁড়িয়ে থাকে। কেন্দ্রিয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক সকলের মূল লক্ষ্যই হলো দেশের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখা।[১৬৬] ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিও

---

১৬১. Bangladesh Bank, *Annual Import Payments of Goods and Services 2021-2022*(Dhaka : Statistics Department, 2022 AD), p. iv

১৬২. সম্পাদনা পরিষদ, *সরকারের সাফল্যের দশ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৬৩. Bangladesh Bank, *Quaterly Report on Remittance Inflows, October-December 2018*(Dhaka : Rescarch Department, External Economic Division, 2019 AD), p. 4

১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১৬৫. বিশেষ প্রতিনিধি, *৩ লাখ বর্গাচাষীকে ঋণ দিতে ৫০০ কোটি টাকার তহবিল*(ঢাকা : বিডি নিউজ ২৪, সেপ্টেম্বর ১২, ২০০৯ খ্রি.), দ্র. *https://bangla.bdnews24.com/business/article442729.bdnews*, visited on 17.02.2023 AD

১৬৬. Muhammad Shahbaz and others (ed.), *Economic Growth and Financial Development : Effects of Capital Flight in Emerging Economies*(Switzerland : Springer, 2021 AD), p. 125

ব্যাংককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। দেশের জনগণের সঞ্চয়কে সুরক্ষিত রেখে তা পুঁজিতে রূপান্তরিত করা, বিনিয়োগে কাজে লাগানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, ব্যবসা-বাণিজ্যকে সহজিকরণ, কৃষিখাতকে গতিশীল করা, আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার, সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য যুগের পর যুগ কাজ করে যাচ্ছে।

(ঝ) রাজনৈতিক অবস্থার উপর ব্যাংকের ভূমিকা : একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে সে দেশের ব্যাংকব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের কেন্দ্রিয় ব্যাংক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় খুব সহজেই রাজনৈতিক অস্থিরতা সামাল দেয়ার ক্ষমতা রাখে। কেন্দ্রিয় ব্যাংক উন্নয়নমূলক নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে সরকারের কার্যাবলিকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে। সরকারের কার্যাবলি জনকল্যাণমূলক হলে তা রাজনৈতিকভাবে দেশকে স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যায়।[১৬৭]

(ঞ) সামাজিক অবস্থার উপর ব্যাংকের প্রভাব : শক্তিশালী ব্যাংকব্যবস্থা দেশের সামাজিক কাঠামোকে অনেকখানি দৃঢ় করতে সক্ষম। ব্যাংক আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে এর মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। আবার, ব্যাংক বিনিয়োগকে সচল রেখে উৎপাদনশীলতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। উৎপাদন অব্যাহত রাখলে তা দেশের জনগণের চাহিদা মিটাতে পারে। সাধ্যের মধ্যে চাহিদা মিটানোর সক্ষমতা তৈরি হলে সামাজিকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত থাকে।[১৬৮]

(ট) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাংকের ভূমিকা : দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করতে পারে।[১৬৯] কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো এমন অনেক কাজ করতে পারে যা বেসরকারি ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় সরকারের প্রয়োজন পূরণের প্রতি বেশি প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ প্রদর্শন করে। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যখন পর্যাপ্ত তহবিল হাতে রাখতে পারে তখন স্বাভাবিকভাবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হয়।

বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় ব্যাংকের ভূমিকা : বাংলাদেশে বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম। নিচে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত হরা হলো :

(ক) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক : প্রাথমিকভাবে ব্যাংকের কার্যাবলি কেবলমাত্র ঋণ প্রদান ও আমানত গ্রহণ করে এ দু'য়ের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জনের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংকের কার্যাবলি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। একটি রাষ্ট্রের সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল কেন্দ্র হিসেবে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে। বর্তমানে পুঁজিবাজারের সাথে ব্যাংকের গভীর সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায়। তাই ব্যাংকগুলো এখন শুধুমাত্র ব্যাংকিং কার্যক্রমে

---

১৬৭. Emily Jones (ed.), *The Political Economy of Bank Regulation in Developing Countries : Risk and Reputation*(UK : Oxford University Press, 2020 AD), p. 68

১৬৮. Roland Benedikter, *Social Banking and Social Finance : Answers to the Economic Crisis*(New York : Springer, 2011 AD), p. 49

১৬৯. M. Mozammel Hoque and P. K. P. K. Subramaniam (ed.), *Bangladesh : Finance Accountability for Good Governence*(Washington DC : The World Bank, 2002 AD), p. 15

নিজেদের আবদ্ধ না রেখে পুঁজিবাজারে প্রবেশ করে শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে জনসাধারণকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করছে।[১৭০]

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ টিকে আছে ব্যাংকিং খাতের সফলতার উপর। কারণ প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সুদকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন খাতে পুঁজি সরবরাহকারী লাভ হিসেবে সুদকেই গ্রহণ করে থাকে। আবার পুঁজি সরবরাহকারীর যখন পুঁজির ঘাটতি দেখা দেয় তখন ব্যাংকই সুদের ভিত্তিতে তাকে ঋণ প্রদান করে। সুতরাং, পুঁজিবাদে উৎপাদনের মূল উপকরণের মধ্যেই সুদিব্যবস্থা অবশ্য বিদ্যমান। আর প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সুদকে নিয়েই যেহেতু কাজ করে সেহেতু পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সাথে ব্যাংকের সম্পৃক্ততা অনেক বেশি।

(খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরাসরি সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে।[১৭১] এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নির্ধারিত উৎপাদনশীলতা চলমান রাখতে জন্য পুঁজি বিনিয়োগের জন্য এবং জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যস্ততার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। সমাজতন্ত্রে কেন্দ্রিয় ব্যাংকের অধীনে বিশেষায়িত বিনিয়োগ ব্যাংক বিনিয়োগ কার্যক্রম সচল রাখার জন্য কাজ করে। বিনিয়োগকারী ব্যাংকগুলো বিশেষ দায়িত্ব পালন করলেও মূল পরিচালনার দায়িত্বভার কেন্দ্রিয় ব্যাংকের উপরই ন্যস্ত থাকে।

কেন্দ্রিয় ব্যাংক তার অধীনস্ত অন্যান্য বিশেষ ব্যাংকের স্বল্প মেয়াদি ঋণের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। সমাজতন্ত্রে কেন্দ্রিয় ব্যাংক সমগ্র দেশে মুদ্রার সরবরাহ অব্যাহত রাখে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভিভাবক হিসেবেও কাজ করে। দেশের সকল উৎপাদনশীল এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যাবলির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কেন্দ্রিয় ব্যাংক কাজ করে। এ ছাড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের বাস্তবায়নের জন্য নগদ অর্থ বণ্টনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধান করে। মোটকথা পুঁজিবাদের মত সমাজতন্ত্রেও অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যাংকের মাধ্যমে স্থিতিশীল রাখা হয়।

(গ) মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক : মিশ্র অর্থব্যবস্থায় দেশের সমগ্র ব্যাংকব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রিয় ব্যাংক।[১৭২] কেন্দ্রিয় ব্যাংকের অধীনে সকল বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো পুঁজিবাদের মত যেমন সুদকে কেন্দ্র করে কাজ করে তেমনি সমাজতন্ত্রের মত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর সাহায্যও নেয়। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহের সহাবস্থান দেখা যায়। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খাতকে সচল রাখার জন্য প্রণোদনা প্রদান করা মিশ্র ব্যাংক ব্যবসায় ব্যাংকসমূহের দায়িত্ব।

আবার পুঁজি সরবরাহকারীদের বিনিয়োগ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের বিনিয়োগের জন্য সুদে ঋণ প্রদান করাও মিশ্র অর্থব্যবস্থার ব্যাংকসমূহের অন্যতম কাজ। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ, রিজার্ভ সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিধি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজও মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রিয় ব্যাংকসমূহ করে থাকে। এ ছাড়া দেশের সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিকসমূহের মাধ্যমে যত

---

১৭০. আবদুর রকিব ও শেখ মোহম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৭২. প্রাগুক্ত।

চেকের লেনদেন হয় সেগুলোর জটিলতা নিরসন করে দেনা-পাওনা নির্ধারণের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও কেন্দ্রিয় ব্যাংক কাজ করে।

(ঘ) ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যাংকিং : ইসলামি অর্থব্যবস্থার অধীনে যে সকল অর্থিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে ইসলামি ব্যাংকসমূহ তাদের মধ্যে অন্যতম। ইসলামি ব্যাংকসমূহের কার্যপদ্ধতির মূল হলো শারি'আহসম্মত অর্থব্যবস্থা।[১৭৩] এ ব্যাংকব্যবস্থা শারি'আহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে বিধায় সুদের লেনদেন করে না। এটি সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা যাতে আমানতের উপর সুদ প্রদান করা হয় না এবং ঋণের উপর সুদ গ্রহণও করা হয় না। বরং গ্রাহকের সাথে আংশীদারিত্বের ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থায় মুনাফা অর্জন বৈধ। কিন্তু শুধু মুনাফা অর্জনই এর মূল লক্ষ্য নয়। বরং উদ্বৃত্ত খাত ও ঘাটতি খাতের মাঝে ব্যবধান হ্রাস করে সামাজিক কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলামি ব্যাংকসমূহে শারি'আহ কাউন্সিল বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আবার সকল ইসলামি ব্যাংকের শারি'আহ কাউন্সিলকে তদারকি করার জন্য কেন্দ্রিয় শারি'আহ বোর্ড থাকে।[১৭৪] শারি'আহ বোর্ড ও শারি'আহ কাউন্সিল দেশ-বিদেশের শীর্ষ শারি'আহ বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইসলামি ব্যাংকসমূহের যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামি– সকল প্রকার অর্থব্যবস্থাতেই ব্যাংকিং কার্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকসমূহের উপরেও ব্যাংকের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদনের উপকরণের যোগান থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যাংকিং কার্যাবলির প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। তাই সকল অর্থব্যবস্থার অধীনে দেমের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম।

---

১৭৩. আবদুর রকিব ও শেখ মোহম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৭৪. Board of Editors, *Audit Assuarance and Ethics*(Manama : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2016 AD), p. 56

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিকাশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সামগ্রিক চিত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুদ ও মুনাফার পরিচিতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ ও মুনাফার অবস্থানগত পার্থক্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিকাশ

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকের সূচনা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ দেরি করেই হয়েছে। কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থির অবস্থায় ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। আর সারা বিশ্বে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সূচনাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সূচনা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর আলোচনা ফুটিয়ে তুলতে বহির্বিশ্বে ইসলামি ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। নিচে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

ইসলামি ব্যাংকিং আন্দোলনের সূত্রপাত : ইসলামি ব্যাংকিং আন্দোলন প্রথমেই বাস্তবরূপ লাভ করেনি। ইসলামি ব্যাংকিং আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র তত্ত্বীয় ধারণা ও মূলনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে কোন কোন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি ব্যাংকিং ধারণা তত্ত্ব থেকে বাস্তবে রূপ নেয়।[১]

পরাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একদিকে যেমন স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্রীব ছিল, তেমনি অন্যদিকে অর্থনীতি ও সামাজিক বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ইসলামি নীতিমালা প্রয়োগের ব্যাপারে অতি উৎসাহী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা নিয়ে যে সকল বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ তাত্ত্বিক চিন্তা শুরু করেন তাদের মধ্যে আল্লামা ইকবাল[২] ও হাসান আল বান্না[৩] অন্যতম। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান ও ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতি[৪] তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত এবং পাকিস্তানের বিভক্তির পর পাকিস্তানসহ অনেক মুসলিম দেশেই ইসলামি অর্থব্যবস্থার আলোকে দেশগুলোর অর্থনীতি ঢেলে সাজানোর গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়।

বিংশ শতকে যে সকল বিখ্যাত মনীষীর গবেষণা ইসলামি ব্যাংকিং-কে বাস্তবরূপ দিতে সহায়তা করেছে তাদের মধ্যে আল্লামা হিফযুর রহমান[৫] অন্যতম। এ শতাব্দীরই চল্লিশের দশকে বিখ্যাত

---

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৬২-৭০

২. 'আল্লামা ইকবালকে পাকিস্তানের আধ্যাত্মিক জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলিম কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ।' দ্র. আল্লামা ইকবাল, অনূ. ইবরাহীম খাঁ ও অন্যান্য, *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*(ঢাকা : আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭-১৩

৩. 'হাসান আল বান্না জাতিগতভাবে মিশরীয় ছিলেন। তিনি ধর্মীয় নবজাগরণের সংগঠক সংস্থা 'মুসলিম ব্রাদারহুড'-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জন্ম ও ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আততায়ীর হাতে নিহত হন।' দ্র. ড. ইউসুফ আল কারযাভি, অনূ. মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন, *ইমাম হাসান আল বান্না : নতুন যুগের নির্মাতা*(ঢাকা : প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৮৪

৪. 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব এমন এক মতাদর্শ যাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে দু'টি পৃথক জাতি ঘোষিত হয়। মুসলিম লীগ সভাপতি ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ এ তত্ত্বের প্রবর্তক।' দ্র. মোস্তফা ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *বাংলাদেশ স্টাডিজ*(ঢাকা : এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৪৪

৫. 'ভারতীয় সুন্নি মুসলিম পণ্ডিত ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী ছিলেন আল্লামা হিফযুর রহমান।' দ্র. G.N.S. Raghavan, *Aruna Asaf Ali : A Compassionate Radical*(India : National Book Trust, 1999 AD), p. 91

অর্থনীতিবিদ আনোয়ার ইকবাল কোরেশি[৬] ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি করে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের আন্দোলনকে আরো অগ্রসর করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার পক্ষে যে সকল উদ্যোগ গৃহীত হয় তা ছিল নিম্নরূপ :

(ক) পঞ্চাশের দশক : এ দশকের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলো ছিল নিম্নরূপ :[৭]

বছর	উদ্যোগসমূহ
১৯৫২	যৌথ মূলধন কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধনের মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং ধারণা উপস্থাপন।
১৯৫৫	ইসলামি ব্যাংকিং-এর কার্যক্রমে মুদারাবা পদ্ধতি সংযোজন করার ধারণা প্রদান।

(ক) ষাটের দশক : ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত হয় মূলত ষাটের দশকেই। বিভিন্ন দেশে ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠে। এ দশকেই ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ দশকের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো ছিল নিম্নরূপ :[৮]

বছর	উদ্যোগসমূহ
১৯৬১	মিশরে ইসলামি গবেষণার শীর্ষ কেন্দ্র 'কলেজ অব ইসলামিক রিসার্চ' প্রতিষ্ঠা।
১৯৬২	মালয়েশিয়ায় 'Pilgrims Savings Corporation'[৯] নামে সুদমুক্ত হজ্জ সঞ্চয়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ।
১৯৬৩	মিশরে মিটগামার[৮] নামক গ্রামে আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদবিহীন ব্যাংকের গোড়াপত্তন।
১৯৬৪	৪০ টিরও অধিক মুসলিম দেশের অংশগ্রহণে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার পক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৬৬	মুদারাবা নীতি প্রয়োগের ধারণার উদ্ভব।
১৯৬৮	অধ্যাপক ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকি[১০] মুদারাবা নীতির পক্ষে একটি দ্বি-স্তর মডেল তৈরি করেন। পরবর্তীতে মুশারাকা নীতি অনুসরণ করে তিনি দ্বি-স্তর মডেলটি সম্পসারণের চেষ্টা করেন।
১৯৬৯	মালয়েশিয়ায় 'তাবুং হাজি'[১১] নামে ইসলামি শারি'আহভিত্তিক সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।

৬. 'বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ। তিনি ভারতের হায়দারাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন।' দ্র. Anwar Iqbal Qureshi, *State Banks for India*(London : Macmillan and Co. Ltd., 1939 AD), p. vi

৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৮. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.), ৪৯

৯. 'Pilgrims Savings Corporation-একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা গ্রাহকদের সুদমুক্ত উপায়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয়ে উৎসাহিত করেছিল।' দ্র. Andrew W. Mullineux (ed.), *Handbook of International Banking*(UK : Edward Elgar Publishing, 2003 AD), p. 193

১০. 'ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রধান ছিলেন। ইসলামি অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় তার অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking : A Survey of Contemporary Literature*(UK : The Islamic Foundation, 1981 AD), p. 1

১১. 'তাবুং হাজি মালয়েশিয়ায় হজ্জযাত্রীদের উদ্দেশ্যে গঠিত তহবিল বোর্ড।' দ্র. https://www.tabunghaji.gov.my/, visited on 18.02.2022 AD

(খ) সত্তরের দশক : এ দশকে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা উন্নয়নের জন্য ইসলামি সম্মেলন সংস্থাভুক্ত দেশগুলো একজোট হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ দশকে ইসলামি ব্যাংকিং-এর ধারণা প্রসারের জন্য গৃহীত উদ্যোগগুলো ছিল নিম্নরূপ :[১২]

বছর	উদ্যোগসমূহ
১৯৭৪	'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)'[১৩] প্রতিষ্ঠার জন্য সনদ স্বাক্ষর।
১৯৭৫	ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের যাত্রা শুরু।
১৯৭৭	মিশর ও সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক'[১৪] প্রতিষ্ঠা। কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস'[১৫] প্রতিষ্ঠা।
মুসলিম দেশগুলো ছাড়াও বেশ কিছু ইউরোপিয়ান দেশ যেমন– ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যে সত্তর দশকেই ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।	

(ঘ) আশির দশক : আশির দশকে ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আবেগ দেশে দেশে আরো প্রসারিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ইসলামি ব্যাংকিং ধারণাকে কেন্দ্র করে কাজ অগ্রসর হতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায় আশির দশকের শুরুতেই যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্র মিলিয়ে ৫৭টি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা ১০০টিরও অধিক হয়ে দাঁড়ায়। এ দশকে যে সকল উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে তা ছিল নিম্নরূপ :[১৬]

বছর	উদ্যোগসমূহ
১৯৮০	ইসলামাবাদে মুসলিম দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৮১	মক্কা ও তায়েফে তৃতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিমদের 'নিজস্ব ও স্বতন্ত্র্য' ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব উপস্থাপন। ইরানের ইসলামি অর্থব্যবস্থার অনুসরণ করে সামগ্রিক ব্যাংকিং কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনয়ন। পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
১৯৮২	ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি আধুনিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ।
১৯৮৩	মালয়েশিয়ায় ও তুরস্কে ইসলামি ব্যাংকিং আইন পাশ।
১৯৮৫	পাকিস্তানে সুদভিত্তিক অর্থনীতি শতভাগ নিষিদ্ধকরণ। সুদানে শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা পুনর্গঠন।

১২. S. M. Ali Akkas and others (ed.), *Text Book on Islamic Banking*(Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, 2008 AD), p. 49

১৩. ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য দেশ ৫৭টি। এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। ইসলামি বিনিয়োগ ব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত।' দ্র. https://www.isdb.org/, visited on 12.12.2022 AD

১৪. 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট শাখা ৪৮টি। এর সদর দপ্তর সুদানের খার্তুমে অবস্থিত।' দ্র. https://www.fib-sd.com/en, visited on 10.12.2022 AD

১৫. 'সুদমুক্ত ব্যাংকিং প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জার্মানিতে ৬টি, সৌদি আরবে ১টি, বাহরাইনে ৯টি, মালয়েশিয়াতে ৯টি, তুরস্কে ৪৪৯টি ও কুয়েতে ৫৮টি শাখা পরিচালনা করছে।' দ্র. S. M. Ali Akkas and others (ed.), *Text Book on Islamic Banking*, ibid, p. 49

১৬. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*(ঢাকা : জেরিন পাবলিশার্স, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৪৩

(ঙ) নব্বই দশক : ইসলামি ব্যাংকিং নিয়ে গবেষণা ও পরিকল্পনার সফলরূপ নব্বই দশকে প্রকাশ পায়।[১৭] এ সময়ে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা দৃঢ়তা লাভ করে। বিশ্বব্যাপী ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিচালনাগত সাফল্যকে স্বীকৃতি জানায়। ফলে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করলে সমগ্র বিশ্বে ৩০০টিরও অধিক ইসলামি ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র মুসলিম দেশ নয়, অমুসলিম দেশেও ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও ইসলামি ব্যাংকের সফলতা বিশ্বনন্দিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিকাশ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস উপনিবেশবাদী অর্থনীতির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দীর্ঘ দুইশ বছরের ব্রিটিশ ঊপনিবেশবাদ, সুদের জন্য দালাল ও মহাজনদের অত্যাচার বাংলাদেশে সুদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের পিছনে দায়ি।[১৮] সুদের ব্যবসায়ীদের অমানবিক শোষণ এ দেশের সাধারণ মানুষের মনে সুদের প্রতি ঘৃণাবোধ তৈরি করেছে। তাই কালক্রমে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ফকির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েযি আন্দোলন ও কৃষকপ্রজা পার্টির আন্দোলনে সুদের ব্যবসায়ীদের উৎখাতের দাবি জোড়ালো হয়ে দেখা দিয়েছিল। শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই নয়, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও সুদের প্রতি সাধারণ জনগণের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বরাবরই অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। ফলে সুদবিহীন ব্যাংকের ধারণা বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হয়নি।

(ক) পাকিস্তান আমল : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশের বিভক্তির পর মূলত পাকিস্তানে সুদবিহীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার তৎপরতা শুরু হয়।[১৯] সে সময় পাকিস্তানে যতগুলো রাজনৈতিক দল সক্রিয় ছিল সবগুলোর মধ্যেই সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা পরিচালনার তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। সে সময়ে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো ছিল নিম্নরূপ :

বছর	ঘটনাবলি
১৯৪৭	দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম অধ্যুষিত স্বতন্ত্র অঞ্চল সৃষ্টির পর ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন।
১৯৪৮	শারি'আহসম্মত পন্থায় পাকিস্তানের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার ঘোষণা। তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক পাকিস্তানে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে সমর্থন।
১৯৪৯	তৎকালীন পাকিস্তানের গণপরিষদে শারি'আহভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব পাশ।
১৯৫১	তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৩১ জন শারি'আহ বিশেষজ্ঞের সম্মতিতে ইসলামি রীতিনীতির অনুসরণ করে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৭. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৬০

১৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৮

১৯. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

(খ) স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং : স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরও জোরদার হয়। এ সময়ে ক্রমান্বয়ে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয় তা ছিল নিম্নরূপ :[২০]

বছর	ঘটনাবলি
১৯৭৪	ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের সনদে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ শারি'আহসম্মত পন্থায় ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনায় সম্মত হয়।
১৯৭৬	বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং চিন্তাধারা বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য ঢাকায় 'ইসলামিক ইকোনমিকস রিচার্স ব্যুরো'[২১] প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
১৯৭৮	সেনেগালে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে।
১৯৭৯	বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ লাভ।
১৯৮০	বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গবেষণা পরিচালক জনাব এ এস এম ফখরুল আহসান কর্তৃক দুবাই ইসলামি ব্যাংক, মিশরের ইসলামি ব্যাংক, নাসের সোশ্যাল ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংক-এর কায়রো অফিস পরিদর্শন করা। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক কর্তৃক ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ। ঢাকায় ইসলামি ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরোর আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব নুরুল ইসলাম কর্তৃক ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান।
১৯৮১	বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুপারিশমূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন। জানুয়ারি মাসে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রদান। মার্চে সুদানে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের কেন্দ্রিয় ব্যাংকের গভর্নরদের সম্মেলনে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এপ্রিলে রাষ্ট্রায়ত্ত সকল ব্যাংকে পৃথক ইসলামি ব্যাংকিং কাউন্টার চালুর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করে। অক্টোবরে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রথম প্রশিক্ষণ শুরু।
১৯৮২	ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ।
	ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরের প্রাক্কালে বেসরকারি উদ্যোগে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণে সম্মতি প্রদান করেন।

২০. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি*(ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২৫

২১. '১৯৭৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান।' দ্র. https://www.ierb-bd.org, visited on 15.12.2022 AD

বছর	ঘটনাবলি
১৯৮৩	দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ অবশেষে মার্চের ৩০ তারিখ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লাইসেন্সের শর্তপূরণের জন্য প্রথমে অনানুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয়। ১১ আগস্ট পর্যন্ত শুধুমাত্র চলতি হিসাব খুলে টাকা জমা নিয়ে গ্রাহক সেবা প্রদান করা হতে থাকে। ১২ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পর মুদারা পদ্ধতিতেও ব্যাংকিং কায্যক্রম শুরু হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা এবং বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর পথচলার ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, বাংলাদেশে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুধুমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশ নয়, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী বহুকাল পূর্ব থেকেই চলে এসেছে। কিন্তু উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বরাবরই অস্থিরতায় পরিপূর্ণ ছিল। ধর্মীয় রেষারেষি, ক্ষমতার লড়াই, শাসনব্যবস্থার অদক্ষতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, ঊপনিবেশবাদ প্রভৃতি সকল কিছুর সমন্বয়ে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ রূপদান করা কখনো সম্ভব হয়ে উঠেনি। তারপরেও এ সংগ্রাম বর্তমানে স্থিতিশীলতা লাভ করেছে। বাংলাদেশের এমন কোন খাত নেই যা সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেনি। অদূর ভবিষ্যতে সংগ্রাম আরো সফলতা লাভ করবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এ প্রত্যাশা এখন আপামর জনসাধারণের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সামগ্রিক চিত্র

ইসলামি ব্যাংকিং বাংলাদেশের সর্বস্তরে একটি সুপরিচিত নাম। ব্যাংকিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, যে ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা রাখে না। শূন্য থেকে শুরু করে আজকের ইসলামি ব্যাংকিং-এর যে অবস্থান তৈরি হয়েছে তা সরকার, জনগণ, আন্তর্জাতিক সংস্থা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বাস্তব চিত্র। তবে বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র হলেও, সকল ধর্মের মানুষ এখানে সমধিকার নিয়ে বসবাস করে। তাই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সকল জনগণের পক্ষে শতভাগ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি। এ জন্য বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রচার ও প্রসারে ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। তবে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বর্তমান চিত্র পর্যালোচনা করলে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়।

(ক) বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচয় : বর্তমানে বাংলাদেশে ১০টি ইসলামি ব্যাংক তাদের মোট ১ হাজার ৬৭৯টি শাখা নিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তা ছাড়া ৯টি প্রচলিত ব্যাংক তাদের অধীনে ৪১টি ইসলামি ব্যাংকিং শাখা পরিচালনা করছে। সে সাথে ১৩টি প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক মোট ৪৩৪টি ইসলামি ব্যাংকিং বিভাগ পরিচালনা করছে।[২২]

(১) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রথম শারি'আহভিত্তিক ব্যাংক। শারি'আহভিত্তিক ব্যাংক হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এর কার্যক্রম প্রচলিত ব্যাংক থেকে পৃথক। যোগ্য ও অভিজ্ঞ শারি'আহ সুপারভাইজরি বোর্ডের অনুমোদনের মাধ্যমে এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে ইসলামি ব্যাংকিং-এর নিয়ম-কানুনের অনুসরণ নিশ্চিত করা হয়। বর্তমানে ব্যাংকটি তার প্রধান কার্যালয়, ১৬টি জোনাল অফিস, ৩৮৪টি শাখা, ২১৯টি উপশাখা, ২ হাজার ৬৭৬টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট, ৩টি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট ১৪ হাজার মানবসম্পদ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম, ইসলামি ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস এবং অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া, ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, ইসলামী এক্সচেঞ্জ সিঙ্গাপুর প্রাইভেট লিমিটেড প্রভৃতি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অধীনস্থ কোম্পানি হিসেবে কাজ করছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাদি নিম্নরূপ :[২৩] [মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	১৬,৩৫,৯৯২.৮০	মোট দায়	১৫,৭১,৪৩১.৫১
মোট আমানত	১,৩৮১,৯৭৯.৫৩	মোট বিনিয়োগ	১,১৯১,১৭৩.০০
মোট মালিকানা স্বত্ব	৬৪,৫৬১.২৯	নীট মুনাফা	৪,৬৩৯.২০
অনুমোদিত মূলধন	২০,০০০	পরিশোধিত মূলধন	১৬,১০০
শেয়ার প্রতি আয়	২.৮৮ টাকা		

২২. Editorial Board, *Quarterly Report on Development of Islamic Banking Segment in Bangladesh* (Dhaka : Islamic Banking Wing, Research Department, Bangladesh Bank, April-June, 2022 AD), p. 2

২৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২১(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৭৪-২৮০

(২) সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড : সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল) বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে ব্যাংকটি তার প্রধান কার্যালয়, ১৭২টি শাখা, ১১৩টি উপশাখা, ২৪৯টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এবং ৩ হাজার ১৯২ জন মানবসম্পদ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসআইবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড, এসআইবিএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাদি নিম্নরূপ :[২৪]

[মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	৪০৮,২০৩,১৫৫,৬৬৩	মোট দায়	৩৮৮,৯৬৫,৭৩১,৮২৮
মোট আমানত	৩৪১,৬৬১.০৬	মোট বিনিয়োগ	৩১২,৭৭৩.৮২
মোট মালিকানা স্বত্ব	১৯,২৩৭,৪২৩,৮৩৫	নীট মুনাফা	১,৬৫৯,৭০৫,৫৮০
অনুমোদিত মূলধন	৩০,০০০,০০০,০০০	পরিশোধিত মূলধন	৯,৮৪৯,০৮৮,৪৪০
শেয়ার প্রতি আয়	১.৬৯ টাকা		

(৩) আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড : আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'দ্যা ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড' নামে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আইসিবি ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ দ্যা ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের বেশিরভাগ শেয়ার কিনে নিলে ব্যাংকটির নতুন নামকরণ করা হয় আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। বর্তমানে ব্যাংকটির ৫২.৭৬ শতাংশ শেয়ার পরিচালনা পর্ষদের, ২২.৫১ শতাংশ শেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডারদের, ০.০৩ শতাংশ শেয়ার অনিবাসী বাংলাদেশিদের ও ২৪.৭০ শতাংশ শেয়ার জনসাধারণের। বর্তমানে ব্যাংকটি ৩৩টি শাখা, ৪৯৭ জন মানবসম্পদ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাদি নিম্নরূপ :[২৫]

[মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	১১,৫৮৩.০৩	মোট দায়	২৩,৬৩৭.১০
মোট আমানত	১২,৯২৫.৫৮	মোট বিনিয়োগ	১১০.৫৬
মোট মালিকানা স্বত্ব	১২,০৫৪.০৭	নীট মুনাফা	৩৯৪.৮১
অনুমোদিত মূলধন	১৫,০০০	পরিশোধিত মূলধন	৬,৬৪৭.০২
শেয়ার প্রতি আয়	০.৫৯টাকা		

(৪) আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড : আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এআইবিএল) বাংলাদেশে শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে ১৮ জুন, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে ব্যাংকটি ২০১টি শাখা, ৫৭১টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট, অফশোর ব্যাংকিং ও ৪ হাজার ২৪৭ জন মানবসম্পদ নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৪১.৮৭ শতাংশ

২৪. সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৪৪
২৫. আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৯৩

মালিকানা পরিচালনা পর্ষদের, ২৯.৮৭ শতাংশ মালিকানা প্রাতিষ্ঠানিক ও ২৮.২৫ শতাংশ মালিকানা জনসাধারণের আওতাভুক্ত। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাবলি নিম্নরূপ :[২৬] [মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	৪৫৩,৪৭৩.৩০	মোট দায়	৪২৯,৪৪৭.৮০
মোট আমানত	৩৫৩,২৮৭.৯৭	মোট বিনিয়োগ	৩৩৬,৮৯০.৭২
মোট মালিকানা স্বত্ব	২৪,০২৫.৫০	নীট মুনাফা	২,১২৬.৪৪
অনুমোদিত মূলধন	১৫,০০০	পরিশোধিত মূলধন	১০,৬৪৯.০২
শেয়ার প্রতি আয়	১.৯৬ টাকা		

(৫) এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড : এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৩ আগস্ট, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল বেঙ্গল এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক লিমিটেড। পরবর্তীতে ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে নাম পরিবর্তন করে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড নামধারণ করে। প্রচলিত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করলেও ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংকটি ইসলামি ব্যাংকে রুপান্তরিত হয়। বর্তমানে ব্যাংকটি প্রধান কার্যালয়, ৬টি জোনাল অফিস, ১৪০টি শাখা, ৫৬টি উপশাখা, ৩টি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট ও ৩ হাজার ২৩৫ জন মানবসম্পদ নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৩৭.৬৯ শতাংশ শেয়ার পরিচালনা পর্ষদ, ২৭.৬৪ শতাংশ শেয়ার দেশিয় কর্পোরেট বিনিয়োগকারী, ১.২৯ শতাংশ শেয়ার বিদেশি বিনিয়োগকারী, ০.২৮ শতাংশ শেয়ার অনিবাসী বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী ও ৩৩.১০ শতাংশ শেয়ার জনসাধারণের মালিকানাধীন রয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী এক্সিম ব্যাংক লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাবলি নিম্নরূপ :[২৭] [মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	৫৪১,৬৬৫.২৫	মোট দায়	৫১০,২২৪.৮২
মোট আমানত	৪২০,৬৭৩.৯৭	মোট বিনিয়োগ	৪২৯,০৩৩.৭২
মোট মালিকানাস্বত্ব	৩১,৪৪০.৪২	নীট মুনাফা	২,১৫৬.৬০
অনুমোদিত মূলধন	২০,০০০	পরিশোধিত মূলধন	১৪,৪৭৫.৫৭
শেয়ার প্রতি আয়	১.৪৯ টাকা		

(৬) শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড : শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১০ মে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসজেআইবিএল) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ব্যাংকটি প্রধান কার্যালয়, ১৩২টি শাখা, ১১৮টি এটিএম বুথ, ১টি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট ও ১০০টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট ও ২ হাজার ৭৪১ জন মানবসম্পদ কার্যক্রম পরিচালনা

২৬. আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৭৭
২৭. এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২০২

করছে। বর্তমানে ব্যাংকটির ৪৮.২২ শতাংশ শেয়ার পরিচালনা পর্ষদ, ১৪.২৪ শতাংশ শেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ০.১৫ শতাংশ শেয়ার বিদেশি বিনিয়োগকারী ও ৩৭.৩৯ শতাংশ শেয়ার জনসাধারণের মালিকানাধীন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাদি নিম্নরূপ :[২৮]

[মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	৩১৩,৭৩১.১০	মোট দায়	২৯৩,৯২৮.১১
মোট আমানত	২১৭,২৮৮.৯৯	মোট বিনিয়োগ	২১৬,৫৮৬.৫৮
মোট মালিকানা স্বত্ব	১৯,৮০২.৯৯	নীট মুনাফা	২,৫৮৫.২৪
অনুমোদিত মূলধন	১৫,০০০	পরিশোধিত মূলধন	১০,২৯০.৯৭
শেয়ার প্রতি আয়	২.৫১ টাকা		

(৭) ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এফএসআইবিএল) ২৯ আগস্ট ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১ জানুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংকটি শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে ব্যাংকটি ১৯৬টি শাখা, ১৩৬টি উপশাখা, ২০০টি এটিএম বুথ, ৭১টি এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট ও ৫ হাজার ৮৬ জন মানবসম্পদ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকটির ৩৩.৩৫ শতাংশ শেয়ার পরিচালনা পর্ষদ, ১.৮৭ শতাংশ শেয়ার বিদেশি বিনিয়োগকারী, ১৮.৩৪ শতাংশ শেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও ৪৬.৪৪ শতাংশ শেয়ার জনসাধারণের মালিকানাধীন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাদি নিম্নরূপ :[২৯]

[মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	৫৪৪,৭৯৫.১৯	মোট দায়	৫২৪,০৭৭.৯৩
মোট আমানত	৪৬৯,০৩৫.৩৮	মোট বিনিয়োগ	৪৫৫,৮৫০.১৪
মোট মালিকানা স্বত্ব	২০,৩৪৩.৭৬	নীট মুনাফা	৩,৩৬৫.২০
অনুমোদিত মূলধন	৩০,০০০	পরিশোধিত মূলধন	৯,৯৬১.৯৮
শেয়ার প্রতি আয়	৩.৩৬ টাকা		

(৮) ইউনিয়ন ব্যাংক : ইউনিয়ন ব্যাংক ৭ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ব্যাংকটি ১০৪টি শাখা, ৩১টি উপশাখা ও ১ হাজার ৭৯৪ জন মানবসম্পদ নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকটির ১০০ শতাংশ শেয়ার পরিচালনা পর্ষদের মালিকানাধীন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাদি নিম্নরূপ :[৩০]

---

২৮. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৪৪২

২৯. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩৩৮

৩০. Union Bank Limited, *Independent Auditor's Report and Audited Financial Statements*(Dhaka : Financial Administration Division, 2022 AD), p. 13

[মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	২৪২,৪১৮.২০	মোট দায়	২৩২,৪০৭.৬৭
মোট আমানত	২০০,২২৯.৭৯	মোট বিনিয়োগ	৮২৭.৩৬
মোট মালিকানা স্বত্ব	১০,০১০.৫৪	নীট মুনাফা	১৯৩,৮২২.২৮
অনুমোদিত মূলধন	১০,০০০	পরিশোধিত মূলধন	৫,৫৮৯.৩৪
শেয়ার প্রতি আয়	১.৫৬ টাকা		

(৯) স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড : স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড (এসবিএল) ১১ মে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংকটি শারি'আহভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে ব্যাংকটি ১৩৮টি শাখা, ৩টি জোনাল অফিস, ১২০টি এটিএম বুথ, ২৬টি এজেন্ট আউটলেট, ৩টি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট ও ২ হাজার ২২৫ জন মানবসম্পদ নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকটির ৩৮.৯২ শতাংশ শেয়ার পরিচালনা পর্ষদের, ৩.৬৩ শতাংশ শেয়ার আইসিবি ইফনিট ফান্ড, আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড ও আইসিবিতে বিনিয়োগকারীদের হিসাবের, ২২.০৮ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদেও এবং ৩৫.৩৭ শতাংশ জনসাধারণের মালিকানাধীন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাদি নিম্নরূপ :[৩১]

[মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	২২৫,০৮৫.০০	মোট দায়	২০৬,১৭৩.০৪
মোট আমানত	১৬৬,৪১৯.০০	মোট বিনিয়োগ	১৬৭,৫৩৮.০০
মোট মালিকানা স্বত্ব	১৭,২৫৩.০০	নীট মুনাফা	৭৯২.০০
অনুমোদিত মূলধন	১৫,০০০	পরিশোধিত মূলধন	১০,৩১১.০০
শেয়ার প্রতি আয়	০.৭৭ টাকা		

(১০) গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড : গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক (জিআইবিএল) ২৩ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে 'এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড' নামে প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংকটি শারি'আহভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে ব্যাংকটি প্রধান কার্যালয়, ৯০টি শাখা, ৮৪টি উপশাখা, ৯২টি এটিএম বুথ ও ২ হাজার ১২ জন মানবসম্পদ নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকটির ২৮.১৫ শতাংশ শেয়ার পরিচালনা পর্ষদের, ০.৯৪ শতাংশ শেয়ার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ও ৭০.৯১ শতাংশ শেয়ার জনসাধারণের মালিকানাধীন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের স্থিতি অনুযায়ী গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্যাদি নিম্নরূপ :[৩২]

[মিলিয়ন টাকা]

প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ	প্রাসঙ্গিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
মোট সম্পদ	১৩২,৮১০.৩০	মোট দায়	১২৫,০৪৯.৫৪
মোট আমানত	১১৭,৮০৫.৪৬	মোট বিনিয়োগ	১০৭,০৮৭.৯৭
মোট মালিকানা স্বত্ব	৭,৭৬০.৭৬	নীট মুনাফা	১,৩১৯.৩৮
অনুমোদিত মূলধন	২০,০০০	পরিশোধিত মূলধন	৫,১৫৪.১৯
শেয়ার প্রতি আয়	২.৫৬ টাকা		

৩১. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৬৯

৩২. গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩২২

প্রচলিত ব্যাংকে পরিচালিত ইসলামি ব্যাংকিং সেবা : ইসলামি ব্যাংকগুলো দেশের অর্থনীতিতে শারি'আহসম্মত উপায়ে অবদান রাখছে। কিন্তু শারি'আহসম্মত ব্যাংকিং প্রসারে প্রচলিত ব্যাংকগুলোও কোন অংশে পিছিয়ে নেই। ইসলামি ব্যাংকিং-এর সফলতা ও জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৯টি প্রচলিত ব্যাংক নিয়মিত ব্যাংকিং কার্যাবলির পাশাপাশি ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ ব্যাংকগুলো পৃথক ইসলামি ব্যাংকিং শাখা খুলে জনসাধারণকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। যে ৯টি প্রচলিত ব্যাংক পৃথক ইসলামি ব্যাংকিং শাখা খুলে সেবা প্রদান করছে সেগুলোর নাম, ইসলামি ব্যাংকিং শুরুর সাল ও ইসলামি ব্যাংকিং শাখার সংখ্যামূলক পরিচিতি নিচে ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক	ব্যাংকের নাম	ইসলামি ব্যাংকিং শুরুর সাল	ইসলামি ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা
১.	সিটি ব্যাংক লিমিটেড[৩৩]	২০০৩	১
২.	এবি ব্যাংক লিমিটেড[৩৪]	২০০৪	১
৩.	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড[৩৫]	২০০৩	২
৪.	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড[৩৬]	২০০৩	২৭
৫.	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড[৩৭]	২০০৮	৫
৬.	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড[৩৮]	২০২১	৫
৭.	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড[৩৯]	২০০৩	২
৮.	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটডে[৪০]	২০০৩	১
৯.	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড[৪১]	২০২১	১

প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো : ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা সহজ করে তোলার লক্ষ্যে তাদের কিছু কিছু শাখায় প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যাবলির পাশাপাশি ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো চালু করে একই সাথে প্রচলিত ও শারি'আহভিত্তিক দু'ধরনেরই সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। তার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি দু'ধরনেরই ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অর্থাৎ, প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রম মূল ব্যবসা হলেও ইসলামি ব্যাংকিং-কে পরিহার করে প্রচলিত ব্যাংকগুলোও ব্যাংকিং সেবা প্রদান কল্পনাও করতে পারছে না। যে ১৪টি প্রচলিত ব্যাংক পৃথক ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো খুলে জনসাধারণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে সেগুলোর নাম, ইসলামি ব্যাংকিং শুরুর সাল ও ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডোর সংখ্যামূলক পরিচিতি নিচে ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো :

---

৩৩. সিটি ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৮৮
৩৪. এবি ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১১৯
৩৫. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৪৯
৩৬. প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২২৫
৩৭. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২০৪
৩৮. সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৬৩
৩৯. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৪১০
৪০. Bank Alfalah, *Auditor's Report and Financials Statement 2021*(Dhaka : Public Relations Department, 2022 AD), p. 9
৪১. এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৩৮

ক্রমিক	ব্যাংকের নাম	ইসলামি ব্যাংকিং শুরুর সাল	ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডোর সংখ্যা
১.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড[৪২]	২০১০	৫৮
২.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	অনুমোদনপ্রাপ্ত	কার্যক্রম চালু হয়নি
৩.	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড[৪৩]	২০১০	৪৮
৪.	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড[৪৪]	২০১০	১৭
৫.	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড[৪৫]	২০০৮	১৫
৬.	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড[৪৬]	২০০৮	৫
৭.	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড[৪৭]	২০০৩	১
৮.	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড[৪৮]	২০২০	৪৫
৯.	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড[৪৯]	২০২০	২
১০.	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড[৫০]	২০২০	২৫৯
১১.	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড[৫১]	২০২০	২
১২.	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড[৫২]	২০২০	১১
১৩.	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড[৫৩]	২০২১	৩
১৪.	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড[৫৪]	২০২১	১৫

(খ) বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক অবস্থা : জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত বিগত ৬টি ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামি ব্যাংকগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কিছু আর্থিক তথ্যাদি নিচের ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো :[৫৫]

[বিলিয়ন টাকা]

বিবরণ	জানুয়ারি-মার্চ'২১	এপ্রিল-জুন'২১	জুলাই-সেপ্টেম্বর'২১	অক্টোবর-ডিসেম্বর'২১	জানুয়ারি-মার্চ'২২	এপ্রিল-জুন'২২
মোট আমানত	৩,৫৭৭.৯২	৩,৬৮১.৬৩	৩,৭৬৫.৭৯	৩,৯৩১.১১	৩,৯৯৬.৭৯	৪,১২৩.৪১
মোট বিনিয়োগ	৩,২২৩.৯৮	৩,২৭৯.৪৩	৩,৩৬৮.২০	৩,৫৩৪.৪৮	৩,৬০৬.৪৯	৩,৮১৮.২৯
বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত	০.৯০	০.৮৯	০.৮৯	০.৯০	০.৯০	০.৯৩
তারল্য (+/-)	৩০৪.০৯	৩৬৩.৬৫	৩৫১.৮৬	৩৩৬.২৫	২৯৯.৯৯	২৬০.০৯
মোট রেমিট্যান্স	১৫৭.৩৪	২০০.৩৯	১৯৭.৯২	২০৩.৬৮	১৩৪.৭	১৫৭.১৭

৪২. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, *আর্থিক বিবরণী ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৪
৪৩. অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৪৯
৪৪. পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৪৫
৪৫. ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২২০
৪৬. ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩১৯
৪৭. Standard Chartered Bank, Bangladesh, *Financial Statement 2021*(Dhaka : Financial Administration Division, 2022 AD), p. 1
৪৮. মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩৪৯
৪৯. মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৬১
৫০. এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৯০
৫১. ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৩৯
৫২. ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২০২
৫৩. মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০২১(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১২৩
৫৪. মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২৪৬
৫৫. Editorial Board, *Quarterly Report on Development of Islamic Banking Segment in Bangladesh*, ibid, p. 1

নিম্ন সংবিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত এবং উচ্চ ঋণ-আমানতের অনুপাতের কারণে ইসলামি ব্যাংকিং সেক্টর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করবে। ইসলামি ব্যাংকিং সেক্টর সমৃদ্ধশালী হওয়ার কারণেই দেশের ব্যংকিং খাতের আমানত এবং বিনিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরিউক্ত তালিকায় বিগত ৬টি ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামি ব্যাংকগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কিছু আর্থিক তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত তালিকা পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে :

মোট আমানত : জানুয়ারি-মার্চ'২১ ত্রমাসিক অর্থমেয়াদে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং খাতে মোট আমানত ছিল ৩,৫৭৭.৯২ বিলিয়ন টাকা যা পরবর্তী ৫টি ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে ক্রমান্বয়ে ২.৯০, ২.২৯, ৪.৩৯, ১.৬৭ ও ৩.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩,৬৮১.৬৩, ৩,৭৬৫.৭৯, ৩,৯৩১.১১, ৩,৯৯৬.৭৯ ও ৪,১২৩.৪১ বিলিয়ন টাকায় পর্যন্ত পৌঁছেছে। অর্থাৎ, জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ থেকে এপ্রিল-জুন ২০২২ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদ পর্যন্ত প্রতি বছরই আমানতের পরিমাণ হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী হলেও পরবর্তী ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে তা পুনরায় ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।

মোট বিনিয়োগ : জানুয়ারি-মার্চ'২১ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং খাতে মোট বিনিয়োগ ছিল ৩,২২৩.৯৮ বিলিয়ন টাকা যা পরবর্তী ৫টি ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে (এপ্রিল-জুন'২১) ১.৭২ শতাংশ, (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২১) ২.৭১ শতাংশ, (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২১) ৪.৯৪ শতাংশ, (জানুয়ারি-মার্চ'২২) ২.০৪ শতাংশ, ও (এপ্রিল- জুন'২২) ৫.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩,২৭৯.৪৩, ৩,৩৬৮.২০, ৩,৫৩৪.৪৮, ৩,৬০৬.৪৯ ও ৩,৮১৮.২৯ বিলিয়ন টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। জানুয়ারি-মার্চ'২২ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার কিছুটা নিম্নমুখী হলেও পরবর্তী অর্থমেয়াদে তা আবার ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রবণতা অব্যাহত থেকেছে।

বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত : জানুয়ারি-মার্চ'২১ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে ইসলামি ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত ছিল ০.৯০ যা পরবর্তী ৫টি ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদের (এপ্রিল-জুন'২১) ০.৮৯, (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২১) ০.৮৯, (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২১) ০.৯০, (জানুয়ারি-মার্চ'২২) ০.৯০ ও (এপ্রিল-জুন'২২) ০.৯৩-তে গিয়ে পৌঁছেছে। এপ্রিল-জুন'২১ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর'২১ বিনিয়োগ আমানত অনুপাত নিম্নমুখী হলেও পরবর্তী দুইটি ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে এ অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতিরিক্ত তারল্য : অতিরিক্ত তারল্য মুনাফার হার এবং বিনিময় হারের ক্ষেত্রে দোদুল্যমান অবস্থা তৈরি করে। তাই তারল্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি চ্যালেঞ্জ। জানুয়ারি-মার্চ'২১ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে অতিরিক্ত তারল্য ছিল ৩০৪.০৯ বিলিয়ন টাকা। পরবর্তী এপ্রিল-জুন'২১ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ ১৯.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৩.৬৫ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছায়। পরবর্তী ৪টি ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে ৩.২৪ শতাংশ (জুলাই-সেপ্টেম্বর'২১), ৪.৪৪ শতাংশ (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২১), ৯.৯০ শতাংশ (জানুয়ারি-মার্চ'২২) ও ১৩.৩০ শতাংশ (এপ্রিল- জুন'২২) হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৩৫১.৮৬, ৩৩৬.২৫, ২৯৯.৯৯ এবং ২৬০.০৯ বিলিয়ন টাকায় গিয়ে পৌঁছায়। অর্থাৎ, এপ্রিল-জুন'২১ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে ইসলামি ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ পূর্বের ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদের তুলনায় বেশ অনেকখানি বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী ৪টি ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে তা হ্রাস পেয়ে নিয়ন্ত্রণের আওতায় এসেছে।

মোট রেমিট্যান্স : জানুয়ারি-মার্চ'২১ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে রেমিট্যান্স সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৫৭.৩৪ বিলিয়ন টাকা। কিন্তু এপ্রিল-জুন'২১ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে রেমিট্যান্স সংগ্রহের পরিমাণ ২৭.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০.৩৯ বিলিয়ন টাকা হয়। জুলাই-সেপ্টেম্বর'২১ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে এ পরিমাণ ১.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৯৭.৯২ বিলিয়ন টাকা হয়। অক্টোবর-ডিসেম্বর'২১ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে এ পরিমাণ ২.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩.৬৮ বিলিয়ন টাকা হয়। জানুয়ারি-মার্চ'২২ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে রেমিট্যান্স সংগ্রহের পরিমাণ পুনরায় ৩৩.৮৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৩৪.৭০ বিলিয়ন টাকা হয়। এপ্রিল-জুন'২২ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে এ পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৭.১৭ বিলিয়ন টাকায় এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রেমিট্যান্স বিষয়ক তথাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রেমিট্যান্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল না।

(গ) সমগ্র ব্যাংকিং খাতের তুলনায় ইসলামি ব্যাংকিং-এর অবস্থান :

নির্দেশক	সমগ্র ব্যাংকিং খাত	ইসলামি ব্যাংকিং খাত	ইসলামি ব্যাংকিং খাতের শেয়ার (এপ্রিল-জুন'২২)	ইসলামি ব্যাংকিং খাতের শেয়ার (জানুয়ারি-মার্চ'২২
	(বিলিয়ন টাকা)		শতকরা হার (%)	
মোট আমানত	১৫,৭৪৩.৭৮	৪,১২৩.৪১	২৬.১৯	২৮.২১
মোট বিনিয়োগ	১৩,৩৮৭.২৬	৩,৮১৮.২৯	২৮.৫২	২৭.৭৮
মোট রেমিট্যান্স	৪৯৭.৮৩	১৫৭.১৭	৩১.৫৭	৩০.৯৬
মোট অতিরিক্ত তারল্য	১৮৯২.৬৮	২৬০.০৯	১৩.৭৪	১৪.১৯
মোট কৃষি বিনিয়োগ	৭৩.৩০	১৭.১৮	২৩.৪৪	২৭.১৩

উপরিউক্ত সারণী পর্যালোচনা করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :[৫৬]

১. এপ্রিল-জুন'২২ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে দেশের সার্বিক ব্যাংকিং খাতের আমানত সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৫,৭৪৩.৭৮ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ৪,১২৩.৪১ বিলিয়ন ছিল ইসলামি ব্যাংকিং খাতের আমানত। অর্থাৎ, মোট আমানতের ২৬.১৯ শতাংশই ইসলামি ব্যাংকিং খাতের যা বিগত ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদের কাছাকাছি পরিমাণ।

২. একই সময়ে দেশের সার্বিক ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগ ১৩,৩৮৭.২৬ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ৩,৮১৮.২৯ বিলিয়ন টাকা ইসলামি ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগের পরিমাণ। অর্থাৎ, মোট বিনিয়োগের ২৮.০২ শতাংশই ইসলামি ব্যাংকিং খাতের যা বিগত ত্রৈমাসিক মেয়াদের বিনিয়োগের হারের (২৭.৭৮ শতাংশ) তুলনায় অধিক।

৩. এপ্রিল-জুন'২২ ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদে দেশের সার্বিক ব্যাংকিং খাতে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৪৯৭.৮৩ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ১৫৭.১৭ বিলিয়ন টাকা ইসলামি ব্যাংকিং খাতের সংগৃহীত রেমিট্যান্স। অর্থাৎ, মোট রেমিট্যান্সের ৩১.৫৭ শতাংশই ইসলামি ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে ও তা বিগত ত্রৈমাসিক অর্থমেয়াদের রেমিট্যান্সের তুলনায় অধিক।

---

৫৬. Editorial Board, *Quarterly Report on Development of Islamic Banking Segment in Bangladesh*, ibid, p. 5

৪. এ সময়েই মোট ব্যাংকিং খাতের অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ ছিল ১,৮৯২.৬৮ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ২৬০.০৯ বিলিয়ন টাকা ইসলামি ব্যাংকিং খাতের। অর্থাৎ, মোট অতিরিক্ত তারল্যের ১৩.৭৪ শতাংশ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের যা বিগত ত্রৈমাসিক মেয়াদের অতিরিক্ত তারল্যের (১৪.১৯ শতাংশ) হারের চেয়ে কিছুটা কম।

৫. কৃষিখাতে দেশের মোট ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগ ৭৩.৩০ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ১৭.১৮ বিলিয়ন টাকা ইসলামি ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগ। অর্থাৎ, মোট কৃষি বিনিয়োগের ২৩.৪৪ শতাংশই ইসলামি ব্যাংকিং খাতের অংশ যা বিগত বছরের কৃষিখাতে বিনিয়োগের (২৭.১৩ শতাংশ) কাছাকাছি পরিমাণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৩৯ বছরের ব্যবধানে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের জনসাধারণের ব্যবহারিক জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে উঠছে। তাই তো দেখা যায় ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ইসলামি ব্যাংকিং-এর সুফল গ্রহণের জন্য এ ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে অগ্রসর হচ্ছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুদ ও মুনাফার পরিচিতি

সুদ এবং মুনাফাকে আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও দু'টো বিষয়ে অনেক পার্থক্য বিরাজমান। সুদ এবং মুনাফার পার্থক্য বুঝতে হলে এদের পরিচয় এবং অর্থব্যবস্থায় এদের প্রয়োগ এবং কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে। প্রচলিত অর্থনীতিতে সুদকে মুনাফার সমতুল্য হিসেবে গণ্য করা হয়। সেজন্য ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যখন সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনার কথা বলা হয় তখন সাধারণ মানুষের কাছে সুদ আর মুনাফার মাঝে তফাৎ বোধগম্য হয় না। সেজন্য সুদ এবং মুনাফার মৌলিক ধারণা নিয়ে বাস্তবধর্মী আলোচনা সময়ের দাবি।

সুদের পরিচয় : সাধারণভাবে বলা যায়, প্রদেয় ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত যা পাওয়ার শর্ত করা হয় তাই সুদ। যারা সুদকে মুনাফার সমতুল্য বিবেচনা করেন তারা মূলত ঋণ হিসেবে প্রদেয় অর্থকেই পণ্যের মত বিবেচনা করেন। তাই অর্থ আদানপ্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত লাভকেও তারা মুনাফা হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত আদানপ্রদান সবসময়েই সুদ। আর টাকাকে পণ্যের সমতুল্য বিবেচনা করা তাকে ব্যবসা হিসেবে গণ্য করাও সুদের ব্যবসা।[৫৭] এ প্রসঙ্গে যে কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা প্রদান করা যায় তা নিম্নরূপ :

- অধ্যাপক মার্শাল এর মতে, 'সুদ হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য প্রতীক্ষার পুরস্কার।'[৫৮]
- অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইনসের মতে, 'নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ অর্থ হাতছাড়া করার পারিতোষিক হলো সুদ।'[৫৯]
- অধ্যাপক রবার্টসন বলেন, 'ঋণযোগ্য তহবিল ব্যবহারের মূল্যই হলো সুদ।'[৬০]

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদানের বিনিময়ে তার মূল্য হিসেবে যে অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তি ঘটে তাকেই সুদ বলে।

সুদের প্রতিশব্দ হচ্ছে রিবা (ربٰو)। আরবি রিবা শব্দকে উর্দু ও ফারসিতে সুদ বলে। বাংলা ভাষায় সুদ শব্দটি রিবার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুদকে ব্যবহারিক অর্থে বাংলায় কুসিদও বলা হয়। ইংরেজিতে যাকে Interest বা Usury বলা হয় রিবার অর্থও ঠিক তাই। পবিত্র কুরআনেও রিবা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। Interest শব্দের উৎপত্তি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন শব্দ Interesse থেকে। এর অর্থ ঋণ দিয়ে আসলের উপর বেশি গ্রহণ করা। Usury ল্যাটিন শব্দ; Usura থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।[৬১] Usura অর্থ হচ্ছে প্রদত্ত ঋণ থেকে অর্জিত উপভোগ; ক্যানন ল'তে এর মানে হচ্ছে অর্থ ধার দিয়ে তার বিনিময়ে আসল পাওনার উপর অতিরিক্ত গ্রহণ করা।[৬২] অর্থাৎ ঋণ দিয়ে আসলের

---

৫৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : আল-বারাকা লাইব্রেরী, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৮১

৫৮. 'The payment made by a borrower for the use of a loan for, say, a year is expressed as the ratio which that payment bears to the loan, and is called Interest.' see. Professor Alfred Marshall, *Principales of Economics*(London : Macmillan & Co., ed. 8, 1930 AD), p. 588

৫৯. 'Interest is the reward of parting with liquidity for a specified period'. see. John Maynard Keynes, *General Theory of Employment, Interest, and Money*(Cambridge : Palgrave Macmillan, 1936 AD), p. 50

৬০. 'Interest is the cost of using loanable funds.' see. D. H. Robertson, Industrial Fluctuation and the Natural Rate of Interest, *The Economic Journal*(UK : Oxford University Press, vol. 44, No. 176, Dec., 1934 AD), pp. 650-656

৬১. ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশি, *ইসলাম এন্ড দি থিওরি অব ইন্টারেস্ট*(লাহোর : আশরাফ পাবলিকেশন্স, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২

৬২ . H. Harvey Cohn, *Usury : Encyclopedia Judaica*(Jerusalem : Keter Publishing, 2000 AD), p. 17; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কোরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

বেশি নেয়া। Encyclopedia of Religions and Ethics-এ বলা হয়েছে Usury ও Interest শব্দ দুটো এক ও অভিন্ন অর্থে অতীতে ব্যবহৃত হত।[৬৩]

কুরআন ও সুন্নাহ'য় ব্যবহৃত রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি (Growth), পরিবৃদ্ধি, পরিবর্ধন, পরিবর্ধক, সম্প্রসারণ (Expansion), স্ফীতি, আধিক্য, উদ্বৃত্ত (Surplus), বৃদ্ধি (Increase), বিকাশ, অতিরিক্ত (Excess) বা বেশি হওয়া (Additional), মূল থেকে বেড়ে যাওয়া, উঁচু হওয়া, ফুলে উঠা, লাভ (gain), বহুগুণ হওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া, পাওনার চেয়ে বেশি নেয়া, বিকাশ ঘটা ইত্যাদি।[৬৪] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. লিখেছেন, কুরআন মাজিদে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূলে আছে আরবি ভাষায় (ر ب و) তিনটি হরফ। এর অর্থের মধ্যে বেশি, বৃদ্ধি, বিকাশ; চড়া প্রভৃতি ভাব নিহিত।[৬৫] সুপরিচিত আরবি অভিধান লিসানুল আরব রিবার শাব্দিক অর্থ লিখেছে, 'বৃদ্ধি, বাড়তি, অতিরিক্ত, সম্প্রসারণ বা প্রবৃদ্ধি।[৬৬] আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি লিখেছেন, রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি, বেশি, স্ফীত, ক্রমশ: বড় হওয়া, কয়েকগুণ বেশি হওয়া, আসলের বাড়তি ও বৃদ্ধি হওয়া, বিনিময় ছাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি।[৬৭]

তাফসিরকার ও ফিকাহবিদগণ রিবার অর্থ করেছেন অতিরিক্ত, বৃদ্ধি (excess), বিনিময়হীন বৃদ্ধি (excess without counter value), অপরদিকে বৃদ্ধি ছাড়াই একদিকে বৃদ্ধি ইত্যাদি। বিশিষ্ট কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেছেন, প্রতিমূল্য (counter value) নেই এমন প্রতিটি বৃদ্ধিই হচ্ছে রিবা।[৬৮] ড. এম. উমর চাপরা লিখেছেন, 'রিবার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি (Increase), অতিরিক্ত (Addition), সম্প্রসারণ (Expansion) বা প্রবৃদ্ধি (Growth)।[৬৯] আল্লামা মুহাম্মাদ আসাদের মতে, 'ভাষাগত দিক থেকে রিবা শব্দ দ্বারা কোন জিনিসের মূল আয়তন বা পরিমাপের উপরে বেশি হওয়া (Addition) বা বৃদ্ধিকে (Increase) বুঝায়।[৭০] ড. এম.এ. মান্নান লিখেছেন, রিবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া বা প্রবৃদ্ধি।[৭১] কিন্তু কুরআনে যেকোনো প্রবৃদ্ধিকে রিবা বলা হয়নি। এর দ্বারা সুনির্দিষ্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে। রিবা শব্দটি আল (ال) প্রত্যয়যোগে এমন এক লেনদেনকে বুঝানো হয়েছে যা কুরআন নাযিলের সময় আরব ও অন্যান্য জাতির কাছে সুপরিচিত

---

৬৩. Board of Editors, *Riba, Usury and Interest-Historical and Quranic Concept*(Karachi : The International Association of Islamic Bank, Journal of Islamic Banking and Finance, Oct-Dec, 1993 AD), p. 44

৬৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনূ. আবদুল মান্নন তালিব ও আব্বাস আলী খান, *সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*(ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৮৪

৬৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৬৬. ইবন মানযুর, লিসানুল আরব(কুয়েত : দারুন নাওয়াদির, ২০১০ খ্রি.), খ. ১৯, পৃ. ১৭; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯

৬৭. আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি, *আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন*(রিয়াদ : মাকতাবাতু নাজ্জার মোস্তফা আল-বায, তা.বি.), পৃ. ২৪৮; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৬৮. আল সারাখসি, *আল মাবসুত*(বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.), খ. ১২, পৃ. ১০৯

৬৯. ড. এম. উমর চাপরা, *Towards a Just Monetary System*(Leicester : The Islamic Foundationb, 1995 AD), p. 56; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৭০. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৭১. ড. এম.এ. মান্নান, অনূ. আলী আহমেদ রুশদী, *ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*(ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ খ্রি.), ৯৭

ছিল। তাই কুরআনে রিবা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে 'আল' প্রত্যয় ব্যবহার করে। এ লেনদেন করা হত দুভাবে– (১) ঋণের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এ শর্তে, বিদ্যমান অথবা বকেয়া পড়েছে এমন ঋণ পরিপক্কতার নতুন সময় নির্ধারণ বা ঋণ ফেরত বিলম্বিতকরণ; (২) কোন ঋণ নির্ধারিত সময়ের পর বৃদ্ধিসহ ফেরত প্রদান।[৭২]

অন্য কথায় ইসলামে সকল বৃদ্ধিকেই 'রিবা' বলা হয়নি। এক বিশেষ অর্থে ইসলামে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামে ঐ বৃদ্ধিকে 'রিবা ' বলা হয় যা প্রদত্ত ঋণের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু আকারে বা কোন সুবিধা ধার্য করে আদায় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বা ঋণের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে বা নির্ধারিত না থাকলেও প্রদত্ত ঋণের অধিক অর্থ বা সুবিধা আদায় করলে এবং সামগ্রীর ক্ষেত্রে সমজাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ নেয়া হলে অর্থ বা পণ্যের ঐ অতিরিক্ত অংশকে রিবা (ربو) বা সুদ (سود) বলা হয়। সুদের ফলে ঋণের আসল পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সময়ের অনুপাতে আসল বৃদ্ধির পরিমাণ বা হার নির্ধারিত হয়। সুতরাং রিবা, সুদ, ইন্টারেস্ট, ইউজারি ইত্যাদি সকল শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন। আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। সুদ মানবতার জন্য এক চরম অভিশাপ, অর্থনৈতিক শোষণের এক জঘন্য হাতিয়ার। সুদি ব্যবস্থা অর্থনীতিকে ভারসাম্যহীন করে। মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এ জন্যই সকল মানুষের স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামিন সুদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছেন। সকল নবীরাসুলই সুদি ব্যবস্থার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

সুদের পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি পরিভাষায় সুদকে রিবা বলা হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 'রিবা'র কোন সংজ্ঞা দেয়নি। এটা শুধু এ কারণে যে, কুরআন যাদের সম্বোধন করে নাযিল হয়েছে তারা রিবা বা সুদের সাথে ছিল অতি পরিচিত। সুদ কি তা তারা সকলেই জানত। তাদের কাছে সুদের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল। রিবা পরিভাষাটি আরববাসীর কাছে মোটেই অপরিচিত ছিল না। তাদের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদের প্রচলন ছিল এবং তারা সর্বদাই এ শব্দ ব্যবহার করত। তদানীন্তন আরববাসীদের মধ্যে রিবা পরিভাষা নিয়ে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি ছিল না। শুধু আরববাসী নয়; পূর্ববর্তী সকল সমাজেই মানুষ তাদের আর্থিক লেনদেনে রিবা গ্রহণ করত এবং প্রদান করত। রিবার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কারও মধ্যেই কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি ছিল না।[৭৩]

পারিভাষিক অর্থে আরবরা রিবা বলত এমন বর্ধিত অংকের আদায়কে, যা ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে একটি ধার্যকৃত হারে মূল অর্থের বা পুঁজির অতিরিক্ত হিসেবে আদায় করত। প্রচলিত অর্থনীতিতে সুদকে বলা হয়েছে 'পুঁজির মূল্য'। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবদানের জন্য পুঁজিকে দেয় পারিতোষিক। রিবার পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ঋণ দিয়ে আসলের উপর বেশি নেওয়া। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পরে যদি ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উপরে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় তবে আদায়কৃত ঐ অতিরিক্ত অর্থকে সুদ বলা হয়।

---

৭২. ড. মনজের কাহফ, অনূ. মাসুম বিল্লাহ, *মাকাসিদে শরী'আহ : আধুনিক ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় প্রয়োগ*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ইসলামী ব্যাংকিং বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.), পৃ, ৯

৭৩. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকী ওসমানী, অনূ. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*(ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি.), পৃ, ৬৩

সুদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ঋণ দেয়া মূল অর্থ যা-ই উৎপন্ন করুক না কেন তার বিচার না করে ঐ ঋণের উপর পূর্ব নির্ধারিত পরিশোধিতব্য অর্থই হল সুদ। অন্যকথায় ঋণের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু লেনদেন করা হলে সে অতিরিক্তকে বলা হয় রিবা বা সুদ।

রিবার সংজ্ঞায় 'আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (স.) বলেছেন, كل قرض جر منفعة فهو ربا 'যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তাই রিবা (সুদ)।[৭৪]

আলি রা. আরও বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী সা. বলেছেন 'লাভ (অতিরিক্ত) বহনকারী প্রত্যেক ঋণই রিবা। হারিস ইবন আবি উসামাহ তার মুসনাদে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৭৫]

উসামা ইবন যায়িদ রা. থেকে বর্ণিত মহানবী সা. বলেছেন, 'প্রতীক্ষাতেই রিবা রয়েছে ...।[৭৬] সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ আদান-প্রদান করলে তা সমান সমান ও হাতে হাতে হতে হবে। অর্থাৎ নগদ হতে হবে। বেশ-কম করলে, তা সুদি লেনদেন বলে গণ্য হবে। এতে দাতা-গ্রহীতা সমান অপরাধী হবে।[৭৭]

'আল্লামা ইবনুল আরাবির মতে, 'রিবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি। কুরআন মাজিদে ঐ বৃদ্ধিকে রিবা বলা হয়েছে; যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই।[৭৮] প্রখ্যাত তাফসিরকারক ইমাম ফখরুদ্দিন আল রাযির মতে, 'জাহিলেয়াতের যুগে আরববাসী সকলেরই রিবা সম্বন্ধে জানা ছিল এবং তাদের মধ্যে এটা বহুল প্রচলিত ছিল। সে যুগেও তারা প্রথাসিদ্ধভাবে ঋণ দিত এবং শর্ত অনুসারে তার উপর মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত; কিন্তু আসলের পরিমাণ থাকত অপরিবর্তিত। যখন ঋণের মেয়াদ শেষ হত এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হত তখন সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেয়া হত।[৭৯]

'আল্লামা আবু বাকর আল যাসসাস-এর মতে, 'একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদেয় ঋণের পূর্বশর্ত অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আসলের অতিরিক্ত যে অর্থ আদায় করা হয় তা-ই হচ্ছে সুদ।'[৮০]

'আল মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা' গ্রন্থে সুদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'শারি'আহ সম্মত বিনিময় ব্যতীত চুক্তির শর্তানুযায়ী যে অতিরিক্ত মাল আদায় করা হয় তাকে সুদ বলে।'[৮১] হানাফি মাযহাবে রিবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'রিবা হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিমূল্যের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত যার কোন প্রতিমূল্য নেই।'[৮২] হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ফকিহ ইমাম সারাখসি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'শারি'আহতে রিবা হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ে দু'টি প্রতিমূল্যের কোন একটার উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত যার কোন বিনিময় মূল্য নেই।'[৮৩]

---

৭৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭০

৭৫. জালাল উদ্দিন আল সুয়ুতি, *জামে আল সগির*(মদিনা মুনাওয়ারা : শারিকাতু আলফা, ২০০৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৪

৭৬. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯৯-১০০; হাদিস নং ৩৯৪৩

৭৭. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০; হাদিস নং ৩৯৪৩

৭৮. দ্র. আল্লামা ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুরআন*(কায়রো : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৪২ الربا في اللغة الزيادة والمراد في الآية كل زيادة لا يقابلها عوض

৭৯. ফখরুদ্দিন আল-রাযি, *তাফসির কাবির*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৫১

৮০. আল্লামা আবুবকর আল-যাসসাস, *আহকামুল কুরআন*(ইস্তাম্বুল : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৩৫ হি.), পৃ. ৪৬৯

৮১. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৮২. আল সারাখসি, *আল মাবসুত*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১০০

৮৩. প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১০৯

'আল্লামা ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানির মতে, 'রিবার পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে একদিক দিয়ে বৃদ্ধি পাওয়া; অন্যদিক দিয়ে নয়। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণের শর্ত হিসেবে বা ফেরতের মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময়ে মূল পরিমাণের অতিরিক্ত যা-ই গ্রহণ করা হয় তাই রিবা।'[৮৪] সানাউল্লাহ পানপথির মতে, প্রদত্ত ঋণের মূলের চেয়ে বেশি গ্রহণ করাই রিবা।[৮৫] সাইয়িদ আমিমুল ইহসানের মতে, চুক্তিবদ্ধ দু'পক্ষের যে কোন এক পক্ষ কর্তৃক পারস্পরিক লেনদেনে শারি'আহ সম্মত বিনিময় ব্যতীত শর্ত মুতাবিক যে অতিরিক্ত আদায় করা হয় তাকে সুদ বলা হয়।[৮৬]

ফাতওয়ায়ে আলমগিরিতে সুদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'ইসলামি শারি'আহতে ঐ মালকে সুদ বলা হয় যা মালের পরিবর্তে মালের লেনদেনকালে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে প্রদান করা হয়, যার কোন বিনিময় নেই।'[৮৭] প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আবু ইসহাক আর খাজ্জাগের মতে, 'কাউকে ঋণ দিয়ে আসলের অতিরিক্ত কিছু নেয়া হলে তাই সুদ।'[৮৮] সহিহ আল-বুখারির প্রখ্যাত ব্যাখ্যাদাতা হাফিয ইবনু হাজার আলআসকালানির মতে, 'অর্থ বা পণ্যের বিনিময়ে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ বা পণ্যই হচ্ছে রিবা।[৮৯] বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ-এর মতে, 'কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থ বা পণ্য-সামগ্রীর উপর সুদ হিসেবে ধার্যকৃত অবৈধ অতিরিক্তই হচ্ছে রিবা।'[৯০]

এম.এ.খান বলেছেন, 'রিবা হচ্ছে দেনার উপর এমন অতিরিক্ত যাকে ঋণদাতার অধিকার হিসেবে বলা হয়েছে, কিন্তু এর বিনিময়ে ঋণদাতা দেনাদারকে কিছুই দেয় না।'[৯১] শাইখ এম. মুস্তাফা শিবলির মতে, 'রিবা হচ্ছে ঋনের আসল পরিমাপের উপর যে কোন অতিরিক্ত, এ অতিরিক্ত প্রথমে পরিশোধ করা হোক বা শেষে দেয়া হোক।'[৯২] ড. আলি আল-সালুসি বলেছেন, 'ঋণের উপর শর্ত হিসেবে সময়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেয় যে কোন অতিরিক্তই হচ্ছে রিবা।'[৯৩] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী-এর মতে, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে মূলধনের উপর যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়তি অর্থ গ্রহণ করা হয় তাকেই সুদ বলে।'[৯৪]

ড. এম. উমর চাপরার মতে, 'শারি'আহতে রিবা বলতে ঐ অতিরিক্তকে বুঝায় যা ঋণের শর্ত হিসেবে অথবা ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির দরুণ ঋণগ্রহীতা অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।'[৯৫] অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনের মতে, 'ঋণের উপর ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু

---

৮৪. আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি, *আল মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৮৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৮৬. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৮৭. প্রাগুক্ত।

৮৮. সায়্যিদ মুহাম্মাদ মুরতজা আল-হুসাইনি আল-যাবিদি, *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরুল কামুস*(কুয়েত : দারুত তুরাসিল আরাবি, ১৩৮৫ হি.), খ. ২, পৃ. ১১৫

৮৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৯০. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৯১. M.A. Khan, *Glossary of Islamic Economics*(London : Mansell Publishers, 1989 AD), ১২৫; অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৯২. ড. এম. আলী, অনূ. আত্তিকুজ্জাফর, *ব্যাংক কা সুদ*(ইসলামাবাদ : ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৬৯-৭০

৯৩. প্রাগুক্ত।

৯৪. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, অক্টোবর ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৭৮

৯৫. Dr. M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*(Leicester : The Islamic Foundationb, UK, 1995 AD), pp. 56-57

লেনদেন করা হলে সে অতিরিক্তকে বলা হয় রিবা বা সুদ। তিনি আরো বলেন, ধারকৃত মূলধনের উপর সময়ের অনুপাতে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত দেয়াই হচ্ছে 'রিবা বা সুদ।'[৯৬] ক্রয়-বিক্রয়ে দাম নির্ধারণের বিধান লংঘন করে কোন এক পক্ষের দেয় প্রতিমূল্যের উপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে এবং সে অতিরিক্ত অংশের বিনিময় দেয়া না হলে তাই হয় রিবা।

ইমরান এন. হোসাইনের মতে, 'অন্যদের ক্ষতির বিনিময়ে, অবৈধ এবং ভ্রান্ত উপায়ে মূলধনের বৃদ্ধি হচ্ছে সুদ।'[৯৭] বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানীর মতে, 'ঋণের চুক্তিতে মূলধনের উপর অতিরিক্ত ধার্য করাকে রিবা বলে যা আল কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'[৯৮] এ সংজ্ঞাটি পবিত্র কুরআনের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।[৯৯] ড. ইউসুফ আর-কারযাভির মতে, 'শুধুমাত্র সময়ের বিনিময়ে মূলধনের উপর শর্তানুযায়ী অতিরিক্ত যা কিছু আরোপ করা হয় তাই হচ্ছে সুদ।'[১০০]

যাকি আল-দিন বাদাবির মতে, 'রিবা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের অতিরিক্ত।'[১০১] প্রখ্যাত ইসলামি অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার এম. আযীযুল হক লিখেছেন, ঋণ দেওয়া মূল অর্থ যাই উৎপন্ন করুক না কেন তার বিচার না করে ঐ ঋণের উপর পূর্ব নির্ধারিত পরিশোধিতব্য অর্থই হল সুদ।'[১০২] প্রখ্যাত ইসলামি ব্যাংকার এ.কে.এম ফজলুল হকের মতে, 'ঋণের লেন-দেনে ঋণের আসলের উপর যদি 'অতিরিক্ত কিছু' ধার্য করা হয় তবে ঐ 'অতিরিক্ত কিছু'কে রিবা বলে। সে অতিরিক্ত কিছু অর্থও হতে পারে, দ্রব্যও হতে পারে, সেবাও হতে পারে। ঋণের উপর অতিরিক্ত যাই নেয়া হোক না কেন তাই রিবা।'[১০৩]

ড. মনজের কাহফ-এর মতে, 'ঋণ দেয়া বা বিদ্যমান ঋণ ফেরত দানের সময়সীমা বাড়াতে ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতাকে যে বাড়তি পরিশোধ করেন তাই রিবা।'[১০৪] মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী বলেন, 'পরিভাষাগত দিক দিয়ে রিবা হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিপরীতে পূর্ব নির্ধারিত হারে যে অধিক পরিমাণে অর্থ আদায় করা হয় এবং একই শ্রেণিভুক্ত মালের পারস্পরিক লেন-দেন কালে চুক্তি মুতাবিক অতিরিক্ত যা গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বলা হয়।'[১০৫]

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞার মতে, 'ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত কিছু লেন-দেন করাকেই রিবা বা সুদ বলে।'[১০৬] নওয়াজেশ আলি জায়েদির মতে, 'যে কোন ধরনের ঋণের উপর ধার্যকৃত

---

৯৬. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৯৭. এম.এন হোসাইন, অনূ. মহিউদ্দিন আহমেদ, *ইসলামে রিবা নিষেধ করার গুরুত্ব*(শিকাগো : ইলিনয়, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২০

৯৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, *ইসলামিক ফাইন্যান্স*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১১

৯৯. এম. শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৩

১০০. প্রাগুক্ত।

১০১. যাকি আল-দিন বাদাবি, *আল-রিবা আল-মুহাররম*(কায়রো : দারুন নাওয়াদির, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৩৪

১০২. এম. আযীযুল হক, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৩৩-৩৫

১০৩. এ. কে. এম. ফজলুল হক, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা*(ঢাকা : দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের একুশ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৪৩

১০৪. ড. মনজের কাহফ, অনূ. মাসুম বিল্লাহ, *মাকাসিদে শরী'আহ : আধুনিক ইসলামী অর্থায়নব্যবস্থায় প্রয়োগ*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ইসলামী ব্যাংকিং, সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.), পৃ, ৯-১০

১০৫. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*(ঢাকা : আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৪৫

১০৬. ড. মুহাম্মাদ হায়দার আলী মিঞা, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং : কাস্টমস্ এন্ড প্র্যাকটিস*(ঢাকা : সাহেরা হায়দার, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ১৬

অতিরিক্তই রিবা।'[১০৭] উপরের সংজ্ঞাসমূহে বর্ণিত রিবাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। আল্লাহ সব ধরনের রিবাই হারাম করেছেন। ভোগ্য ঋণের সুদ, ব্যাংকিং সুদ বা বিনিয়োগের সুদ বা ব্যবসার জন্য গৃহীত ঋণের সুদ এ সবই হারাম। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।[১০৮] বিনিময় হীনতাই সুদ বা রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ। তাই সুদ বর্জন করতে হবে। আর সুদ বর্জনের পর আয়ের বিকল্প হালাল উৎস দরকার। এ জন্যই আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যবসায়কে হালাল ঘোষণা করেছেন। আর এ ব্যবসায়লব্ধ মুনাফা তাই সম্পূর্ণ হালাল।

সুদ নির্ধারণের প্রক্রিয়া : সুদ নির্ধারণের পিছনে বেশ কিছু তত্ত্বীয় বিষয় কাজ করে, যা অর্থনীতির গভীর আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া সম্ভব না। সুদ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী তত্ত্বসমূহ নিচে আলোচিত হলো :[১০৯]

উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব : উৎপাদনশীলতাকে ত্বরান্বিত করার জন্য মূলধন ব্যবহৃত হয়। সে জন্য উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ও বাড়তি উৎপাদনশীলতা থেকে নিজেরা অতিরিক্ত পরিমাণ লাভ পাওয়ার জন্য বিনিয়োগকারীগণ উৎপাদন খাতে মূলধন বিনিয়োগ করে থাকেন। মূলধন ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় বলেই উৎপাদিত দ্রব্যমূল্যের একটি অংশ সুদ হিসেবে মূলধনের মালিক পায়। আর এভাবেই উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব মূলধনের সুদ নির্ধারণে কাজ করে।

ভোগ বিরতির তত্ত্ব : সুদের হার নির্ধারণে ভোগ বিরতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারন ভোগ বিরতির মূল্যকেই সুদ বলা হয়। আবার মূলধনের যোগান সম্ভব হয় ভোগ বিরতির মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রবণতা থেকেই। বর্তমানের ভোগ বিরতির মাধ্যমে ভবিষ্যতের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে মূলধনের যোগান দেয়া হয় বলেই তার মূল্য স্বরূপ সুদ প্রদান করা হয়।

সময় পছন্দ তত্ত্ব : স্বাভাবিকভাবেই মানুষের কাছে ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানের ভোগ বিলাস অগ্রাধিকার লাভ করে। মূলধন তখনই যোগান দেয়া সম্ভব যখন মানুষ বর্তমানের ভোগকে ত্যাগ করে ভবিষ্যতের অতিরিক্ত পাওনার জন্য সঞ্চয় করতে আগ্রহী হয়। অর্থাৎ, বর্তমানকে ত্যাগ করে ভবিষ্যতের অতিরিক্ত পাওনাকে যখন মানুষ নির্বাচন করে তখন মূলধনের যোগান দেয়া যায় ও তা থেকে সুদ পাওনা হয়।

নগদ পছন্দ তত্ত্ব : এ তত্ত্বের মূলকথা হলো, নগদ অর্থের সুবিধা ত্যাগ করার বিনিময়ে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণকে সুদ বলে। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নগদ অর্থ হাতছাড়া করতে চায় না। কারণ নগদ অর্থের যে নিরাপত্তা পাওয়া যায়, ভবিষ্যতের বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাপ্ত লাভে কিছুটা হলেও ঝুঁকি থাকে। তাই নগদ অর্থের সুবিধা থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায় না। তবে, প্রচলিত অর্থনীতি অনুযায়ী, নগদ অর্থ হাতছাড়া করে কেউ যদি বর্তমান ক্ষতিকে মেনে নিতে রাজি হয় তাহলে সে একটি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রাখে। নগদ অর্থ হাতছাড়া করার প্রতিদানকেই সে জন্য সুদ বলে।

অপেক্ষা তত্ত্ব : বর্তমান ভোগকে ভবিষ্যতে বিলম্বিত করে তার প্রতিদান লাভের জন্য অপেক্ষার ফলাফলই হলো সুদ। কারণ শুধুমাত্র বর্তমানে ভোগ স্থগিত রাখলেই লাভ পাওয়া যায় না। বর্তমান

---

১০৭. Justice Muhammad Taqi Usmani, *Federal Shariat Court Judgement on interest*(Lahore : P.L.D. Publishers, 1992AD), vol. XLIV, p. 136

১০৮. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

১০৯ . অধ্যাপক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

ভোগকে স্থগিত রেখে তা ভবিষ্যতে লাভের আশায় মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করে ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ অপেক্ষার পরিণামই হলো সুদ।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা : মানুষের মাঝে ভোগের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মূলধন আবশ্যক। আর মূলধনের যোগান বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি আবশ্যক। আবার শুধু সঞ্চয় করলেই হয় না। দেশের জনগণের মাঝে মানসিকভাবে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের প্রবণতা থাকা জরুরি। সঞ্চিত অর্থ যখন বিনিয়োগে কাজে লাগানো হয় তখনই তা মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবেই সঞ্চয় এবং বিনিয়োগে সমতা আসে, যা সুদের হার নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।
মূলধনের চাহিদা ও যোগান মূল্য : মূলধন বিনিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা যতটুকু বৃদ্ধি পায় তার উপর চাহিদা মূল্য নির্ভর করে। কারণ উদ্যোক্তাগণ প্রান্তিক উৎপাদনশীল সীমার অতিরিক্ত সুদ দেয় না। আবার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সীমা যতক্ষণ সুদের হারের বেশি থাকবে ততক্ষণ একজন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগে আগ্রহী থাকবে। যে পর্যায়ে এসে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও সুদের হার সমান হয়ে যায় সে পর্যায় থেকে বিনিয়োগকারী আর মূলধন বিনিয়োগ করতে চায় না। অর্থাৎ, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপরই সুদের সর্বাচ্চ হার নির্ভর করে। অপরদিকে, সঞ্চয়ের উপর মূলধনের যোগান মূল্য নির্ভর করে। যে পর্যায়ে এসে বর্তমানে ভোগ করার সুবিধার চেয়ে ভবিষ্যতে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা অধিক হয় সে পর্যায়েই মূলধনের যোগান মূল্য নির্ধারিত হয়। আবার সুদের হার যত হলে সঞ্চয়ের জন্য জনগণ বর্তমান সুবিধা ত্যাগ করতে রাজি থাকে তাকেই সর্বনিম্ন সুদের হার বলে।

সুদের প্রকারভেদ : সুদের আরবি প্রতিশব্দ হলো রিবা। রিবা শব্দের শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত, বর্ধিত ইত্যাদি। অর্থাৎ বিনিয়োগকৃত মূলধনের বিপরীতে বিনিময়হীন অতিরিক্ত যে লাভ পাওয়া যায় তাকে রিবা বা সুদ বলে। রিবা দুই প্রকার– (ক) রিবা আন নাসিয়া (মেয়াদি সুদ) (খ) রিবা আল ফাদল (মালের সুদ)।[১১০]

(ক) রিবা আন নাসিয়া (মেয়াদি সুদ) : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছ থেকে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে অতিরিক্তসহ ফেরত দেয়ার চুক্তিতে কোন বস্তু গ্রহণ করার পর উক্ত নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে বস্তুটি ফেরত দেয়ার সময় যে অতিরিক্ত পরিমাণ বিনিময়হীন অংশ প্রদান করে তাকে সুদ বলে। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' 'খ'-এর নিকট থেকে এক মাস মেয়াদের জন্য এমন শর্তে ১০০০ টাকা ঋণ নিল যে ফেরত দেয়ার সময় 'ক' 'খ'-কে ১২০০ টাকা পরিশোধ করবে। এখানে অতিরিক্ত (১২০০-১০০০) = ২০০ টাকা বিনিময়হীন। অর্থাৎ, ১০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কোন না কোন কাজে ব্যয় করা হয়েছে ও তা থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, অতিরিক্ত ২০০ টাকার বিপরীতে কোন বিনিয়োগ হয়নি এবং তা থেকে কোন উপকার পাওয়া যায়নি। তাই এ বিনিময়হীন অতিরিক্ত ২০০ টাকা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। এখন কোন কারণে যদি 'ক' নির্দিষ্ট সময় শেষে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তখন 'খ' যদি সুদের পরিমাণ বৃদ্ধির শর্তে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে তাহলে তা হবে রিবা আন নাসিয়া বা মেয়াদি সুদ।[১১১]

---

১১০. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১১১. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

(খ) রিবা আল ফাদল (মালের সুদ) : সমজাতীয় বস্তু ও মুদ্রার লেনদেনের সময় লেনদেনের এক পক্ষ অপর পক্ষকে অতিরিক্ত যে পরিমাণ বস্তু ও মুদ্রা প্রদান করে তাকে রিবা আল ফাদল বলে। সুতরাং, এক কেজি ধানের বিনিময়ে যদি দেড় কেজি ধান দেয়া হয়, অতিরিক্ত আধা কেজি ধান বিনিময়হীন। এ অতিরিক্ত বিনিময়হীন অংশকে রিবা আল ফাদল বলে। আবার, রিবা আল ফাদল বা মালের সুদের ব্যাপারে রসুল সা. বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, লবনের বিনিময়ে লবন এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর– এ ৬টি জিনিসের লেনদেন সমান ও নগদ হতে হবে।

উল্লিখিত ছয় প্রকার বস্তুর প্রত্যেক প্রজাতি পরস্পর লেনদেনের সময় বস্তুর পরিমাণ কমবেশি হলে তা যেমন সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তেমনি এ ছয় প্রকার বস্তু লেনদেনের সময় কমবেশি বা বাকিতে লেনদেন করলেও তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে প্রত্যেক জাতীয় বস্তু পরস্পর লেনদেন না হয়ে যে-কোন দুই প্রজাতির পণ্য নগদে সমপরিমাণ বা কমবেশি ইচ্ছামত লেনদেন করা যাবে, তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, শুধুমাত্র এ ছয়টি বস্তু নয়; বরং এ ছয় প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরও যে সকল পণ্য আছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও এ নীতি প্রযোজ্য।[১১২]

সুদের বৈশিষ্ট্য : সুদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর কারণে সুদকে মুনাফা থেকে পৃথক করা যায়। সুদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে ও শারি'আহর দৃষ্টিকোণ থেকে সুদকে অবৈধ হিসেবে গণ্য করা হয়। সুদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- **বিনিময়হীন লেনদেন :** সুদ লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা ঋণ নিলেই কেবল সুদ প্রদান করতে হবে। ঋণ না নিলে সুদ প্রদান করবে না। তবে, ঋণ নিলেও সুদ হিসেবে অতিরিক্ত যা প্রদান করা হয় তা বিনিময়হীন হয়ে থাকে।[১১৩]

- **অবৈধ চুক্তি :** সুদের চুক্তিটি একটি অবৈধ চুক্তি। সুদি লেনদেনে মূলত দু'টি চুক্তি হয়। একটি হলো ঋণের চুক্তি, আরেকটি হলো ঋণ পরিশোধের সময় অতিরিক্ত প্রদানের চুক্তি। সুদ ছাড়া ঋণ প্রদান মৌলিকভাবে ইসলামে জায়েজ, যাকে বলে কর্জে হাসানা। কখনো কখনো ইসলাম কর্জে হাসানা প্রদানে উৎসাহিত করে। তাই ঋণের চুক্তিটি সঠিক। কিন্তু ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত সুদ প্রদানের যে চুক্তি হয় তা বৈধ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে সুদের চুক্তিটির কোন বিনিময় মূল্য নেই। আর ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বিনিময়হীন কোন লেনদেন সংঘটিত হতে পারে না। সর্বপ্রকার সুদই যেহেতু হারাম, তাই সুদি চুক্তিরও কোন বৈধতা ইসলামে নেই।[১১৪]

- **প্রতিমূল্যের উপর অতিরিক্ত আরোপ :** সুদ একটি লেনদেনের যে প্রতিমূল্য থাকে তার উপর আরোপিত অতিরিক্ত পরিমাণ। কারণ, বাকিতে পণ্য কেনাবেচার ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময় বিলম্বিত করা হলে সময়ের বিলম্বের কারণে যদি মূল্যের উপর অতিরিক্ত প্রদেয় অর্থ ধার্য করা হয় তাহলে সেই অতিরিক্ত ধার্যকৃত পরিমাণের কোন প্রতিমূল্য থাকে না।[১১৫]

---

১১২. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ পরিপালন • প্রয়োগ • পদ্ধতি*(ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৫২

১১৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১১৪. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১১৫. মোহাম্মদ আলী ও এম.এম. মোঃ আব্দুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২২০

- **সুদের কোন প্রতিমূল্য নেই :** সুদকে বলা হয় বিনিময়হীন সম্পদ বৃদ্ধি। ঋণের বিপরীতে বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়ের বিলম্বিতকরণের কারণে যে সুদ প্রদান করা হয় তার বিপরীতে সুদ গ্রহীতার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না। তাই সুদের কোন প্রতিমূল্য নেই।[১১৬]
- **পারস্পরিক লেনদেন নেই :** সুদের ক্ষেত্রে এক পক্ষ সুদ দেয়, অপর পক্ষ সুদ নেয়। যে সুদ নেয় সে সুদের বিপরীতে কিছু দেয় না। আর যে সুদ দেয় সে বাধ্যতামূলকভাবে ও একতরফাভাবে সুদ হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ দিতেই থাকে। কিন্তু অতিরিক্ত অর্থের সমপরিমাণ কিছুই সে পায় না। তাই সুদের পারস্পরিক লেনদেন নেই।[১১৭]
- **চক্রবৃদ্ধি হার :** একবার ধার্যকৃত সুদ ও তার আসলের উপর সময়ের সাথে সাথে চক্রাকারে নতুন সুদ আরোপিত হয়। একে চক্রবৃদ্ধি হার বলে। সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে পারে।[১১৮]
- **সম্পৃক্ততা :** ব্যবসায়ের ফলাফলের সাথে সুদের সম্পৃক্ততা নেই। ব্যবসায়ে লাভ হোক আর ক্ষতি হোক সুদ ব্যবসায়ীকে প্রদান করতেই হবে। এটি একটি নির্ধারিত ব্যয়।[১১৯]
- **পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত :** সুদের পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত থাকে। কারণ, ঋণের আসল টাকার উপর সুদের হার নির্ধারণ করা হয়। এটি ঋণদাতার নিশ্চিত প্রাপ্তি। ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা বিনিয়োগ করুক বা না করুক, বিনিয়োগ থেকে লাভ হোক বা না হোক সুদ প্রদান করতেই হবে।[১২০]
- **ঝুঁকিহীন :** সুদ সর্বদাই ধনাত্মক হয়ে থাকে। সুদ কখনোই শূন্য কিংবা ঋণাত্মক হয় না। সুদ যেহেতু প্রতিমূল্যের উপর আরোপিত অতিরিক্ত পাওনা তাই সুদের কোন বাণিজ্যিক ঝুঁকি নেই।[১২১]

সুদের বিধান ও নিষিদ্ধকরণের ধাপ : সামাজিক শোষণকে আরও তীব্র করে তোলার অন্যতম উপাদান হচ্ছে সুদ। কারণ, সুদি লেনদেনের ফলস্বরূপ কোন এক পক্ষের হাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ কুক্ষিগত থাকে। আর অপরপক্ষের অর্থনৈতিক ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় তা বহন করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। সুদ প্রাচীন পদ্ধতিতে হোক বা আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যাংকিং পদ্ধতিতে হোক, সর্বাবস্থায়ই অমানবিক আচরণের উৎপত্তি ঘটায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী হয়ত শুধুমাত্র মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সুদের বিনিময়ে ঋণ নেয়। আর উদ্যোক্তারা হয়ত কৃষি, ব্যবসা ও শিল্পে বিনিয়োগের জন্যই সুদের বিনিময়ে ঋণ নেয়। কিন্তু যে কারনেই নেয়া হোক না কেন তারা কেউই এ নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে, বিনিয়োগ থেকে লাভবান হবে। ফলে একদিকে বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষতি তো আছেই, উপরন্তু সুদের নির্ধারিত ব্যয় তাদের আরও বেশি সর্বশান্ত করে দেয়। তাই সুদ যে কারণে বা যে পরিস্থিতেই লেনদেন হোক, তা কখনোই কল্যাণকর পদ্ধতি নয়। তাই ইসলামে সর্বাবস্থায় সর্বপ্রকার সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[১২২]

---

১১৬. মো. গোলাম মোস্তফা, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : সমন্বয় পাবলিকেশন্স, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৫৪

১১৭. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১৯৫

১১৮. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১১৯. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

১২০. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে অর্থব্যবস্থা*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৩৫৩

১২১. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ পরিপালন • প্রয়োগ • পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১২২. মাওলানা আব্দুল্লাহ মাসুম, *ইসলামের অর্থব্যবস্থা*(ঢাকা : আইএফএ কনসালটেন্সি লি., ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২০২-২০৪

তবে সুদকে একবারে হারাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। মোট চারটি ধাপে মহান আল্লা হ সুদকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। ধাপগুলো নিম্নরূপ :

সুদ নিষিদ্ধের প্রথম ধাপ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ ج وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

'মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তা-ই বৃদ্ধি পায়; তারাই সম্পদশালী।'[১২৩]

এটিই প্রথম আয়াত যাতে সুদের ব্যাপারে নেতিবাচক উপদেশমূলক ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে। এতে সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। তবে, ইঙ্গিত

দেয়া হয়েছে যে, যে-কোনো সময় সুদ নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

সুদ নিষিদ্ধের দ্বিতীয় ধাপ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا. وَّأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

'ভাল ভাল যা ইয়াহুদিদের জন্য বৈধ ছিল আমি তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য। এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।'[১২৪]

এ ক্ষেত্রেও সরাসরি সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, ইহুদিদের জন্যও সুদ নিষিদ্ধ। তার অর্থ, মুসলিমদের জন্যেও সুদ খুব শীঘ্রই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

সুদ নিষিদ্ধের তৃতীয় ধাপ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰأَيُّهَا اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبٰوا أَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না ক্রমবর্ধমান ও আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'[১২৫]

উক্ত আয়াতে সর্বপ্রকার সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। তবে চক্রবৃদ্ধি সুদকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

সুদ নিষিদ্ধের চতুর্থ ধাপ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ز وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ ج وَأَمْرُه إِلَى اللهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

১২৩. আল কুরআন, ৩০ : ৩৯
১২৪. আল কুরআন, ৪ : ১৬০-১৬১
১২৫. আল কুরআন, ৩ : ১৩০

وَأَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. يٰأَيُّهَا اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ.

'যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সে ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই'। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই দোজখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।

নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়িম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড়, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।'[১২৬]

এটি হলো সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণার সর্বশেষ ধাপ। উক্ত ৫ আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রকার ও সকল পরিমাণের সুদকে স্পষ্ট ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মুনাফার পরিচয় : বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মোট আয় থেকে মজুরি, সুদ ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে উদ্যোক্তার যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকেই মুনাফা বলে।[১২৭] অর্থাৎ, মূলধন হিসেবে যে টাকা বিনিয়োগ করা হয় সে পরিমাণ টাকা ব্যবসায়ে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা থেকে যে আয় হয় তাকেই মুনাফা বলে। এখানে অর্থ অলসভাবে বসিয়ে রেখে তা থেকে কোন অতিরিক্ত প্রাপ্তিকে মুনাফা বলা যাবে না। কারণ অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত সফলভাবে বিনিয়োগে কাজে না লাগে ততক্ষণ তাকে মূলধন বলা যায় না। আর মূলধন না হলে তা কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন সম্ভব না। মুনাফার পরিচয় দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ জে বি সে বলেন, 'মুনাফা হলো উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক।'[১২৮] এছাড়া অর্থনীতিবিদ টুরগেটের মতে, 'মুনাফা হলো উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার।'[১২৯]

সুতরাং, যখন বিনিয়োগকৃত মূলধন ব্যবসায়ের কাজে লাগানো হয় তখন তার সাথে কিছু ঝুঁকিও সংশ্লিষ্ট থাকে। এ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মেনে নিয়ে ব্যবসায়ের মূলধন কাজে লাগিয়ে যখন তা থেকে আয় হয় তখন সে আয় থেকে ব্যবসায়ের সংশ্লিষ্ট খরচাদি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই মুনাফা। তাই মুনাফাকে যারা সুদের সমতুল্য মনে করে তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে। কারণ, সুদের জন্য অর্থ মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করা জরুরি নয়। কোন অর্থ অলসভাবে ঋণ হিসেবে দিয়ে মেয়াদ শেষে ঋণের অতিরিক্ত কিছু লাভ করলেও সুদ পাওয়া যায়। কিন্তু মুনাফা এভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যবসায়ের

---

১২৬. আল কুরআন, ২ : ২৭৫-২৭৯

১২৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

১২৮. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*(ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১৯৩

১২৯. মোহাম্মদ আলী ও এস এম মোঃ আব্দুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : কলেজ পাবলিকেশন্স, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২১৯

জন্য মূলধন প্রয়োজন, ঠিক সে ব্যবসায়েই মূলধন বিনিয়োগ করে যখন আয় হয় তা থেকেই মুনাফা নির্ধারিত হয়।

মুনাফার বৈশিষ্ট্য : মুনাফার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে মুনাফাকে সুদ থেকে পৃথক হিসেবে গণ্য করা যায়। সে বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :[১৩০]

- **উদ্বৃত্ত আয় :** সাধারণত ব্যবসায়ের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং, মুনাফা একটি উদ্বৃত্ত আয়।

- **অনির্দিষ্টতা :** ব্যবসায়ের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় কত হবে তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে না। তাই মোট বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিলে মুনাফা কত অবশিষ্ট থাকবে তাও পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করা যায় না। তাই মুনাফার পরিমাণের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টতা মুনাফার একটি বিশেষ এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।
- **অনিশ্চয়তা :** ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করলে তা থেকে লাভ হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে বিনিয়োগের সময় লাভ বা ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা হিসাব করে তারপরই বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু কেউ মুনাফার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না।
- **ঝুঁকি বহনের পুরস্কার :** ব্যবসায়ে বিনিয়োগ সর্বদাই একটি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ক্ষতি হতে পারে তা মেনে নিয়েই বিনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধন বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক। যে সকল বিনিয়োগকারী ক্ষতির ঝুঁকিকে মেনে নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহী হয় তারা ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার হিসেবে মুনাফা গ্রহণ করে।
- **আকস্মিক আয় :** মুনাফা কখনো পূর্বনির্ধারিত থাকে না। ফলে কখনো কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষতি যেমন হয় তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে মূল্য বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত মুনাফাও অর্জিত হয়ে যায়।
- **মুনাফা বাজারব্যবস্থার ফলাফল :** ব্যবসায়ে লাভ হবে নাকি ক্ষতি হবে তা বাজারব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। বাজারব্যবস্থা ভাল না থাকলে অনেক সময় সুপরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ করলেও তা আশানুরূপ মুনাফা নিয়ে আসে না। আর সে জন্যই মুনাফার সাথে ঝুঁকি সর্বদাই সম্পৃক্ত থাকে।
- **বিনিময়হীন নয় :** সুদ যেমন ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত কোন প্রাপ্তি, তেমনি মুনাফা অতিরিক্ত কিছু নয়। বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ভোক্তার জন্য যে উপযোগ সৃষ্টি করে তার প্রতিদান হলো মুনাফা। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই সমান সমানভাবে লাভবান হয়। সুতরাং, মুনাফা বিনিময়হীন নয়।
- **প্রতিমূল্য :** ব্যবসায়ী বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্রেতা বা ভোক্তার জন্য উপযোগ সংযোজন করে পণ্য সরবরাহ করে। সুতরাং, ক্রেতা যে উপযোগ লাভ করে তারই প্রতিমূল্য হচ্ছে মুনাফা। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি লেনদেন সমান প্রতিমূল্যের বিনিময়ে হয়।

প্রকৃতপক্ষে সুদ যেমন ব্যবসায়ের সমতুল্য নয়, তদ্রূপ ব্যবসাও সুদের সমতুল্য নয়। বরং দু'টি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বিষয়। উপরের আলোচনা থেকে সে বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

---

১৩০. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ ও মুনাফার অবস্থানগত পাথর্ক্য

সুদি ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকের অবস্থানগত পার্থক্য বুঝতে হলে এ দু'ধরনের ব্যাংকিং-এর কার্যপদ্ধতির মূল বিন্দুতে যে বিষয়গুলো কাজ করে তাদের মাঝে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বুঝতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যবসা ও সুদের মাঝে মূল পার্থক্য কোথায় তা চিহ্নিত করতে হবে। অনেকে বলেন সুদ ও মুনাফা একই। কিন্তু তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য প্রচলিত ব্যাংকের সুদ ও ইসলামি ব্যাংকের মুনাফার মাঝে বৈসাদৃশ্যগুলো চিহ্নিত করতে হবে। ইসলামি ব্যাংক ও সুদি ব্যাংকের লেনদেনের মধ্যকার যে কৌশলগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। সুদি ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা রাখা এবং ইসলামি ব্যাংকের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা রাখার পদ্ধতিগত পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। সুদি ব্যাংকের স্থায়ী আমানত ও ইসলামি ব্যাংকের মুদারাবা মেয়াদি আমানত কিভাবে পৃথকভাবে কাজ করে তাও উপলব্ধি করতে হবে। সবশেষে সুদি ব্যাংক ঋণ গ্রহণ ও ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহণের ফলাফলগত পার্থক্য বুঝতে হবে। নিম্নে এ বিষয়গুলো সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

ব্যবসা ও সুদের মাঝে বৈসাদৃশ্য : ব্যবসা ও সুদের মাঝে বৈসাদৃশ্যগুলো নিম্নরূপ :[১৩১]

- **হালাল ও হারামের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈসাদৃশ্য :** ব্যবসা একটি পবিত্র ও হালাল জীবিকা অর্জনের উপায়। সৎপথে ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য হাদিসে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে, সুদ এমনই এক হারামভাবে অর্থ উপার্জনের পন্থা যা সরাসরি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণার অন্তর্গত। সুদি কারবার ও লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য কুরআন ও হাদিসে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
- **পারস্পরিক বিনিময় :** ব্যবসায়ে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে অর্থ ও দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময় হয়। বিক্রেতার অর্থলাভ হয় ও ক্রেতার দ্রব্য লাভ হয়। সুদে মূল অর্থের অতিরিক্ত লাভ হিসেবে যা পাওয়া যায় তার কোন বিনিময় মূল্য থাকে না। আর বিনিময়হীন থাকে বলেই সুদের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিনিময় সংঘটিত হয় না।
- **লাভ ও ক্ষতির ব্যয়ভার বহন :** ব্যবসায়ে পারস্পরিক বিনিময় থাকে বলে লাভ ও ক্ষতি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই সমানভাবে বহন করে। অর্থাৎ, দুই পক্ষই লাভ ও ক্ষতি উভয়টির অংশীদার হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের ক্ষতি বহন করার প্রশ্নই উঠে না। ঋণদাতার কোন ক্ষতির ঝুঁকি তো থাকেই না। যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হয়, তা সম্পাদিত হোক বা না হোক, লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন, ঋণদাতা সুদ ঠিকই পায়। ক্ষতির ব্যয়ভার শুধু ঋণগ্রহীতা বহন করে।
- **লাভের চক্রবৃদ্ধি :** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্য বিক্রি হতে বিক্রেতা যে লাভ অর্জন করে তা এককালীন। অর্থাৎ, একবার লাভ অর্জনের পর ঐ একই বিক্রয় থেকে তা পুনরায় আর বৃদ্ধির

---

১৩১. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

সুযোগ থাকে না। কিন্তু, সুদের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর তা চক্রবৃদ্ধি হারে সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ থাকে।

- **পরিসমাপ্তি :** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য ও বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্য হস্তান্তরের সাথে সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু, সুদের লেনদেনে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে শুধু মূল অর্থ পরিশোধ করলেই লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বরং মূল অর্থ পরিশোধের পরেও সুদের ভার আরও সময় পর্যন্ত বহন করে যেতে হয়।
- **শ্রমের মূল্য :** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি বা পক্ষগণকে অর্থ বা সম্পদ, শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা কেবল অর্থকে পণ্যের মত ব্যবহার করে ঋণ হিসেবে দেয়। এখানে কোন শ্রম বা মেধা ব্যয় হয় না। অর্থাৎ, সময়ের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উপর নির্ভর করে সুদের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।
- **সম্পর্ক :** ব্যবসায় পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যবসায়ে যে অর্থ লেনদেন করা হয় তার মূলে কোন না কোন পণ্যের আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করেই লেনদেন সংঘটিত হয়। কিন্তু, সুদ যে অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয় ও যে সময়ের জন্য ঋণ প্রদান করা হয় তার সাথে সম্পৃক্ত।
- **অংশীদারিত্ব :** ব্যবসায়ের মূলে থাকে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্ব। লাভের অংশীদারিত্ব নির্ধারিত হয় পূর্ব নির্ধারিত হারে। আর ক্ষতির অংশীদারিত্ব নির্ধারিত হয় আনুপাতিক হারে। এ ছাড়া, ব্যবসায়ে ব্যয়কৃত মূলধনের উপর কোন বিনিময়হীন অতিরিক্ত লাভ ধার্য করা যায় না। কিন্তু, সুদের মূলেই থাকে ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থের উপর বিনিময়হীনভাবে ধার্যকৃত অতিরিক্ত লাভ।
- **পারস্পরিক কল্যাণ :** ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই পক্ষের কল্যাণই নিয়োজিত থাকে। সুদি লেনদেন কেবল ঋণদাতার লাভের কথা মাথায় রেখেই করা হয়। ঋণ গ্রহীতার কল্যাণের কথা চিন্তা করা হয় না।

সুদ ও মুনাফার পার্থক্য : নিচে ছকের মাধ্যমে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য তুলে ধরা হলো :[১৩২]

ক্রম	পার্থক্যের মাপকাঠি	সুদ	মুনাফা
১.	আয়ের ধরন	ঋণের উপর অতিরিক্ত প্রাপ্তি	বিক্রীত পণ্য ও সেবার প্রতিমূল্য
২.	শারি'আহ বিধান	সর্বপ্রকার সুদ হারাম	মুনাফা হালাল
৩.	সম্পৃক্ততা	সুদ ঋণ ও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত	মুনাফা পণ্য ও সেবা ক্রয়বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত
৪.	ঝুঁকি	ক্ষতির ঝুঁকি থাকে না	ক্ষতির ঝুঁকি থাকে
৫.	মুদ্রার বিবেচনা	মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়	মুদ্রাকে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়
৬.	চক্রবৃদ্ধি	চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণের উপর সুদ একাধিকবার ধার্য হতে পারে	একই পণ্য ও একই লেনদেনের উপর একাধিকবার মুনাফা ধার্য করা সম্ভব নয়
৭.	পূর্ব নির্ধারিত	সুদের পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত	মুনাফার পরিমাণ অনির্ধারিত

১৩২. মোঃ গোলাম মোস্তফা, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

ক্রম	পার্থক্যের মাপকাঠি	সুদ	মুনাফা
৮.	পরিমাণের সীমাবদ্ধতা	সুদের হার শূন্য হয় না	মুনাফার হার শূন্য হতে পারে, কখনো কখনো ঋণাত্মকও হতে পারে
৯.	শ্রম বিনিয়োগ	শ্রম বিনিয়োগ ছাড়াই সুদ প্রাপ্তি সম্ভব	মূলধন, শ্রম, মেধা, দক্ষতা, অভিব্যক্তি ও সময় সব কাজে লাগানোর ফলাফল হলো মুনাফা
১০.	পণ্যের অস্তিত্ব	কোন পণ্যের অস্তিত্ব থাকা জরুরি নয়	এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের পক্ষদ্বয়, পণ্য ও পণ্যের মূল্যের অস্তিত্ব থাকা জরুরি
১১.	নিশ্চয়তা	সুদ নিশ্চিত আয়। ঋণগ্রহীতা বিনিয়োগ করুক আর না করুক, লাভ করুক আর না করুক সুদ তাকে প্রদান করতেই হবে	মুনাফা অনিশ্চিত আয়। ব্যবসায়ী বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতেও পারে, নাও হতে পারে
১২.	বিনিময়	ঋণের অতিরিক্ত যা সুদ হিসেবে প্রদান করা হয় তার কোন বিনিময় থাকে না	প্রতিটি লেনদেন সম প্রতিমূল্যের বিনিময়ে হয়
১৩.	পরিবর্তনশীলতা	স্বল্পমেয়াদে সুদের হার পরিবর্তন হয় না	মুনাফা স্বল্প মেয়াদে পরিবর্তনশীল
১৪.	মুদ্রাস্ফীতির উপর প্রভাব	সুদের বিনিময়ে ঋণগ্রহণ করলে সুদ ঋণগ্রহীতার উপর বাধ্যতামূলক খরচ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, যে-কোন অবস্থাতেই ঋণগ্রহীতাকে সুদ দিতেই হয়। নির্ধারিত ব্যয় হওয়ায় সুদ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে	ব্যবসায়ের খরচ মেটানোর পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই মুনাফা। এটি কোন পূর্ব নির্ধারিত খরচ না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটার কোন সুযোগ থাকে না

প্রচলিত ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব এবং ইসলামি ব্যাংকের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বৈসাদৃশ্য : প্রচলিত ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব ও ইসলামি ব্যাংকের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বৈসাদৃশ্যগুলো নিম্নরূপ :[১৩৩]

- **অগ্রিম শর্ত :** প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক গ্রাহকদের নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের অগ্রিম শর্ত প্রদান করে গ্রাহকদের ব্যাংকে হিসাব খুলতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এ রকম অগ্রিম শর্ত প্রদান করা হয় না। বরং, ব্যাংক আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করে তা আমানতকারীগণের মাঝে বণ্টন করা হয়।
- **পূর্ণ নিশ্চয়তা :** প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নির্ধারিত সুদ প্রাপ্তির পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকে। ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন, শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ঠিকই আমানতকারীকে প্রদান করতে হয়। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানতকারীকে মুনাফা লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় না।
- **ঝুঁকি গ্রহণ :** প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানতকারীগণকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয় না। ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও আমানতকারীগণ নির্ধারিত সুদ পায়। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায়

১৩৩. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

মুনাফার পরিমাণ আশানুরূপ হতেও পারে, নাও হতে পারে। অর্থাৎ, আমানতকারীগণকে ঝুঁকিও বহন করতে হয়।

- **নির্ধারিত পাওনা :** প্রচলিত ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংক কখনো অতিরিক্ত লাভ করলে সে অতিরিক্ত লাভের অংশ আমানতকারীগণের মাঝে বণ্টন করে না। বরং, সুদের যে হার পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে সে হারেই আমানতকারিগণ সুদ পায়। কিন্তু, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তা থেকেও আমানতকারীগণ অংশ পায়।
- **ক্ষতির বণ্টন :** প্রচলিত ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হলে আমানতকারীগণ সে ক্ষতির অংশীদার হয় না। বরং, পূর্ব নির্ধারিত হারে তারা সুদ ঠিকই পায়। কিন্তু, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হলে আমানতকারীগণ সাহিবুল মাল হিসেবে মুদারাবা ব্যবসার পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষতিরও অংশীদার হয়।
- **ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্ক :** প্রচলিত ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্ক হয় ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা ও সুদ দাতা-সুদ গ্রহীতা সম্পর্ক। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্ক হয় মুদারিব-সাহিবুল মাল ও মুনাফা-ক্ষতির অংশীদারিত্বের সম্পর্ক।

ঋণ ও বিনিয়োগের বৈসাদৃশ্য : ঋণ ও বিনিয়োগের বৈসাদৃশ্যগুলো নিম্নরূপ :[১৩৪]

- **সংজ্ঞাগত বৈসাদৃশ্য :** ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ফেরত প্রদানের উদ্দেশ্যে অর্থের হস্তান্তরকেই ঋণ বলে। অপরদিকে, ব্যবসায়িক কাজে পুঁজি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ ব্যয় করাকেই বিনিয়োগ বলে।
- **বিধিগত বৈসাদৃশ্য :** ঋণ বৈধ হতে হলে পরিশোধের ক্ষেত্রে বিনিময়হীন অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা যাবে না। যদি অতিরিক্ত কিছু প্রদান করা হয় তাহলেই তা সুদ হবে, যা শারি'আহর দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ। অপরদিকে, বিনিয়োগের নেপথ্যে কোন পণ্য বা সম্পদ থাকে। অর্থাৎ, কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, পরিকল্পিত প্রকল্প বাস্তবায়ন বা অন্য কোন সম্পদের উপরই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে অতিরিক্ত মুনাফা ধার্য করা বৈধ।
- **উদ্দেশ্যগত বৈসাদৃশ্য :** ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য হতে হবে ঋণ গ্রহীতার কল্যাণ সাধন। ঋণ প্রদান করে তা পরিশোধের সময় যদি বিনিময়হীন অতিরিক্ত প্রদানের শর্তই আরোপ করা হয় তখন তা আর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য থাকে না। অপরদিকে, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হলো পণ্য, সম্পদ বা প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে তা থেকে বিনিয়োগকৃত অর্থের অতিরিক্ত কিছু মুনাফা অর্জন করা।
- **ঝুঁকি সম্পর্কিত বৈসাদৃশ্য :** ঋণ যে-কোন অবস্থাতেই ফেরত প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকে। ঋণের অর্থ চুরি বা অন্য কোন উপায়ে নষ্ট হলেও ঋণগ্রহীতা তা ফেরত দিতে বাধ্য। কিন্তু বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে সব সময় লাভ নাও আসতে পারে। এমনকি সম্পূর্ণ মূলধনই ক্ষতিতে পতিত হতে পারে।
- **পারস্পরিক সম্মতি :** ঋণের অর্থ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার পারস্পরিক সম্মতির ব্যাপারটি গৌণ। অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতা যে উদ্দেশ্য দেখিয়ে ঋণ গ্রহণ করে সে কাজে ঋণের

---

১৩৪. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

অর্থ নাও লাগাতে পারে। অপরদিকে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুদারিব ও সাহিবুল মালের যৌথ সম্মতিতে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে সাহিবুল মাল বিনিয়োগ করতে চায় উদ্যোক্তাও সে উদ্দেশ্যেই কাজ করে।

সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার বৈসাদৃশ্য : সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। কিন্তু, জনসাধারণের কাছে এ পার্থক্যগুলো স্পষ্ট নয়। এর কারণ হলো, প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ব্যাপক প্রসার, শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং-এর ব্যাপারে জ্ঞান না থাকা এবং সুদ ও মুনাফার মধ্যে যথাযথ পার্থক্য নিরূপণ করতে না পারা। তাছাড়া, ইসলামি ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকেও জনসাধারণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে যতটা সুদূরপ্রসারী জ্ঞান সাধারণ মানুষের মাঝে থাকা আবশ্যক ছিল, ততটা দেখা যায় না। যেখানে সুদি ব্যাংক শুধুমাত্র লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে, সেখানে ইসলামি ব্যাংকিং কাজ করে সার্বিক কল্যাণের জন্য।

সুতরাং সুদি ব্যাংক ও ইসলামি ব্যাংকগুলোর মূল কাজের উদ্দেশ্যই যেখানে পৃথক সেখানে দু'টি ব্যাংক ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি পরিচালনার পদ্ধতি এক হওয়াও একেবারে অসম্ভব। সুদি ব্যাংক শুধু ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেখানে ইসলামি ব্যাংকগুলো সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাধিকারদেয়। শুধুমাত্র উৎপাদিত পণ্য ও সম্পদের যাতে সুষম বণ্টন হয় সেদিকে ইসলামি ব্যাংকিং গুরুত্বারোপ করে। তাই সুদি ব্যাংকের মত ইসলামি ব্যাংক শুধুমাত্র কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি একটি সামাজিক কল্যাণমূলক আন্দোলন। সর্বোপরি, ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শারি'আহভিত্তিক লেনদেনের নীতি প্রতিস্থাপন করাই ইসলামি ব্যাংকের মূখ্য উদ্দেশ্য। নিম্নে ইসলামি ব্যাংক এবং সুদি ব্যাংকের বৈসাদৃশ্যগুলো উপস্থাপন করা হলো :[১৩৫]

- **মৌলিক কর্মপদ্ধতি :** ইসলামি ব্যাংকগুলোর মৌলিক কর্মপদ্ধতি পরিচালিত হয় ইসলামি শারি'আহর বিধান অনুসরণ করে। এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শারি'আহর নীতি বহির্ভূত কিছু করার সুযোগ নেই। ইসলামি ব্যাংকগুলো তাই সুদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই কাজ করে। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংকের সকল কাজে শারি'আহ নীতি মেনে চলার কোন বিধি-নিষেধ নেই। কারণ, তাদের সকল লেনদেনই সুদভিত্তিক। সুদকে কেন্দ্র করেই তারা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সুদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করে প্রচলিত ব্যাংক কোন কাজ করতে পারে না।
- **অর্থের ব্যবহার :** ইসলামি ব্যাংকগুলো পণ্য, সম্পদ বা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অর্থ বিনিয়োগ করে। অর্থকে সরাসরি পণ্য হিসেবে দেখে না। বরং অর্থকে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দেখে। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংক অর্থকেই পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে। অর্থাৎ, ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত পরিমাণ সুদ আদায় করে।
- **শারি'আহ সুপারভাইজরি বোর্ড :** ইসলামি ব্যাংকগুলো শারি'আহ নীতিমালা কঠোরভাবে অবলম্বন করে বলে তা তদারকির জন্য শারি'আহ সুপারভাইজরি বোর্ড থাকে। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে শারি'আহ নীতিমালার সম্পৃক্ততা নেই বলে শারি'আহ সুপারভাইজরি বোর্ডের প্রয়োজন হয় না।

---

১৩৫. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

- **উদ্দেশ্য :** ইসলামি ব্যাংকগুলো কেবলমাত্র মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে না। বরং, আর্থিক লেনদেনের পাশাপাশি যাতে সামাজিক কল্যাণও সাধিত হয় সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রতিটি লেনদেন এমন এক কৌশল মেনে সংঘটিত হয় যাতে সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করা যায়। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রম কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক লাভকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সামাজিক কল্যাণ সাধিত হলো কি-না তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না।
- **মূলধনের অতিরিক্ত লাভের বিধান :** ইসলামের দৃষ্টিতে ঋণ বৈধ হতে হলে ঋণ গ্রহণের পর পরিশোধের সময় অতিরিক্ত লাভের আশায় সুদ নেয়া যাবে না। যদি অতিরিক্ত লাভ করতে হয় তাহলে পণ্য, সম্পদ কিংবা কোন প্রকল্পে টাকা বিনিয়োগ করে তা বিক্রির মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে হবে। ইসলামি ব্যাংক তাই পণ্য বা সম্পদে অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংকগুলো সরাসরি অর্থ ঋণ দিয়ে প্রদত্ত ঋণের উপর অতিরিক্ত সুদ নেয় যা বৈধ নয়।
- **লাভ-ক্ষতির বণ্টন :** ইসলামি ব্যাংক উদ্যোক্তার ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ের সকল দায়-দায়িত্বে নিজেও অংশীদার হয়। লাভ যেমন বণ্টন করে নেয় তেমনি ক্ষতি বণ্টন করে নেয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার ক্ষতিতে অংশ তো নেই-ই না, বরং ক্ষতি হলেও ঋণ গ্রহীতা সুদ দিতে বাধ্য থাকে।
- **মূলধনের নিরাপত্তা :** ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় মূলধনের নিরাপত্তা প্রদান করা হয় না। ব্যবসায় বিনিয়োগ করে মুনাফা যেমন হতে পারে তেমনি বিনিয়োগকৃত অর্থ ক্ষতির সম্মুখীনও হতে পারে। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় মূলধন সম্পূর্ণ নিরাপদ। মূলধনের অতিরিক্ত সুদ প্রাপ্তিও নিশ্চিত। এ ক্ষেত্রে, ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদ আমানতের উপর ধার্যকৃত সুদের চেয়ে অধিক হয়।
- **অগ্রিম প্রতিশ্রুতি :** ইসলামি ব্যাংক আমানতকারীগণকে অগ্রিম মুনাফার শর্ত দিয়ে আমানত গ্রহণ করে না। আমানতকারীগণ অর্থ জমা রাখলে তা বিনিয়োগ করে যদি মুনাফা আসে সে মুনাফার একটা অংশ আমানতকারীগণকে প্রদান করে। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংকগুলো পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমানতকারীদের ব্যাংকে অর্থ জমা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।
- **মূলধন কাজে লাগানোর বিধান :** ইসলামি ব্যাংকগুলো সরাসরি উদ্যোক্তাকে অর্থ সরবরাহ করে না। উদ্যোক্তার সাথে ব্যাংকও উক্ত ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংক সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ প্রদান করে। প্রদত্ত ঋণের অর্থ সার্বিকভাবে কাজে লাগানো হয় কি-না তা ব্যাংকের বিবেচ্য বিষয় না।
- **সামাজিক কল্যাণ :** ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রতিটি লেনদেন এমন কৌশলে সম্পাদিত হয় যাতে ব্যক্তির সাথে সামাজিক কল্যাণও নিশ্চিত হয়। কিন্তু, প্রচলিত ব্যাংকের কার্যাবলির মাধ্যমে ব্যক্তির সাময়িক লাভ নিশ্চিত হয়। আর বৃহত্তর পরিসরে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে সকল সম্পদ জমা হয়।
- **সম্পর্ক :** ইসলামি ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকদের সাথে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের সম্পর্ক তৈরি করে। প্রচলিত ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা, সুদদাতাসুদগ্রহীতার সম্পর্ক বিদ্যমান।

- **আর্ত-মানবতার সেবা :** ইসলামি ব্যাংক যাকাত, সদাকাহ প্রভৃতি ফান্ড আর্ত ও দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় করে। প্রচলিত ব্যাংকও তা করতে পারে, তবে তারা তা করতে বাধ্য থাকে না।
- **নগদ অর্থ প্রদান :** ইসলামি ব্যাংকগুলো পণ্য কেনাবেচা বা বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রাহকের কাজটি সমাধা করে। সরাসরি নগদ অর্থ গ্রাহককে প্রদান করে না। কিন্তু, প্রচলিত ব্যাংক লেনদেনের নেপথ্যে পণ্য বা সম্পদে বিনিয়োগের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে না। নগদ অর্থ গ্রাহককে প্রদান করে নির্দিষ্ট মেয়াদের পর সুদ আদায় করে।
- **মেয়াদোত্তীর্ণ :** ইসলামি ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ থেকে মুনাফা প্রাপ্তির পর তা মেয়াদোত্তীর্ণ হলে দ্বিতীয়বার সে একই বিনিয়োগ থেকে মুনাফা ধার্য করার উপায় থাকে না। যদি সময়ের ব্যবধানের উপর নির্ভর করে আবার নতুন মুনাফা ধার্য করা হয় তাহলে তা চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে বিবেচ্য হয়, যা ইসলামি শারি'আহর নীতিবিরুদ্ধ। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংক এসব ক্ষেত্রে নতুন করে সুদ ধার্য করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিকাশ দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদ ও মুনাফা, সুদ ও ব্যবসা এবং প্রচলিত সুদি ব্যাংকিং ও শারি'আহ অনুসৃত ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম সমতুল্য মনে হলেও এর গভীরে রয়েছে নানাবিধ পার্থক্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সুদের প্রভাব

বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সুদ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ নেতিবাচক প্রভাবগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর সরাসরি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত আলোচনায় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার উপর সুদের যে নেতিবাচক প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহে সুদের নেতিবাচক প্রভাব : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহে সুদের নেতিবাচক প্রভাবগুলো নিম্নে আলোচিত হলো :

(১) প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নেতিবাচক ভূমিকা : সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনেক সময় গ্রাহক সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলনজনিত কাজে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু দেখা যায় গ্রাহকের ঋণ পরিশোধ এবং ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষমতা আছে তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে জ্ঞান থাকা দরকার তা থাকে না। এমতাবস্থায় এ ঋণ সে কিভাবে কাজে লাগাবে সে বিষয়ে তার কোন ধারণা থাকে না। দেখা যায় বিপুল পরিমাণে ঋণ নেয়া হলো ঠিকই কিন্তু তা বাস্তবে সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। আবার এ কাজের জন্য যে রকম যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা কোন জায়গা থেকে সংগ্রহ করলে সঠিক হবে তা হয়ত ব্যক্তিবিশেষের জন্য জানাটা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সঠিক জায়গা থেকে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ না করতে পারলে এমনও হতে পারে পুরনো যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের পিছনে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে।

ফলে একদিকে যেমন অপ্রয়োজনে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের পিছনে বেশি ব্যয় হয় ঠিক তেমনি যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ নেয়া হয় তাতে সঠিকভাবে অর্থ কাজে লাগানো যায় না। আবার সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেয়ার কারণে প্রকল্প যদি লাভজনক না হয় তার পরেও ঋণের সুদ গ্রাহককে প্রদান করতে হয়। সব মিলিয়ে দেখা যায় সুদের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন হয় না এবং সুদ প্রদানকে কেন্দ্র করে গ্রাহকের মাঝে হতাশা দেখা দেয়। ব্যাংকের হিসাব মতে দেশ ও জাতির যতটুকু উপকার হওয়ার কথা ছিল এ সুদ থেকে বাস্তবে আসলে ততটা উপকার হয় না; বরং অযাচিত খরচ বৃদ্ধি পায়।

(২) বিনিয়োগ হ্রাস : মূলধনের পরিমাণ এক একক বাড়ার সাথে সাথে সে মূলধন ব্যয় করে যে প্রত্যাশিত হারে আয় পাওয়া যায় তাকে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বলে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইন্স সুদের হারের সাথে বিনিয়োগের বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখিয়েছেন। কারণ, সুদের হার এবং মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার পারস্পরিক সম্পর্কই বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের পিছনে মূল হিসেবে কাজ করে। সুদের হার এবং মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা যদি সমান হয় তাহলে বিনিয়োগ সংঘটিত হয়। ফলে দেখা যায় সুদের হার যখন কমে যায় তখন বিনিয়োগ সর্বাধিক হয়। আর সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ কমে।

(৩) **জাতীয় আয় হ্রাস পায় :** সুদের হার হ্রাস পেলে বিনিয়োগ বাড়ে।[১৩৬] ফলে উৎপাদন বাড়ে যা জাতীয় আয়কেও বৃদ্ধি করে। এভাবে সুদ যখন শূন্যের কোঠায় নামে তখন বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি

---

১৩৬. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

হয়। কারণ তখন মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সুদ যখন বিদ্যমান থাকে তখন মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতাও হ্রাস পায়। ফলে বিনিয়োগ কম হয়, উৎপাদন হ্রাস পায় এবং জাতীয় আয় হ্রাস পায়।

(৪) অর্থনৈতিক মন্দা এবং বেকারত্ব : সুদ জনগণের ক্রয় ক্ষমতাকে হ্রাস করে।[১৩৭] ফলে পণ্য এবং সেবার চাহিদাও কমতে থাকে। আবার, সুদের কারণে দেশের অর্থনীতিতে তারল্য ফাঁদের সৃষ্টি হয়। তারল্য ফাঁদের অস্তিত্ব থাকাকালীন উৎপাদন হ্রাস পায় যা জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। আবার, সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যে সমস্ত খাতে বিনিয়োগ ব্যাংকের জন্য লাভবান সে সমস্ত খাতে বিনিয়োগ বেশি হয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। অধিক বিনিয়োগ অনেক সময় অতি বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয় যা প্রয়োজনের বাইরে উৎপাদন করে। অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য অনেক সময় বাজারে চাহিদা হারায়। ফলে এক সময় শিল্পখাতে ধ্বস নামে, শ্রমিকরা কাজ হারায় ও বেকারত্ব সৃষ্টি হয়।

(৫) সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস : বিনিয়োগ থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন এবং তা বিক্রয় পর্যন্ত অনেকগুলো পক্ষ ভূমিকা পালন করে। এক পক্ষ বিনিয়োগ করে, অন্য এক পক্ষ বিনিয়োগকে কাজে লাগায় এবং আরেক পক্ষ ক্রয় করে। সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।[১৩৮] মূল্য বৃদ্ধি পেলে অনেক সময় তা যদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য না হয় তাহলে ভোক্তারা সে পণ্য ভোগ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখে। আবার যদি নিত্য প্রয়োজনীয় হয় তাহলে হয় বিকল্প খুঁজে নেয়, না হয় ভোগ করা কমিয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় উক্ত পণ্যের চাহিদা তার কাছে থাকে না। আর সে কারণে যে পক্ষ বিনিয়োগ করার কথা সে পক্ষ বিনিয়োগও কমিয়ে দেয়।

(৬) মূলধন গঠনে প্রতিবন্ধকতা : যেহেতু সুদের হার এবং বিনিয়োগের পরিমাণ একটি আরেকটির বিপরীতমুখী সেহেতু সুদের হার যত হ্রাস পাবে বিনিয়োগ তত বৃদ্ধি পাবে।[১৩৯] কিন্তু যখন সুদভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠে তখন ইচ্ছা করলেও সুদের হারকে একটা পর্যায়ের পর আর হ্রাস করা সম্ভব হয় না। তাই বিনিয়োগের জন্য মূলধনের যোগান দেয়াও সম্ভব হয় না। ফলে মূলধন গঠনে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

(৭) মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি : যখন উদ্যোক্তা সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেয় তখন উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সময় বিক্রয়মূল্যের মধ্যে সুদের যে ব্যয় তাও যুক্ত করে নেয়।[১৪০] ফলে মূলধন যোগানের পিছনে যেমন খরচ বৃদ্ধি পায় তেমনি পণ্যের বিক্রয়মূল্যও বৃদ্ধি পায়। এভাবে বিক্রয়মুল্য বৃদ্ধি পেতে পেতে কখনো তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায় বলে মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি থাকে।

(৮) অলস অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি : সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সাধারণত দেশের জনগণের মাঝে অর্থ কোন উৎপাদনশীল খাতে খাটানোর প্রবণতা কম দেখা যায়।[১৪১] যেমন– ব্যাংকের মেয়াদি আমানত, সঞ্চয়পত্র প্রভৃতি খাতে টাকা বছরের পর বছর বিনিয়োগ করে জনগণ নিশ্চিন্তে বসে থাকে। কারণ, এ

---

১৩৭. মোহাম্মাদ আলী ও এম. এম. মোঃ আব্দুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি,* (ঢাকা : কলেজ পাবলিকেশন্স, ২০১৯ খ্রি), পৃ. ২৩২

১৩৮. মোঃ গোলাম মোস্তফা, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

১৩৯. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১৪০. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং: কি কেন এবং কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১৪১. মোহাম্মাদ আলী ও এম. এম. মোঃ আব্দুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

ক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রমে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর সুদের ভিত্তিতে অর্থ উপার্জন হয়। কিন্তু এতে করে অর্থ অলসভাবে পড়ে থাকে, উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয় না এবং সম্পদ কাজেও লাগে না।

(৯) শ্রমের অপচয় : যেহেতু সুদ অলস অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং অর্থের উৎপাদনশীল ব্যবহার হ্রাস করে সেহেতু সাধারণ মানুষের মাঝে পরিশ্রম করে, উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে উপার্জনের প্রবণতা হ্রাস পায়।[১৪২] যেখানে ইসলামি অর্থনীতি শ্রম বিভাজন এবং মাত্রাগত উৎপাদনের উপর গুরুত্বারোপ করে সেখানে সুদ বিপুল পরিমাণ শ্রমের অপচয় ঘটায়।

(১০) মানবসম্পদের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা : সুদের অস্তিত্ব থাকার কারণে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারী-পুরুষ সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভয়ে ইচ্ছা করলেই যে-কোনো খাতে কাজে যোগদান করতে পারে না। আবার, সুদবিহীন কর্মক্ষেত্রও খুব একটা পর্যাপ্ত নয়। অন্যদিকে, সুদ প্রদানের ভয়ে সুদি ব্যাংকগুলো থেকে অনেক সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা ঋণ নিতে পারে না। কারণ ব্যবসায় লাভ হোক আর ক্ষতি হোক সুদ তো প্রদান করতেই হয়। আবার, দেশের সকল পর্যায়ের জনগণের কাছে ইসলামি ব্যাংকিং-এর ধারণা স্পষ্ট নয়। তাদের ধারণা ইসলামি ব্যাংকগুলোও ঘুরিয়ে সুদ খায়। তাই হয়ত প্রচলিত ব্যাংক এবং ইসলামি ব্যাংকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা ইসলামি ব্যাংক থেকেও উদ্যোগের জন্য সাহায্য চাইতে আসে না। ফলে সবদিক থেকেই মানবসম্পদ খাতে অব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হয়।

(১১) ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস : সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় আর মাথাপিছু আয়ও কমতে থাকে এবং অতি উৎপাদন সমস্যা তৈরি হয়।[১৪৩] ফলে বাজারে পণ্যের চাহিদা যতটুকু তার চেয়েও অনেক অতিরিক্ত পণ্য অবিক্রিত থেকে যায়। এ সব মিলিয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমতে থাকে। ক্রয় ক্ষমতা কমতে কমতে এক সময় দেখা যায় বিলাসজাত পণ্য ক্রয় তো অনেক দূরের কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যও অনেকে ক্রয় করতে হিমশিম খায় যা জীবনযাত্রার মানকে হ্রাস করে।

(১২) অপ্রয়োজনীয় এবং অকল্যাণমূলক বিনিয়োগ বৃদ্ধি : ইসলামি ব্যাংকিং শুধু আর্থিক কার্যাবলিই সম্পাদন করে না, তাদের কার্যাবলির পিছনে সামাজিক কল্যাণমূলক চিন্তাও থাকে। তাই বিনিয়োগ করার সময় তারা এমন খাতকে নির্বাচন করে, যে খাতগুলোর উপকারিতা সমাজে বেশি এবং যে খাত থেকে ব্যক্তি বা সমাজের সার্বিক কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব।[১৪৪] কিন্তু সুদি ব্যাংক এসব চিন্তা না করে সরাসরি ব্যক্তির সুদ প্রদানের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে ঋণ প্রদান করে। যে প্রকল্পের জন্য ঋণ নেয়া হয় তার ক্ষতিকর দিক আছে কি-না তা যাচাই করে না। কিন্তু এ পরিমাণ বিনিয়োগ যদি সকলের জন্য উপকারমূলক খাতে করা হয় তাহলে বৃহৎ পরিসরে কল্যাণসাধন সম্ভব। তাই দেখা যায় বিনিয়োগ হয় ঠিকই; কিন্তু সে বিনিয়োগ থেকে সমাজ বা ব্যক্তি খুব একটা লাভবান হয় না।

(১৩) প্রয়োজনীয় এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হ্রাস : সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো অনেক প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ করতে চায় না। কারণ প্রকল্পগুলো দীর্ঘমেয়াদি হয়।[১৪৫] দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প থেকে ইতিবাচক কোন ফলাফল পেতে সময় লাগে। আর অদূর ভবিষ্যতে যদি কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পায় অথবা

---

১৪২. মোহাম্মাদ আলী ও এম. এম. মোঃ আব্দুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

১৪৩. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

১৪৪. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং, একটি উন্নততর ব্যাংকব্যবস্থা*(ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ৫২

১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ও চাহিদা হ্রাস পায় তাহলে শিল্প ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অথচ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশ ও জাতির অনেক কল্যাণ সাধন সম্ভব। কিন্তু সুদভিত্তিক লাভের কথা মাথায় রেখে প্রচলিত ব্যাংকগুলো এসব খাতে বিনিয়োগ করে না।

(১৪) বর্ধিত কর নির্ধারণ : সরকারি পর্যায়ে দেশের কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রচুর বৈদেশিক ঋণ নেয়া হয়। সেসব ঋণ সুদসহ ফেরত দিতে হয়। এ সুদ প্রদানের জন্য সরকার শুল্ক ও কর বৃদ্ধি করে যা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি পর্যায়ে একটি বোঝা।[১৪৬]

(১৫) মুদ্রানীতির অকার্যকারিতা : যে নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রিয় ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মানবসম্পদের ব্যবহার, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে সুদের হার ও অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কাজ করে তাকে মুদ্রানীতি বলে।[১৪৭] মুদ্রানীতি কার্যকর করার জন্য সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কিন্তু ইচ্ছা করলেই সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রিয় ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ সুদের হারের অল্প তারতম্যেই অনেক বড় রকম অস্থিরতা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে সুদের অস্তিত্বের কারণে মুদ্রানীতিও ঠিকমত কার্যকর হয় না।

(১৬) স্বনির্ভরতা : উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঋণ দেয়ার সময় প্রচুর সুদ ধার্য করে। সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেয়া অর্থ দেশের অভ্যন্তরে দেশিয় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া। ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও অনেক সময় দেখা যায় সঠিক পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় না। অবাস্তবায়িত প্রকল্পকে দীর্ঘায়িত করার জন্য এবং সুদ পরিশোধের জন্য আবার অন্য কোন বিদেশি সংস্থা থেকে ঋণ নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুদের একটা চক্রের মাঝে দেশ আটকে যায়; কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় লাগে। এভাবে দেশ স্বনির্ভরতা হারায় এবং উন্নয়নও দীর্ঘায়িত হয়।[১৪৮]

(খ) সামাজিক অবস্থার উপর সুদের নেতিবাচক প্রভাব : সামাজিক অবস্থার উপর সুদের নেতিবাচক প্রভাবগুলো নিম্নরূপ :

(১) নৈতিক অবক্ষয় : অতীতে সুদি কারবারে জড়িত মহাজনরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কষ্টার্জিত অর্থ সুদ হিসেবে মহাজনদের দিয়ে দেয়ার জন্য বাধ্য করত। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হত না। সম্পদ মহাজনদের হাতে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু দরিদ্ররা নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও পেত না। অতীতের এ সুদের কারবারই বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের রূপ নিয়ে সুদি কারবার পরিচালনা করছে।[১৪৯] প্রচলিত ব্যাংকের সুদভিত্তিক ঋণের পর্যাপ্ততার কারণে কিছু লোক সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের অর্থ সঠিক কাজে সঠিকভাবে ব্যয় হয় না। ঋণের অর্থ অনেক সময় অলস পড়ে থাকে যা অপচয়ের নামান্তর। এভাবে বারবার অপরিকল্পিতভাবে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা তৈরি হয় যা গ্রাহকের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

---

১৪৬. মোহাম্মাদ আলী ও এম. এম. মোঃ আব্দুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
১৪৭. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং, একটি উন্নততর ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
১৪৮. মোহাম্মাদ আলী ও এম. এম. মোঃ আব্দুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
১৪৯. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

(২) সামগ্রিক যোগানের উপর প্রভাব : সুদি অর্থনীতিতে দ্রব্য ও সেবার মূল্যের আধিক্যের কারণে ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে সামগ্রিকভাবে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা হ্রাস পায়। কিন্তু, দ্রব্য ও সেবার চাহিদা যদি যথাযথভাবে বিদ্যমান থাকে তাহলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বেশি পরিমাণে দ্রব্য ও সেবার যোগান দিতে পারে। সুদের অস্তিত্ব থাকায় সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে সামগ্রিক যোগানও হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনও বাজার ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে।

(৩) কর্মবিমুখতা সৃষ্টি : ঋণের অর্থ কোন উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় না করে অলসভাবে ফেলে রাখলে তা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় না। সম্পদ অলসভাবে পড়ে থাকে বলে তা ঋণ গ্রহীতার মাঝে কর্মবিমুখতা সৃষ্টি করে। কর্মবিমুখ ব্যক্তি সমাজ ও দেশের জন্য বোঝাস্বরূপ। বিনা পরিশ্রমে সুদের বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তি হলে তা বিনিয়োগ করার পরিবর্তে অলসভাবে বসে থেকে উক্ত অর্থ ব্যয় করার প্রবণতা তৈরি হয়।[১৫০]

(৪) কর্মক্ষমতা হ্রাস : সুদের বিনিময়ে গৃহীত ঋণ কোন প্রকল্পে ব্যয়িত হলে তা যদি লাভ বয়ে নাও আনে তবুও সুদ ঠিকই পরিশোধ করতে হয়।[১৫১] ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পরে যদি উদ্যোক্তার উপর সুদের বোঝা চেপে থাকে তাহলে তা সবসময় উদ্যোক্তাকে দুশ্চিন্তার মধ্যে রাখে। ফলে তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

(৫) চারিত্রিক স্খলন : বিনা পরিশ্রমে সুদের বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তি ও প্রদান গ্রাহকদের মধ্যে চারিত্রিক স্খলনের সৃষ্টি করে।[১৫২] উদ্যোক্তার ব্যবসায়ে ক্ষতির ফলে সুদ পরিশোধের সামর্থ্য না থাকলেও ব্যাংক বারবার সুদ পরিশোধের জন্য উদ্যোক্তার উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কারণ সুদই হলো প্রচলিত ব্যাংকের আয়ের উৎস। এতে উদারতার পরিবর্তে অত্যাচার ও নির্মমতার চর্চা হয়। আবার সুদের ভিত্তিতে গৃহীত অর্থ যদি বিনিয়োগে কাজে না লেগে অলসভাবে পড়ে থাকে তাহলে মজুতকৃত অর্থ সীমিত হয়ে যায়। কারণ তা থেকে অর্থ বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না। কিন্তু, সুদ ঠিকই প্রদান করতে হয়।

(৬) ব্যক্তিস্বার্থের মাত্রাতিরক্ত চর্চা : প্রচলিত ব্যাংক গ্রাহকদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান করে।[১৫৩] অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ মূল ভূমিকা পালন করে। সামাজিক কল্যাণ এ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করলে অথবা অলসভাবে বসিয়ে রাখলে তা থেকে ঋণ গ্রহীতা সাময়িক সুবিধাপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যাংক সুদ লাভ করে। কিন্তু এ সম্পদ থেকে সামগ্রিকভাবে কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। ফলে জনকল্যাণ উপেক্ষিত থাকে। সামগ্রিক কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ মূখ্য ভূমিকা পালন করলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

(গ) রাজনৈতিক অবস্থার উপর সুদের নেতিবাচক প্রভাব : রাজনৈতিক অবস্থার উপর সুদের নেতিবাচক প্রভাবগুলো নিম্নরূপ :

(১) রাজনৈতিক অস্থিরতা : ব্যক্তিগত স্বার্থে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিণতি এবং রাষ্ট্রীয় কাজে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিণতিতে কোন পার্থক্য নেই।[১৫৪] অনেক সময় দেশের সরকার বিভিন্ন

---

১৫০. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ, সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
১৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
১৫৩. মোঃ গোলাম মোস্তফা, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
১৫৪. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

উন্নয়নমূলক এবং লাভজনক প্রকল্পে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে। সরকারের উদ্দেশ্য থাকে ঋণের অর্থ প্রকল্পে কাজে লাগিয়ে উক্ত প্রকল্প থেকে অর্জিত লাভের অংশ দিয়ে সুদ পরিশোধ করা। কিন্তু, বৃহৎ পরিসরে ঋণ নেয়া হলে অনেক সময় অনুমান ঠিক নাও হতে পারে। বিনিয়োগ থেকে যে লাভ আসার কথা তা অনেক সময় সুদের হারের সমানও হয় না। এমতাবস্থায়, সরকারের পক্ষে ঋণের আসল এবং সুদ উভয়ই পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এভাবে, রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। তখন সরকার অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধের জন্য পুনরায় সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে। এভাবে সুদের বোঝা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কিন্তু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংঘটিত না হলে একপর্যায়ে জনমনে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তৈরি হয়। ফলে রাজনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

(২) সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস : একটি দেশের জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমও অব্যাহত থাকা উচিত। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার উৎপাদন সচল থাকা উচিত। সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণের ফলে উৎপাদন এবং উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়লে তা জনগণকে আশাহত করে। আবার অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে জনগণের আর্থিক সম্পদ অপচয় হয়। সুদের হারের প্রতিনিয়ত এবং অপরিকল্পিত উঠানামার কারণে জনগণের সঞ্চিত অর্থ থেকে আশানুরূপ মুনাফা আসে না।[১৫৫] আবার ব্যক্তি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারকে যে কর ও শুল্ক প্রদান করে তার বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত সুযোগ সুবিধা পায় না। এতে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।

(৩) কল্যাণধর্মী কার্যক্রম হ্রাস : কেবলমাত্র লাভজনক কাজের দ্বারাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত হয় না। সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কিছু অলাভজনক, কিন্তু সমাজ কল্যাণধর্মী কাজের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।[১৫৬] যেমন: পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান, বিশুদ্ধ পানি সরবারহ সুবিধা প্রদান, কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, গৃহায়ন প্রকল্প, দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ সকল কাজের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এ সকল কাজকে লাভজনক প্রকল্পের আওতায় আনা যায় না। কারণ, এ সকল প্রকল্প হতে মুনাফা নাও আসতে পারে অথবা মুনাফা কাম্য হওয়াই উচিত নয়। কিন্তু, প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন। এ সকল খাতে কাজ করার জন্য যদি সুদের বিনিময়ে ঋণ নেয়া হয় তাহলে সুদ এবং সুদের আসল উভয়ই পরিশোধের জন্য জনগণের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপানো হয়। একদিকে প্রকল্প থেকে লাভ অনিশ্চিত থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লাভ হলেও তা আশানুরূপ হয় না। অন্যদিকে বাড়তি করের বোঝার কারণে জনমনে অসন্তোষ দেখা যায়।

(৪) জাতীয় জরুরি প্রয়োজনে সুদমুক্ত ঋণের সংকট : অনেক সময় বিদেশি শত্রুর হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার প্রয়োজন পড়ে।[১৫৭] আবার, কখনো সরাসরি কোন রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে হতে পারে। এ সকল বিপুল পরিমাণের ব্যয়গুলোর বিপরীতে কোন লাভ অর্জিত হয় না। সুদি অর্থব্যবস্থায় জাতির এ ধরণের

---

১৫৫. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

১৫৬. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ, সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

জরুরি প্রয়োজনে যদি ঋণ নিয়ে কার্যসম্পাদন করতে হয় তাহলে তার বিপরীতেও সুদ প্রদান করতে হয়। রাষ্ট্রীয় কোন ব্যয় থেকে লাভ না আসা সত্ত্বেও যদি তার জন্য গৃহীত ঋণের বিপরীতে সুদ প্রদান করতে হয় তাহলে তা এক সময় জাতিকে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়।

(ঘ) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব : সুদের প্রভাব দেশকে ছাড়িয়ে দেশের বাইরেও বিস্তৃতি লাভ করে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) সংকট মুকাবিলা : দেশিয় পরিস্থিতিতে কোন অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হলে তা মুকাবিলার জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থ সংকুলান না হলে বৈদেশিক ঋণ নিতে হয়।[১৫৮] ঋণের অর্থ উৎপাদনমূলক কাজে ব্যয় করা যায় না। ফলে লাভও অর্জিত হয় না। সংকট মুকাবিলার কাজেই ব্যয় করতে হয়। উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য জনগণের উপর বাড়তি কর ধার্য্য করতে হয়। ঋণের আসল পরিশোধের জন্যই অর্থ সংগ্রহ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। উপরন্তু, যদি সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয় তাহলে সুদের অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য জনগণের উপর মাত্রতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করতে হয়। ফলে একটি সংকট মুকাবিলা করতে গিয়ে আরো সংকট সৃষ্টি হয়।

(২) ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা : সুদের কারণে কতিপয় লোক বিপুল অর্থের মালিক হয়ে যায়। আর অধিকাংশ লোক সুদি ব্যবস্থার চাপে পড়ে সুদ প্রদান করতে করতে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। সুদি ব্যবস্থার কারণে জনসাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রচলিত ব্যাংকগুলো আমানত হিসেবে গ্রহণ করে।[১৫৯] উক্ত আমানত থেকেই সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত ঋণ সঠিকভাবে কাজে নাও লাগতে পারে। কখনো কখনো ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ সঠিকভাবে কাজে না লাগিয়ে অলসভাবে ফেলে রাখতে পারে। আবার ঋণ গ্রহণ করে ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ীগণ ঋণ পরিশোধ না করে নিজেদের দেউলিয়া দাবি করতে পারে। উক্ত সকল অবস্থায়ই জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, ক্ষমতা একটা ক্ষুদ্র গোষ্টির হাতে কেন্দ্রিভূত হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র গোষ্টির হাতে বৃহৎ জনগোষ্টি আর্থিকভাবে জিম্মি হয়ে পড়ে।

(৩) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সংগ্রহে সমস্যা : জনগণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় দব্য, খাদ্যসংস্থান, বস্ত্রের যোগান, স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংকটকালীন সময়ে বিদেশ থেকে আমদানির জন্য বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে।[১৬০] অতীব জরুরি ভোগ্য পণ্য আমদানি করে যে পরিমাণ ব্যয় হয়, জনগণকে তা সরবরাহ করে সে পরিমাণ লাভ হয় না। আর নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরি পণ্য সরবরাহ থেকে আশানুরূপ লাভ করা সম্ভবও না। সুতরাং উক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য প্রয়োজনের চেয়েও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ, ঋণের আসল ও সুদ উভয়ই পরিশোধের জন্য জনগণের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়।

(৪) প্রতিরক্ষা ব্যয় : দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য বিপুল পরিমাণ খরচের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয়। প্রতিরক্ষা খাত একটি অনুৎপাদনশীল খাত।[১৬১] সুতরাং, ঋণ

---

১৫৮. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ, সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১
১৫৯. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
১৬০. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ, সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
১৬১. প্রাগুক্ত।

পরিশোধের জন্য প্রতিরক্ষা খাত থেকে অর্থ আয় করা সম্ভব না। তাই, এ ঋণের আসল ও সুদ উভয়ই পরিশোধের জন্য অর্থ সংকুলানের জন্য জনগণের উপর বাড়তি চাপ প্রয়োগ করতে হয়।

(৫) রাজনৈতিক পরিস্থিতি: অনেক সময় সরকারের জনপ্রিয়তা না থাকলেও সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে হলে অন্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে। জনপ্রিয়তা না থাকা সত্ত্বেও উক্ত সরকার টিকে থাকলে হয়ত অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব।[১৬২] এ উদ্দেশ্য থেকেই স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রগুলো উক্ত সরকারকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করে। এ অর্থ যেসব খাত থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না সে খাতসমূহে ব্যয় করা হয়। ফলে এ ক্ষেত্রেও ঋণের আসল ও সুদ বোঝা হয়ে চেপে বসে।

(৬) বিনিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা : দেশের সরকার উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগণের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেও আন্তর্জাতিক ঋণ গ্রহণ করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে তা থেকে লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।[১৬৩] বর্ধিত লাভ থেকে ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের উদ্দেশ্যে এ ধরণের ঋণ গৃহীত হয়। কিন্তু এ ধরণের ঋণ থেকে অনুন্নত দেশসমূহ সুফল পায় না। কারণ ক্রমবর্ধিত হারে অনুন্নত দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। ফলে ঋণের সুফল জাতি ভোগ করতে পারে না। অপরদিকে, ঋণের সুদ বোঝা হয়ে সর্বাবস্থায় জাতির উপর চাপ সৃষ্টি করে। পূর্বের ঋণ পরিশোধের জন্য পুনরায় নতুন করে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হয়। এ অবস্থায় সুদের চক্র থেকে অনুন্নত দেশগুলো নিজেদের মুক্ত করতে পারে না।

(৭) উন্নত দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ : সুদের চক্রে আবদ্ধ হয়ে অনুন্নত দেশগুলো পূর্বের সুদ পরিশোধের উদ্দেশ্যে নতুন করে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেয়।[১৬৪] নতুন ঋণের সুদ পূর্বের ঋণের সুদকেও কখনো ছাড়িয়ে যায়। আবার, এ ঋণসমূহ ঋণদাতা দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হয়। ঋণদাতা দেশগুলো ঋণগ্রহীতা দেশগুলোর উপর শর্তারোপ করে। ঋণের ব্যবহার, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ শর্তসমূহ আরোপ করা হয়। এ শর্তসমূহ পূরণ করতে গিয়ে ঋণগ্রহীতা দেশগুলো নিজেদের উন্নয়নমূলক কাজগুলোতে অগ্রসর হতে পারে না। ফলে ঋণের আসল এবং সুদ উভয়ই তাদের জন্য বোঝাস্বরূপ হয়ে দেখা দেয়।

(৮) ঋণ-দাসত্ব প্রথার জন্ম : সুদের কারণে অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর সামনে সর্বদা মাথানত করে থাকতে হয়। ফলে অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তো অনেক দূরের কথা, ঋণ পরিশোধের জন্য হলেও তাদের পুনরায় উন্নত দেশগুলোর মুখাপেক্ষী হতে হয়।[১৬৫] এভাবে অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে দাসত্বপ্রথা চলে আসে, যা থেকে তারা নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। তাছাড়া উন্নত দেশগুলো বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যখন অনুন্নত দেশগুলোকে অর্থ সাহায্য প্রদান করে তার বেশিরভাগই ঋণ হিসেবে দেয়, সাহায্য বা অনুদান হিসেবে দেয় না। যেখানে নিজ দেশের জনগণের প্রয়োজনই শতভাগ পূরণ হয় না, সেখানে ঋণের আসল ও সুদ উভয়ই পূরণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

---

১৬২. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১৬৩. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ, সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
১৬৪. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১৬৫. প্রাগুক্ত।

(৯) সরকারি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি : সুদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণের চুক্তির পর ঋণের অর্থ কোন খাতে, কোন উপায়ে ব্যয় হলো তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন পড়ে না। সুদসহ ঋণের আসল ফেরত পাওয়াই হলো ঋণদাতা দেশগুলোর মূল লক্ষ্য।[১৬৬] ঋণ গ্রহণের পরবর্তী সময়ে ঋণের অর্থ অপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করা হলে উন্নয়নমূলক কাজে ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না। দেখা যায়, কৃত্রিমভাবে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। কিন্তু, প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে না। ফলে, দীর্ঘমেয়াদে এ ঋণ কোন সুফলই বয়ে আনে না। আবার, ঋণের অর্থ অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের ফলে অর্থনীতির অবকাঠামোগত কোন উন্নয়ন সাধিত হয় না। বাহ্যিকভাবে উন্নয়ন দৃষ্টিগোচর হলেও অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত ক্ষতি ভবিষৎকালে অনুধাবিত হয়।

(১০) আন্তর্জাতিক শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি : দেশের অভ্যন্তরে সুদের পরিণতিতে সম্পদ অল্প কিছু গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয় না। সম্পদের অসম বণ্টনের কারণে অর্থনৈতিক কল্যাণ সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায় না। তদ্রূপ, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সুদের পরিণতি একই, যদিও সে ক্ষেত্রে সুদের নেতিবাচক প্রভাবের পরিধিটা বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদ ঋণগ্রহীতা দেশগুলোকে সর্বদা পরমুখাপেক্ষী করে রাখে। ঋণদাতা দেশগুলো নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য ঋণ দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু, ঋণগ্রহীতা দেশগুলো ঋণ পরিশোধ করতে করতে সর্বস্বান্ত হয়। এ ক্ষেত্রে ঋণ লেনদেন থেকে প্রাপ্ত সুফল উন্নত দেশগুলোই একচেটিয়াভাবে ভোগ করে। সম্পদ আন্তর্জাতিকভাবে উন্নত দেশের কাছে পুঞ্জিভূত থাকে। অধিকাংশ দেশই উন্নয়নের ফলাফল থেকে বঞ্চিত থাকে।

সুদের উপরোক্ত কুফলগুলো ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার আন্দোলনকে জোরদার করা অনস্বীকার্য।

---

১৬৬. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ, সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরোক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিবিধ প্রকার নির্দেশকের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অর্থ হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক দু'পক্ষের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে একটি আর্থিক বিনিয়োগমূলক কর্মপন্থা যার মধ্যে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক কল্যাণও অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক উভয়পক্ষের যৌথ সম্মতিতে কৃত চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা সেহেতু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব পর্যালোচনা করার জন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এবং তার গ্রাহক উভয়পক্ষের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া জরুরি। কারণ ব্যাংকিং কাজে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন শারি'আহ দৃষ্টিকোণ থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় তখন তারা দেশের অর্থনীতির মৌলিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়।

আবার, গ্রাহকগণও যখন শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিংকে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য দেয় তখন তারা শারি'আহভিত্তিক কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুফল বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেয়। তাই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব পর্যালোচনার জন্য কোন পক্ষের ভূমিকাই গৌণ নয়। দু'পক্ষের সম্মিলিত আগ্রহেই সুদমুক্ত ব্যাংকিং সারা বিশ্বে দিন দিন ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত একটি চুক্তিভিত্তিক বিনিয়োগমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। গতানুগতিক ঋণ প্রদান এবং আমানত গ্রহণের ধারণা থেকে বের হয়ে বিনিয়োগমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকসমূহ এবং তাদের গ্রাহকগণ সন্তুষ্ট কি-না তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি জরিপের মাধ্যমে ফলাফল নির্ণয় করা হয়।

জরিপের উদ্দেশ্য : সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক কার্যাবলি পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যাংকারগণ গ্রাহকগণের থেকে কতটুকু সহযোগিতা পাচ্ছেন, ব্যাংকারগণ নিজেরা সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার কিরূপ ফলাফল পাচ্ছেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের বিভিন্ন নির্ধারকের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে সে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হলে পরিমাণবাচক পদ্ধতিতে জরিপের বিকল্প নেই। আবার, গ্রাহকগণ শ্রেণি সুদি ব্যাংকিং এবং সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর দিকে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, সুদি ব্যাংকিং-এর দিকে তাদের মনোযোগ বেশি না-কি সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর দিকে তাদের আগ্রহ বেশি, সুদি ব্যাংকের সাথে তুলনামূলক বিচারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে তাদের লাভবান হওয়ার পরিমাণ, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের নির্ধারকসমূহের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার যে প্রভাব সে ব্যাপারে গ্রাহকগণের ধারণা প্রভৃতি বিচারের জন্যও পরিমাণবাচক জরিপের বিকল্প নেই।

জরিপ পদ্ধতি : এ গবেষণাটি একটি প্রাথমিক গবেষণা যাতে পরিমাণবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য এবং উপাত্তের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরিপের ক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে যাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে তাদের দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একপক্ষ হলো ব্যাংকার এবং অপরপক্ষ হলো ব্যাংকের গ্রাহক। ব্যাংকারদের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সুদি ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনে সক্ষম এবং এ বিষয়ে বিশদ ধারণা আছে এমন গ্রাহকদের জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রশ্নপত্রে উল্লিখিতি প্রশ্নের ভিত্তিতে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের মতামত গ্রহণ এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরিশেষে, পরিসংখ্যানিক তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত সফ্টওয়্যার SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)-এর মাধ্যমে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পরিমাণবাচক জরিপের সুবিধা : প্রাথমিক গবেষণাকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিমাণবাচক জরিপ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে অধিক সুবিধাজনক। কারণ পরিমাণগত পদ্ধতিতে যেহেতু সংখ্যার সাহায্যে ফলাফলগুলো উপস্থাপন করা যায়, সেহেতু খুব কম সময়ে এক নজর দেখেই গবেষণার ফলাফল বুঝা যায়। আর সংখ্যার মাধ্যমে যখন ফলাফল প্রকাশ করা হয়, তখন খুব সহজেই সংখ্যাকে লেখচিত্র অথবা কোন সারণীতে উপস্থাপন করা যায় যা সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য।[১] আর সংখ্যার মাধ্যমে যে ফলাফল উপস্থাপন করা হয় তা পরবর্তীতে বিস্তারিত এবং রচনামূলকভাবেও বিশ্লেষণ করা হয় বলে যারা সংখ্যাবাচক অথবা পরিমাণবাচক জরিপে পারদর্শী নয় তারাও ফলাফল দেখে খুব সহজেই গবেষণার ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারে। এর আরও একটি সুবিধা হলো, পরিমাণবাচক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রের উত্তরদানকারী নমুনাকে ইচ্ছেমত বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়।[২] যেমন : বয়সভেদে, শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে, পেশাগত দক্ষতার উপর ভিত্তি করে, লিঙ্গভেদে বিভিন্নভাবে তথ্য ও উপাত্তকে ভাগ করা হয়।

SPSS (Statsitical Package for Social Service) ব্যবহারের সুবিধা : আইবিএম এখন পর্যন্ত যতগুলো সফ্টওয়্যার বাজারজাত করেছে তার মাঝে SPSS অন্যতম। পরিসংখ্যানিক গণনার জন্য এটি একটি উন্নত পর্যায়ের কম্পিউটার প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে গবেষক নিজের পছন্দমত চলক নির্ধারণ করে নমনীয়তার সাথে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে পারে। এতে সহজ এবং জটিল উভয় ধরনের তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া রয়েছে যা নির্ধারিত চলকগুলোর মাঝে সম্পর্ক নিরূপণ করতে সক্ষম। গবেষক তার গবেষণার মান অনুযায়ী সহজ অথবা জটিল যে কোন প্রক্রিয়ায় তথ্য যাচাই করতে পারে এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারে। তাছাড়া, SPSS ব্যবহার করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং এর মাধ্যমে দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়। অনেক পরিসংখ্যানিক যাচাই পদ্ধতি থাকায় গবেষক তার ইচ্ছামত প্রক্রিয়া নির্বাচন করতে পারে।[৩] পরিমিত যাচাই, এক পার্শ্বিক

---

১. নুর ইসলাম ও আবুল খায়ের, *গবেষণা পদ্ধতি*(ঢাকা : দি ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৬৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৩. Sabine Landau and Brian S. Everitt, *A Handbook of Statistical Analyses using SPSS*(London : Chapman & Hall/CRC Press LLC, 2004 AD), p. 11

পরীক্ষা, দ্বি-পার্শ্বিক পরীক্ষা, পরিমিত বিন্যাস, দ্বি-পদী বিন্যাস, সংশ্লেষাংক, কাই বর্গ যাচাই প্রভৃতি বহুরকমের যাচাই প্রক্রিয়ার সমাহার হলো SPSS। বিপুল সংখ্যক যাচাই প্রক্রিয়া থেকে গবেষক নিজের পছন্দ মত পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারে। এই গবেষণার ক্ষেত্রে কাই বর্গ যাচাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তথ্য ও উপাত্তের ফলাফল নিরূপণ করা হয়েছে।

ব্যাংকারদের দৃষ্টিকোণ জানার প্রয়োজনীয়তা : একটি দেশের অর্থনীতিতে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর ব্যাংকিং কার্যক্রমের চাকা সচল রাখতে হলে ব্যাংকারদের ভূমিকা কখনও দৃষ্টির অগোচরে থাকে না। ব্যাংকিং দক্ষতা এমন একটি দক্ষতা যার দ্বারা ব্যাংক কর্মকর্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানের সেবার প্রতি গ্রাহকগণকে আকৃষ্ট করে তুলতে সক্ষম হন। আর ইসলামি ব্যাংকিং বা শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং একটি বিশেষায়িত ব্যাংকিং ব্যবস্থা হওয়ায় এর জন্য দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। আর দেশের অর্থনীতিতে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ব্যাংকারদের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে মতামত গ্রহণ প্রধান কাজ। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ৫০ জন সম্মানিত ব্যাংক কর্মকর্তার উপর প্রশ্নপত্রে উপস্থাপিত প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

গ্রাহকদের দৃষ্টিকোণ জানার প্রয়োজনীয়তা : একটি ব্যাংক যতখানি না নিজের লাভের জন্য কাজ করে তার চেয়ে বেশি ব্যাংকের লক্ষ্য থাকে কিভাবে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করা যায় সেদিকে। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ পর্যায়ের সেবা দিতে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তুত থাকে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এ সেবা দান এবং সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যটি কেবল ব্যাংক এবং তার গ্রাহকের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এখানে মূখ্য বিষয়। কিন্তু সুদমুক্ত শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এ সেবাদান এবং সেবাগ্রহণের ব্যাপারটি শুধু ব্যাংক এবং তার গ্রাহকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজ পর্যন্তও বিস্তৃত হয়। কারণ ইসলামি অর্থনীতির মূল লক্ষ্যই হলো সামাজিক কল্যাণ সাধন। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামি অর্থনীতির চালিকা শক্তি বিধায় ইসলামি ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের যে সেবাগুলো প্রদান করে থাকে তার কর্মপ্রক্রিয়া এমনভাবেই প্রণয়ন করে থাকে যাতে সামাজিক কল্যাণ এবং সে সাথে মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

আবার যে গ্রাহকগণ ইসলামি ব্যাংকিংসমূহ থেকে সেবা নিতে আসেন তাঁরাও শারি'আহভিত্তিক ব্যাংকিংকে পছন্দ করেন বলেই ইসলামি ব্যাংকিং-এর শরণাপন্ন হন। নতুবা দেশে আরও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা সেবা দানে প্রস্তুত। কিন্তু সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে ইসলামি ব্যাংকিংকেই তারা সেবা গ্রহণের জন্য নির্বাচন করেছেন কারণ তারা নিজেরাও ইসলামি ব্যাংকিং-এর সুফল সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই এ গবেষণায় ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে গ্রাহকদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা অতীব জরুরি বলে মনে করা হয়েছে। সে সাথে গ্রাহকদের মতামত ছাড়া এ গবেষণা রীতিমত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে মনে করা হয়। আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইসলামি ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কে গ্রাহকদের উপর জরিপ করে জরিপ সংক্রান্ত ফলাফল সারণির মাধ্যমেই উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৫০ জন গ্রাহককে নমুনা হিসেবে ধরা হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব :

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থার অবদান অনেক। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ নির্দেশকগুলো সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো :

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে প্রভাব : প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে বেশ সম্ভাবনাময় একটি দেশ। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রযুক্তি এবং উদ্যোগের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পূর্ণ ফলাফল নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকগুলোর ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য যে জরিপ করা হয়েছে তার ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১ : প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)*	শতকরা হার (%)
প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৪০	৮০
	একমত	১০	২০
	নিরপেক্ষ	-	-
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

* N = গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার সংখ্যা।

উপরোক্ত ১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ব্যাংকারগণের মধ্যে ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়টির সাথে 'সম্পূর্ণরূপে একমত' এবং ২০ শতাংশ 'একমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২ : প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৩	৬
	একমত	১০	২০
	নিরপেক্ষ	১৮	৩৬
	দ্বিমত	১২	২৪
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৭	১৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ২০ শতাংশ 'একমত', ৩৬ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ২৪ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪] মহান আল্লাহ আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থভাবে ব্যবহারে মনযোগী হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। রসুল সা.ও সবুজ শস্য-শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে বৃক্ষরোপনের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে তাগিদ দিয়েছেন এবং তা সদাকা বলে উল্লেখ করেছেন।[৫]

৪. আল কুরআন, ৮৯ : ১১-১৪

৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আী কুশাইরি র., *সহিহ মুসলিম*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৭৬১-৭৬২, হাদিস নং ৩৮৫৯, ৩৮৬০, ৩৮৬৩

মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং রসুল সা.-এর অনুপ্রেরণাই প্রমাণ করে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে উম্মাহর কতখানি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রতি গ্রিন ব্যাংকিং-এর দিকে ঝুঁকছে। গ্রিন ব্যাংকিং-এর মূল কথাই হলো পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি সাধন না করা, জ্বালানি সাশ্রয়, সৌর শক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং পরিবেশের উপাদানগুলো ব্যবহার করে তা থেকে মানবকল্যাণের উপযোগী বিনিয়োগে জনগণকে উৎসাহিত করা। ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহের এ ধরনের উদ্যোগের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন ছাড়াই উদ্যোগ গ্রহণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৬] তাই যথাযথভাবেই বলা যায় একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে ইসলামি ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা : যথাযথ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ছাড়া ইসলামি ব্যাংকিং সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব না। কারণ ইসলামি ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল দরকার। আর ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক দক্ষতা প্রচলিত ব্যাংকিং সম্পর্কিত দক্ষতার মত নয়। ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক দক্ষতা অর্জনের জন্য সঠিক শারি'আহ জ্ঞান, ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি এবং বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ছাড়া ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব না। আর এ ব্যাপারে ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের মতামত জানার জন্যই জরিপ চালিয়ে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৩ : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৪০	৮০
	একমত	১০	২০
	নিরপেক্ষ	-	-
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ১৬ শতাংশ 'একমত' এবং ৪ শতাংশ 'নিরপেক্ষ' মত পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৪ : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ইসলামিক ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১২	২৪
	একমত	১৭	৩৪
	নিরপেক্ষ	১১	২২
	দ্বিমত	৩	৬
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৭	১৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৩৪ শতাংশ 'একমত', ২২ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ৬ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

---

৬. Md. Zillur Rahman, *Green Banking for Sustainable Development*(Dhaka : The Independent, October 7, 2020 AD), see. https://m.theindependentbd.com/post/254327, visited on 17.02.2023 AD

তবে গভীর পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায়, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আবশ্যক।[৭] এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো শারি'আহভিত্তিক লেনদেন সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান। যথাযথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হলে ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর পেশাদার অভিজ্ঞ জনবল গড়ে তোলা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো যে ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তার আধুনিকায়ন জরুরি।

মূলধন গঠনে সহায়তা : একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কি পরিমাণ হবে তা সে দেশের উৎপাদনশীলতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কম উৎপাদনশীল দেশের জনগণের ভোগ-বিলাস সাধারণ দৃষ্টিতে বেশি মনে হলেও প্রবৃদ্ধিগত দিক থেকে তারা উন্নতি করতে পারে না। আর উৎপাদনশীলতা অর্জনের জন্য মূলধন অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই মূলধন গঠনে ইসলামি ব্যাংকগুলো কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের মতামত জানার জন্য যে জরিপ চালানো হয় তার ফলাফল নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৫ : মূলধন গঠনে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
মূলধন গঠনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১৭	৩৪
	একমত	৮	১৬
	নিরপেক্ষ	১০	২০
	দ্বিমত	৭	১৪
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৮	১৬
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাগণের মধ্যে থেকে ৩৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ১৬ শতাংশ 'একমত', ২০ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ১৪ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১৬ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৬ : মূলধন গঠনে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
মূলধন গঠনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৭	১৪
	একমত	১৮	৩৬
	নিরপেক্ষ	১২	২৪
	দ্বিমত	১০	২০
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৩	৬
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৬নং সারণিতে দেখ যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৩৬ শতাংশ 'একমত', ২৪ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ২০ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৬ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

সরাসরি টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত টাকার লেনদেন ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম যা রিবা বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কার্যসম্পাদনের প্রক্রিয়াই হলো ন্যায়সঙ্গত এবং শারি'আহসম্মত ব্যবসায় বিনিয়োগ করে তা থেকে উপার্জন। অর্থাৎ সরাসরি ব্যাংকে টাকা রেখে তা

৭. Norhanim Dewa and Sabarudin Zakaria, 'Training and Development of Human Capital in Islamic Banking Industry', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, January-March, 2012* (Dhaka : Islami Bank Training and Research Academy, April 2012 AD), vol. 8, No. 1, p. 90

থেকে সুদ গ্রহণ না করে ব্যাংকের সাথে বিনিয়োগমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তা থেকে মুনাফা ভোগ করা। এভাবে সর্বক্ষেত্রে বিনিয়োগকে যখন উৎসাহিত করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংক গ্রাহকদের টাকা মূলধন হিসেবে বিনিয়োগের দাবিদার। সুতরাং, ইসলামি ব্যাংকিং মূলধন গঠনে জনসাধারণকে উৎসাহিত করছে। আবার, প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাংক সরাসরি গ্রাহককে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য ঋণ প্রদান করে। বিনিময়ে ঋণ পরিশোধের সময় সুদ গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং সরাসরি গ্রাহককে ঋণ প্রদান না করে গ্রাহকের জন্য নিজে উক্ত কাজে বিনিয়োগ করে এবং পরবর্তীতে তা গ্রাহকের কাছে লাভে বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক নিজের ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদন করে সে কাজে মূলধন বিনিয়োগ করে।[৮] এভাবে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সর্বাবস্থায় মূলধন গঠনকে উৎসাহিত করে।

উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তার : উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে ব্যবসায়িক কাজে নিযুক্ত করার জন্য ইসলামি ব্যাংকিং সর্বদাই উৎসাহিত করে। ইসলামি ব্যাংকগুলো থেকে উদ্যোক্তাগণ প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় কম ঝামেলায় ব্যবসায়িক বিনিয়োগের জন্য অর্থ সাহায্য নিতে পারে। এ বিষয়ে ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য যে জরিপ পরিচালানা করা হয়েছে তার ফলাফল নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৭ : উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
উদ্যোক্তা গঠনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১৫	৩০
	একমত	১০	২০
	নিরপেক্ষ	২১	৪২
	দ্বিমত	২	৪
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	২	৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাগণের মধ্য থেকে ৩০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ২০ শতাংশ 'একমত', ৪২ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ৪ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৮ : উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
উদ্যোক্তা গঠনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৭	১৪
	একমত	১৮	৩৬
	নিরপেক্ষ	১২	২৪
	দ্বিমত	১০	২০
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৩	৬
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৩৬ শতাংশ 'একমত', ২৪ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ২০ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৬ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

৮. 'Why Islamic banking?', Trust Bank Amanah, accessed October 12, 2021 AD, see. https://www.trustbankamanah.com/why-islamic-banking/, visited on 10.01.2023 AD

বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং খাত উদ্যোক্তা গঠনকে দারিদ্র্য বিমোচনের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তা গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঋণ প্রদানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রচলিত পন্থায় যে সকল ঋণ এবং বিনিয়োগ কর্মসূচি চালু রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে কিছু অভিযোগ রয়েছে যেমন : সনাতন সুদি কারবারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা, ঋণ প্রদান এবং প্রকৃত সেবা এবং পণ্যের উৎপাদনে অসামঞ্জস্যতা, ঋণ প্রদান কর্মসূচির অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতিতে সমস্যা, সামাজিক কল্যাণে কোন ভূমিকা না রাখা ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং বিশ্বাস করে যে সুদমুক্ত পন্থায় কাজ করলে উক্ত অভিযোগ থেকে বের হয়ে এসে কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রণয়ন করে উদ্যোক্তা গঠনে ভূমিকা রাখা সম্ভব।[৯]

প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ভূমিকা : বর্তমানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে বাদ রেখে কখনো অর্থনীতির প্রসার হতে পারে না। ব্যাংক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। তাই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও ত্বরান্বিত করতে প্রযুক্তির প্রসারের কোন বিকল্প নেই। আর প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এবং সর্বস্তরে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রযুক্তির বিকল্প কিছুই হতে পারে না। তাই প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের দৃষ্টিকোণ নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৯ : প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১৫	৩০
	একমত	২০	৪০
	নিরপেক্ষ	৫	১০
	দ্বিমত	৫	১০
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৫	১০
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাগণের মধ্য থেকে ৩০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৪০ শতাংশ 'একমত', ১০ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ১০ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১০ : প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১২	২৪
	একমত	১৮	৩৬
	নিরপেক্ষ	১০	২০
	দ্বিমত	৮	১৬
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	২	৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৩৬ শতাংশ 'একমত', ২০ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ১৬ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

৯. M.A. Hamid, 'The Role of Islamic Bank in the Development of Small Entrepreneurs', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, July-September, 2018*(Dhaka : Islami Bank Training and Research Academy, October 2018 AD), vol. 1, No. 1, p. 1

ইসলামি ব্যাংকিং-এর জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত এর প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করলে প্রযুক্তির সুফল অনেকাংশে অনুধাবন করা যায়। প্রচলিত ব্যাংকিংকে আধুনিকায়নের জন্য যেমন প্রযুক্তি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে তেমনি ইসলামি ব্যাংকিংকে আধুনিক সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য এবং প্রচলিত ব্যাংকিং-এর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রযুক্তি ছাড়া চিন্তা করলে চলে না। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার সবচেয়ে বেশি বুঝা যায় গ্রাহকদের ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে নিজেদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সহজে যে কোনো স্থান থেকে সংগ্রহের সক্ষমতা থেকে। বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সেবা সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যেভাবে প্রযুক্তিগত দিক থেকে নিজেদের উন্নত করছে, ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোও ঠিক একইভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম, গ্রিন ব্যাংকিং ইত্যাদির সাহায্যে নিজেদের সেবা সর্বসাধারণের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছে যা দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[১০]

শ্রম বিভাজন এবং মাত্রাগত উৎপাদনে প্রভাব: শ্রম বিভাগ এবং মাত্রাগত উৎপাদনের ধারণা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। শ্রম বিভাজন আধুনিক বাণিজ্য খাতের অনেক বড় একটি সুবিধাজনক ধারণা। শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে একদিকে যেমন উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী পাওয়া যায় তেমনি মাত্রাগত উৎপাদন বেশি হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আর ইসলামি ব্যাংকিং শ্রম বিভাগ এবং মাত্রাগত উৎপাদন বৃদ্ধিতে কিভাবে সাহায্য করে তা নিরূপণের জন্যই ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের উপর জরিপ পরিচালনা করে নিচের তথ্য ও উপাত্তগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১১ : শ্রম বিভাজন এবং মাত্রাগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শ্রম বিভাজন এবং মাত্রাগত উৎপাদনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১৩	২৬
	একমত	১৯	৩৮
	নিরপেক্ষ	৯	১৮
	দ্বিমত	৫	১০
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৪	৮
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত **১১**নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাগণের মধ্যে থেকে ২৬ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৩৮ শতাংশ 'একমত', ১৮ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ১০ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৮ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১২ : শ্রম বিভাজন এবং মাত্রাগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শ্রম বিভাজন এবং মাত্রাগত উৎপাদনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৯	১৮
	একমত	১৪	২৮
	নিরপেক্ষ	১১	২২
	দ্বিমত	১০	২০
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৬	১২
মোট		**৫০**	**১০০**

১০. Ismail A. Ahmed, 'Islamic Banking Growth, Role of Information Technology in Cost Optimization and Operational Excellence', *Social Science Research Network* (September, 2013), p. 6, see. https://ibtra.com/pdf/journal/v1_n1_article2.pdf, visited on 10.01.2023 AD

উপরোক্ত ১২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ২৮ শতাংশ 'একমত', ২২ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ২০ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১২ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

প্রচলিত অর্থনীতিতে শ্রম বিভাজন এবং মাত্রাগত উৎপাদনের ধারণাটি প্রথম যুগে সামনে আনেন এ্যাডাম স্মিথ। কিন্তু এ্যাডাম স্মিথের চার শতক পূর্বে ইবনে খালদুন শ্রম বিভাজনের ধারণাটি সামনে আনেন। কিন্তু তা আড়ালেই রয়ে যায়। পরবর্তীতে ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা শুরু হওয়ার পর গবেষকগণ শ্রম বিভাজনকে সংজ্ঞায়িত করতে ইবনে খালদুনের ভূমিকাকে অগ্রগণ্য বলে মনে করতে শুরু করেন। ইবনে খালদুন শ্রম বিভাজনকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন।

প্রথমত, ইবনে খালদুনের মতে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উন্নত করার জন্য শ্রম বিভাজন খুব জরুরি। শ্রম বিভাজনের ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দ্রব্যটির পিছনে একাধিক জনবলের শ্রম দরকার হয়। একটা দ্রব্য উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি একজন শ্রমিক শ্রম দেয় তাহলে শ্রমিকপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। কিন্তু সে একই দ্রব্যের উৎপাদন কাজটিকে দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করলে শ্রমিকপ্রতি কাজের হার যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি মোট উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, ইবনে খালদুনের মতে একই পরিমাণ শ্রম দিয়ে শ্রমিকপ্রতি কাজের পরিমাণ এবং মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় বৃদ্ধি পায় এবং তারা নতুন শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে। নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে অধিক পরিমাণ জনবল কর্মসংস্থানের আওতায় আসে যা সামাজিকভাবে কল্যাণধর্মী ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত, যখন মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন দেশের জাতীয় উৎপাদনও বাড়ে। মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে নিজ দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত উৎপাদিত দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সুযোগ হয় যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ সুগম করে। শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে মাত্রাগত উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।[১১] কারণ পূর্বে যখন একজন শ্রমিক একটি পণ্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন করত তখন শ্রমিকের সংখ্যার উপর পণ্যের উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভর করত। আবার একজন শ্রমিক তার কর্ম ঘণ্টার পুরোটা সময় একই রকম শ্রম নাও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে মাত্রাগত উৎপাদনের দিকটি খুব একটা সন্তোষজনক হত না। কিন্তু যখনই শ্রম বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করা হয় তখন একটি কাজ কয়েকজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ায় আগের নির্ধারিত সময়েই উৎপাদন বাড়তি পরিমাণে হয়। অর্থাৎ, অন্যান্য উপকরণ ঠিক রেখেও শুধু একটি মাত্র উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমেই মাত্রাগত উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের আয়ও বৃদ্ধি পায়। আর এ নীতিতে যখন কোন প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের জন্য ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয় তখন ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানও বিনিয়োগকে লাভজনক মনে করে। অর্থাৎ, বলা যায় শ্রম বিভাগ এবং মাত্রাগত উৎপাদন বৃদ্ধিতেও ইসলামি ব্যাংকিং পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে।

---

১১. মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*(ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৫১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরোক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিচে পরোক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর আলোকপাত করা হলো :

অর্থনীতির অবকাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়তা : ইসলামি অর্থনীতির ধারণা প্রচলিত অর্থনীতির ধারণা থেকে ভিন্ন। তাই ইসলামি অর্থনীতি অনুসরণ করে একটি দেশের অর্থব্যবস্থা পরিচালনার দৃশ্যটাও প্রচলিত অর্থনীতির অনুসরণের মাধ্যমে দেশের অর্থব্যবস্থার পরিচালনার দৃশ্য থেকে ভিন্নতর। তাই ইসলামি অর্থনীতির অনুসরণের ফলে অর্থনীতির কাঠামোও ভিন্নরকম হয়। আর ইসলামি অর্থনীতিতে অর্থব্যবস্থা পরিচালনার চাবিকাঠি হিসেবে ইসলামি ব্যাংকিংই আবশ্যক। তাই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর জন্য কিভাবে সহায়ক হতে পারে তা নিরূপণের জন্য ব্যাংকার ও গ্রাহকদের উপর জরিপ পরিচালনা করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১৩ : অর্থনীতির অবকাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
অর্থনীতির অবকাঠামোগত উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৩২	৬৪
	একমত	১১	২২
	নিরপেক্ষ	২	৪
	দ্বিমত	২	৪
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৩	৬
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ২২ শতাংশ 'একমত', ৪ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ৪ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১৪ : অর্থনীতির অবকাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
অর্থনীতির অবকাঠামোগত উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১০	২০
	একমত	১৪	২৮
	নিরপেক্ষ	১২	২৪
	দ্বিমত	৭	১৪
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৭	১৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ২৮ শতাংশ 'একমত', ২৪ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ১৪ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা এবং উত্তরদাতাগণের প্রতিক্রিয়াসমূহ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা যায়। ইসলামি ব্যাংকিং প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো ঋণের লেনদেন না করে বিনিয়োগ পদ্ধতিতে কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যেহেতু ইসলামি ব্যাংকিং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নীতি অবলম্বন করে থাকে সুতরাং ইসলামি ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে দেশিয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন

সম্ভব হয়।[১২] আর বিনিয়োগ নীতি অবলম্বনের কারণে মূলধন গঠন সহজ হয় যা শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ইসলামি ব্যাংকিং যেহেতু পূর্বের তুলনায় বর্তমানে প্রযুক্তিগত প্রসারের দিকে বেশি মনোযোগী সেহেতু প্রযুক্তিগত প্রসারের কারণে অধিক পরিমাণে শিল্প ও ব্যবসাকে ইসলামি ব্যাংকিং-এর আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব যা অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়তা করে। আর যেসব ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং বিনিয়োগ মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে সেসব ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কাজ সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কি না সেসব বিষয় তদারকিতেও ইসলামি ব্যাংকিং সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ইসলামি ব্যাংকিং-এর এ সক্রিয় ভূমিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামাজিক উপাদানসমূহের উপর প্রভাব : ইসলামিক অর্থব্যবস্থা কোন ভিত্তিহীন অর্থব্যবস্থা নয়। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হলো সমাজের প্রতিটি স্তরের কল্যাণ সাধন। ইসলামি অর্থব্যবস্থার চালিকাশক্তি হিসেবে ইসলামি ব্যাংকিং সামাজিক কল্যাণ সাধনে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে তা নিরূপণের জন্য ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের উপর জরিপ চালিয়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১৫ : সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৩০	৬০
	একমত	৩	৬
	নিরপেক্ষ	৩	৬
	দ্বিমত	৭	১৪
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৭	১৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৬ শতাংশ 'একমত', ৬ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ১৪ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১৬ : সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১০	২০
	একমত	১২	২৪
	নিরপেক্ষ	১৪	২৮
	দ্বিমত	৩	৬
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	১১	২২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ২৪ শতাংশ 'একমত', ২৮ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ৬ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ২২ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

---

১২. Muhamad Abduh and Nazreen T. Chowdhury, 'Does Islamic Banking Matter for Economic Growth in Bangladesh?' *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, vol. 8, No. 3 (July-September, 2012 AD) : 107, https://ibtra.com/pdf/journal/v8_n3_article6.pdf, visited on 07.01.2023 AD

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ব্যাংকিং জনগণের মনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেতনা সৃষ্টি করে। তাই জনগণের ধর্মীয় চেতনা কেবলমাত্র নামাজ-রোজা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে আর্থিক লেনদেনেও কিভাবে প্রতিফলিত করা যায় ইসলামি ব্যাংকিং সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে। ইসলামি ব্যাংকিং সামাজিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ কর। ইসলামি ব্যাংকিং যেহেতু মূলত কল্যাণমুখী ব্যাংকিং সেহেতু এ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয় বেশি।[১৩] ব্যাংকিং-এর প্রচলিত ধারণা থেকে বের হয়ে শারি'আহসম্মত লেনদেনের অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সামাজিকভাবে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির গুরুদায়িত্ব ইসলামি ব্যাংকিং পালন করে। সুতরাং, বলা যায় ইসলামি ব্যাংকিং সামাজিক উপাদানসমূহকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

রাজনৈতিক উপাদানসমূহের উপর প্রভাব : ইসলামি অর্থব্যবস্থা মানবসৃষ্ট কোন অর্থব্যবস্থা নয়। তাই যদি সুষ্ঠুভাবে ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রয়োগ করা যায় তাহলে তাতে রাজনৈতিক প্রভাবের কোন সুযোগই থাকে না। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামি অর্থব্যবস্থারই অংশ বিধায় ইসলামি ব্যাংকিং যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে তা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ নেই। আর এ বিষয়ে ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের উপর জরিপ পরিচালনা করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১৭ : রাজনৈতিক উপাদানসমূহের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
রাজনৈতিক উপাদানসমূহে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৩	৬
	একমত	৫	১০
	নিরপেক্ষ	৬	১২
	দ্বিমত	৩১	৬২
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৫	১০
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ১০ শতাংশ 'একমত', ১২ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ৬২ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১৮ : রাজনৈতিক উপাদানসমূহের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
রাজনৈতিক উপাদানসমূহে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৪০	৮০
	একমত	৭	১৪
	নিরপেক্ষ	৩	৬
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ১৪ শতাংশ 'একমত' এবং ৬ শতাংশ 'নিরপেক্ষ' মত পোষণ করেছেন।

---

১৩. মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

রাজনৈতিক অস্থিরতা ব্যাংকিং খাতকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও সমানভাবে ফলপ্রসূ। যে সকল খাতকে ইসলামি শারি'আহ অনুমোদন করে না সে সকল খাতে ইসলামি ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ করে না। ইসলামি ব্যাংক কোন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতাকে সমর্থন করে যে কাউকে ঋণ প্রদান করেনা।[১৪] সুতরাং ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে দলীয়করণ করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সুদ এবং বিনিয়োগে যে জটিলতা তৈরি হয় ইসলামি ব্যাংকিং তা থেকে মুক্ত। সুতরাং বলা যায় ইসলামি ব্যাংকিং রাজনৈতিক অস্থিরতায় সমানভাবে ফলপ্রসূ।

১৪. Mehmet Asutay and Noor Zahirah Mohd Sidek, 'Political Economy of Islamic banking growth: Does political regime and institutions, governance and political risks matter?' *International Journal of Finance and Economics*. (2020) : 1–36, see. https://doi.org/10.1002/ijfe.2011, visited on 15.01.2023 AD

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিবিধ প্রকার নির্দেশকের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা অপরিসীম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাদানসমূহ ছাড়াও আরও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক উপাদান রয়েছে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। আর সেসব ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা যে ভূমিকা পালন করে তা নিচে উপস্থাপিত হলো :

শিল্পায়নে ভূমিকা : প্রচলিত ব্যাংকিং-এর তুলনায় ইসলামি ব্যাংকিং শিল্পায়নে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। আর প্রচলিত ব্যাংকিং-এর তুলনায় ইসলামি ব্যাংকিং-এর শিল্পায়নে বিনিয়োগ অধিকতর ফলপ্রসূ। কারণ ইসলামি ব্যাংকগুলো সেসব শিল্পে অধিক বিনিয়োগ করে যা জনগণের কল্যাণে কাজে আসে। অধিক প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা রাখে এমন শিল্পে যখন বিনিয়োগ করা হয় তখন তা দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখে। আর এ বিষয়ে ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের মতামত নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-১৯ : শিল্পায়নে ভূমিকার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শিল্পায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	২	৪
	একমত	৪৮	৯৬
	নিরপেক্ষ	-	-
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত' এবং ৯৬ শতাংশ 'একমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২০ : শিল্পায়নে ভূমিকার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
শিল্পায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৭	১৪
	একমত	১৪	২৮
	নিরপেক্ষ	১৩	২৬
	দ্বিমত	১০	২০
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৬	১২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ২৮ শতাংশ 'একমত', ২৬ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ২০ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১২ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন

শিল্পখাতে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাংকার এবং গ্রাহক উভয়পক্ষের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, একটি দেশের শিল্প খাতে ইসলামি ব্যাংকিং-এর দৃঢ় পদক্ষেপ দেশটির শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামি অর্থনীতি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে মূলধন পুঞ্জিভূত রাখাকে সমর্থন করে না। সেজন্য ইসলামি অর্থব্যবস্থা অবলম্বনের

ফলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে গচ্ছিত মূলধন যথাযথভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনেক মূলধনবিহীন লোককেও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের মাধ্যমে শিল্প খাতে অবদান রাখতে সহায়তা করে। ইসলামি অর্থব্যবস্থা শিল্প-কলকারখানাসমূহের শৃঙ্খলা বজায় রেখে উৎপাদনশীলতাকে সক্রিয় রাখে। সুতরাং ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পরিচালিত ব্যাংক উৎপাদনমুখী শিল্পকে ত্বরান্বিত করে। সে সাথে ইসলামি ব্যাংকিং শিল্পখাতে মূলধন, দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরি এবং পেশাগত দিকগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।[১৫]

বিনিয়োগে ভূমিকা : ইসলামি ব্যাংকিং সবসময় বিনিয়োগমূলক কর্মপন্থায় কাজ করে। অর্থাৎ যেখানে প্রচলিত ব্যাংকিং সরাসরি গ্রাহকের হাতে অর্থ ঋণ হিসাবে তুলে দেয় ইসলামি ব্যাংকিং সেখানে নিজে গ্রাহকের হয়ে বিনিয়োগ করে। তাতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় সহজে। আর এ বিষয়ে ব্যাংকার এবং গ্রাহকগণের মতামত নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২১ : বিনিয়োগে ভূমিকার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বিনিয়োগে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৪০	৮০
	একমত	১০	২০
	নিরপেক্ষ	-	-
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত' এবং ২০ শতাংশ 'একমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২২ : বিনিয়োগে ভূমিকার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বিনিয়োগে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১২	২৪
	একমত	১৯	৩৮
	নিরপেক্ষ	১৩	২৬
	দ্বিমত	৪	৮
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	২	৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৩৮ শতাংশ 'একমত', ২৬ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ৮ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

সুতরাং, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগের জন্য গ্রাহক নির্বাচনে দক্ষতা ব্যাংকিং কার্যক্রম সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কোন গ্রাহক বিনিয়োগ সেবা নিতে চাইলে তা অবশ্যই শারি'আহসম্মত শর্তসাপেক্ষে হবে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগের আওতা সুদি ব্যাংকের বিনিয়োগের আওতা অপেক্ষা বেশি বিস্তৃত থাকে।[১৬] ইসলামি ব্যাংকসমূহ

---

১৫. Khemaies Bougatef, Mohamed Sahbi Nakhli and Othman Mnari, *The nexus between Islamic Banking and Industrial Production : Empirical evidence from Malaysia*, (Kuala Lumpur : ISRA International Journal of Islamic Finance, 2020 AD), vol. 12, No. 1, p. 113, see. https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2018-0052, visited on 10.01.2023 AD

১৬. মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

অনেক ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে কারণ এক্ষেত্রে সুদের পরিবর্তে ব্যাংক লাভ বা ক্ষতির অংশীদার হয়। ইসলামি ব্যাংকসমূহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মূলধন গঠনে উৎসাহ দেয় এবং স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগেও উৎসাহ দেয়। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদের স্থান নেই বলে এর অর্থায়নে উৎপাদিত পণ্যের বাজার দর ও মান অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

কৃষিতে ভূমিকা : প্রচলিত ব্যাংকগুলো কৃষি খাতে তেমন একটা নজর দেয় না। আর নজর দিলেও সুদের ভার বহনের ভয়ে কৃষকরা সুবিধাবঞ্চিতই থেকে যায়। আবার কৃষকদের দুর্বলতার সুযোগে মাইক্রো ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকদের আরও বিপদে ফেলার জন্য এবং অধিক আর্থিক লাভের জন্য সুদভিত্তিক ঋণ দিয়ে কৃষকদের সর্বস্বান্ত করার চেষ্টা করে। ইসলামি ব্যাংকগুলো কৃষি খাতে বিনিয়োগের জন্য পৃথক স্কিম তৈরি করে। কৃষকদের সুবিধার জন্য কৃষি পরামর্শ প্রদান করে। কোন উপায়ে বিনিয়োগ করলে কৃষকরা লাভবান হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে। আর এ বিষয়ে ব্যাংকার এবং গ্রাহকগণ কি মতামত পোষণ করেন তা জানার জন্য জরিপ পরিচালনা করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২৩ : কৃষি খাতে ভূমিকার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
কৃষি খাতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৩	৬
	একমত	৭	১৪
	নিরপেক্ষ	৩৫	৭০
	দ্বিমত	৩	৬
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	২	৪
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ১৪ শতাংশ 'একমত', ৭০ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ৬ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২৪ : কৃষি খাতে ভূমিকার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
কৃষি খাতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৭	১৪
	একমত	১৪	২৮
	নিরপেক্ষ	১৩	২৬
	দ্বিমত	১০	২০
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	৬	১২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ২৮ শতাংশ 'একমত', ২৬ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ২০ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ১২ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

কৃষিখাতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিনিয়োগ ১ হাজার ৩১৯ কোটি টাকা।[১৭] কৃষি ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং-এর এ বিশাল পরিমাণ বিনিয়োগ ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়। সুদি ব্যাংকের ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকরা বেশিরভাগ সময়ই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। ইসলামি ব্যাংকগুলো যখন কৃষি খাতে বিনিয়োগ করে তখন কৃষকদের এ দুর্দশা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। ইসলামি ব্যাংকসমূহ কৃষি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষকদের সাথে অংশীদার হিসেবে কাজ করতে পারে। যেহেতু ইসলামি ব্যাংকসমূহ কৃষকদের সাথে লাভ-ক্ষতি বণ্টন নীতি প্রয়োগ করে কাজ করে সেহেতু ইসলামি ব্যাংকিং কৃষকদের আর্থিক ক্ষতি কিছুটা হলেও হ্রাস করতে সক্ষম হয়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা : ইসলামি ব্যাংকিং এমন খাতগুলোকে কর্মী নিয়োগের আওতায় নিয়ে এসেছে যে সকল খাতে লোকবল নিয়োগ করা প্রচলিত ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ধারণাও করা যায় না। আবার ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকিং-এর তুলনায় কিছু অতিরিক্ত ধাপে লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। আর অতিরিক্ত ধাপে যে কাজগুলো থাকে সেগুলো সম্পাদনের জন্যও অধিক জনবল দরকার হয়। সেক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকগুলোতে জনবল অধিক প্রয়োজন হয়। এভাবে ইসলামি ব্যাংকগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অধিক ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের উপর জরিপ চালিয়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২৫ : কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা(N = ৫০)	শতকরা হার (%)
কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৭	১৪
	একমত	৪৩	৮৬
	নিরপেক্ষ	-	-
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত' এবং ৮৬ শতাংশ 'একমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২৬ : কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	১২	২৪
	একমত	১৯	৩৮
	নিরপেক্ষ	১৩	২৬
	দ্বিমত	৪	৮
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	২	৪
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৩৮ শতাংশ 'একমত', ২৬ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ৮ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

---

১৭. 'Agriculture Implements Investment Scheme', Investment Scheme, *Islami Bank Bangladesh Limited*, accessed October 12, 2021, see. https://www.islamibankbd.com/ prodServices/AIIS.php, visited on 20.01.2023 AD

ইসলামি ব্যাংকসমূহ নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। ইসলামি ব্যাংকসমূহ কৃষি, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। ইসলামি ব্যাংকিং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। আর ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কর্মী নিয়োগ করে। আবার যারা মূলধনের অভাবে কোন কাজ করতে পারে না ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা তাদের মূলধন সরবরাহ করে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।[১৮] এভাবেই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা : ইসলামি অর্থনীতির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা। সমাজের সর্বস্তরে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হলেই কেবল তা সম্ভব। আর ইসলামি ব্যাংকিং ও লেনদেন পরিচালনার সময় ধনি-দরিদ্র সকলের অধিকার বিবেচনা করেই লেনদেন সম্পন্ন করে। আর এ বিষয়ে ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য জরিপ পরিচালনা করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২৭ : দারিদ্র্য দূরীকরণে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
দারিদ্র্য দূরীকরণে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৫০	১০০
	একমত	-	-
	নিরপেক্ষ	-	-
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মাঝে শতভাগই 'সম্পূর্ণভাবে একমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২৮ : দারিদ্র্য দূরীকরণে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
দারিদ্র্য দূরীকরণে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৩৫	৭০
	একমত	১০	২০
	নিরপেক্ষ	৫	১০
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ২০ শতাংশ 'একমত' এবং ১০ শতাংশ 'নিরপেক্ষ' মত পোষণ করেছেন।

ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে সকল কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে তা মানুষের অভাব দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে। ইসলামি ব্যাংকসমূহ কল্যাণমুখি গণব্যাংকিং ধারণার প্রবর্তন করেছে।[১৯] সে জন্যই

---

১৮. M. A. Hamid, 'The Role of Islamic Bank in the Development of Small Entrepreneurs', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, vol. 1, no. 1,* p. 4, see. https://ibtra.com/pdf/journal/v1_n1_article2.pdf, visited on 06.01.2023 AD

১৯. মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পল্লি উন্নয়ন, কৃষি, শিল্প, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, পোল্ট্রি, ডেইরি, গৃহ সামগ্রী প্রকল্প প্রভৃতি খাতে পৃথক বাজেট বরাদ্দ রাখা হচ্ছে।

বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে ভূমিকা : রেমিট্যান্স আদায়ে দক্ষতায় ইসলামি ব্যাংকগুলো এখন সবচেয়ে এগিয়ে আছে। আর এ বিষয়ে ব্যাংকার এবং গ্রাহকগণের মতামত জানার জন্য জরিপ পরিচালনা করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-২৯ : বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিংব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
বৈদেশিক রেমিটেন্স আদায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৫০	১০০
	একমত	-	-
	নিরপেক্ষ	-	-
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের শতভাগই 'সম্পূর্ণভাবে একমত' পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৩০ : বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিংব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	**নির্দেশিত উত্তরমালা**	**গণসংখ্যা (N = ৫০)**	**শতকরা হার (%)**
বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৬	১২
	একমত	১৭	৩৪
	নিরপেক্ষ	১৫	৩০
	দ্বিমত	১০	২০
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	২	৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১২ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৩৪ শতাংশ 'একমত', ৩০ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ২০ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রেমিট্যান্স আদায় করছে তা যথেষ্ট ফলপ্রসূ। এর ফলে দ্রুত গতিতে প্রবাসীদের অর্থ পরিবারের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। তবে রেমিট্যান্স আদায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইসলামি ব্যাংকসমূহের সম্প্রসারিত কর্মসূচির প্রয়োজন। তবে ইসলামি ব্যাংকসমূহ যদি রপ্তানিমুখি শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে পারে তাহলে রেমিট্যান্সের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া রেমিট্যান্স আদায়ের আর্থিক খরচসমূহ দক্ষতার সাথে হ্রাস করার ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।[২০]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভূমিকা : ইসলামি ব্যাংকগুলো আমদানি রপ্তানির সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের সাথে বাণিজ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেয় বলে ইসলামি ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজ হয়। আর এ বিষয়ে ব্যাংকার এবং গ্রাহকগণের মতামত নিচে উপস্থাপন করা হলো :

---

২০. Shafiqur Rahman and Nicholas McDonald, 'Economic Development of Bangladesh : *The Role of IBBL', IIUC Studies, 9 (December 2012)*, p. 329, https://www.banglajol.info/index.php/IIUCS/article/view/24143/16491, visited on 05.01.2023 AD

ব্যাংকার দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৩১ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যাংকার সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৩	৬
	একমত	৩৭	৭৪
	নিরপেক্ষ	১০	২০
	দ্বিমত	-	-
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৭৪ শতাংশ 'একমত' এবং ২০ শতাংশ 'নিরপেক্ষ' মত পোষণ করেছেন।

গ্রাহক দৃষ্টিকোণ :

সারণি-৩২ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)	শতকরা হার (%)
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে	সম্পূর্ণরূপে একমত	৬	১২
	একমত	১৭	৩৪
	নিরপেক্ষ	১৫	৩০
	দ্বিমত	১০	২০
	সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত	২	৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১২ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে একমত', ৩৪ শতাংশ 'একমত', ৩০ শতাংশ 'নিরপেক্ষ', ২০ শতাংশ 'দ্বিমত' এবং ৪ শতাংশ 'সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত' পোষণ করেছেন।

ইসলামি ব্যাংকসমূহ আমদানি-রপ্তানির কাজকে সহজ করতে পারে। আমদানি-রপ্তানিতে ভূমিকা রাখায় বিশ্ববাজারে ইসলামি ব্যাংকিং-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইসলামি ব্যাংকিং-এর ভূমিকা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্য কেন্দ্রিয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।[২১]

পরিশেষে বলা যায়, ব্যাংকার এবং গ্রাহকদের উপর মাঠপর্যায়ে জরিপ পরিচালনা করে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। সুদমুক্ত পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে ইসলামি ব্যাংকগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ নির্দেশকগুলোর অবস্থা উন্নত করতে যেমন সহায়তা করছে তেমনি পরোক্ষ নির্দেশকগুলোর অবস্থার মানোন্নয়নেও ভূমিকা পালনে করছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবিধ উপাদানসমূহও ইসলামি ব্যাংকগুলোর সুদমুক্ত কার্যাবলির সুফল দ্বারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

২১. মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং

প্রথম পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকসমূহের উপর প্রচলিত ও সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর অবস্থানগত পার্থক্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রভাব পর্যালোচনা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রসারে সুপারিশমালা

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং

প্রথম পরিচ্ছেদ
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকসমূহের উপর প্রচলিত ও সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর অবস্থানগত পার্থক্য

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা পাশাপাশি থেকে কাজ করছে। তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রচলিত এবং ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাঝে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তবে বাহ্যিক পার্থক্য না দেখা গেলেও পদ্ধতিগত দিক থেকে প্রচলিত এবং ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাঝে মূল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। লেনদেনের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে লেনদেনের বাহ্যিক ফলাফল একই রকম মনে হয়। কিন্তু উভয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুদূর প্রসারী প্রভাব ভিন্ন। তার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে পার্থক্য বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত এবং ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উভয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব ভিন্ন।

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে পার্থক্য : প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি অন্যতম নির্ধারক।[১] প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে প্রাকৃতিক মূলধনও বলা যেতে পারে। কারণ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদও একটি উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারণা থেকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ বা মূলধনের উপর বিনিয়োগ করা হয় কেবল বর্তমান লাভের কথা মাথায় রেখে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, সুদূর ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক মূলধনসমূহ ব্যবহার করে কিভাবে লাভবান হতে পারে সে কথা মাথায় রাখা হয় না।

অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ইসলামি অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। ইসলামি অর্থনীতির নিয়মানুযায়ী সম্পদকে উৎপাদনের কাজে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যার সুফল বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সমানভাবে ভোগ করতে পারে।[২] ইসলামি অর্থনীতি একটি কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তাই বর্তমান প্রজন্মের কোন অধিকার নেই প্রাকৃতিক সম্পদকে এমনভাবে অপব্যবহার করার যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাছাড়া, ইসলামি অর্থনীতি মহান আল্লাহকে সম্পদের প্রকৃত মালিক হিসেবে গণ্য করে এবং মানুষকে আল্লাহর সম্পদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে থাকে। তাই যেখানে সম্পদের মালিকানাই মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না সেখানে অপচয়ের অধিকারের প্রশ্নও আসে না।[৩]

---

১. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি* (ঢাকা : সুদিপ্ত পাবলিকেশন্স, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ১২
২. কামরুজ্জামান বিন আবদুল বারী, ইসলামে সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত, *মাসিক আত-তাহরিক*, মার্চ, ২০২০ খ্রি., দ্র. www.at-tahreek.com, visited on 15.01.2023 AD
৩. Heriyati Chrisna & Others, *Production Factors from the Perspectives of Islamic and Conventional Economic* (New Delhi : International Journal of Research and Review, May 2020 AD), p. 355

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক মূলধনের মাধ্যমে উৎপাদনের জন্য ব্যাংক ঋণ প্রদান করতে পারে।[৪] কিন্তু উৎপাদনের প্রকৃত অবস্থা তদারকি করা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্দেশ্য না। কারণ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক শুধুমাত্র ঋণের বিপরীতে সুদ ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে কি না এবং তা থেকে ব্যাংক নিজে লাভবান হচ্ছে কি না সেটাই বিবেচনা করে। সেক্ষেত্রে, প্রকৃত অর্থে কতটুকু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলো তা ব্যাংকের ধর্তব্য নয়। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঋণের বদলে বিনিয়োগমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। সেক্ষেত্রে অংশীদার হিসেবেও বিনিয়োগ করতে পারে অথবা সাহিবুল মাল হিসেবেও বিনিয়োগ করতে পারে। যেভাবেই বিনিয়োগ করুক না কেন ইসলামি ব্যাংকের গুরুদায়িত্ব হলো যে কাজের জন্য প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ করা হচ্ছে তা যথাযথভাবে সম্পাদন হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমূলক কাজের মাঝে সামঞ্জস্য থাকে। সম্পদের অপব্যবহার এবং জালিয়াতির সুযোগ কম থাকে।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পার্থক্য : একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান চালিকাশক্তি সে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা তাই বর্তমান যুগে একটি বহুল প্রচলিত ধারণা। বর্তমানে যে-কোনো প্রতিষ্ঠানই শুধুমাত্র মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বিশাল পরিমাণের বাজেট বরাদ্দ রাখে। আর দক্ষ জনবল বা মানবসম্পদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিরও একটি উপাদান।[৫] তবে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এবং ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মানবসম্পদ বলতে মেধা, দক্ষতা এবং জ্ঞানের সমন্বয়কে বুঝানো হয়। আর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী থেকে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে যোগ্য কর্মী বাছাই করা এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের মেধা, দক্ষতা এবং জ্ঞানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নকে বুঝানো হয়।[৬] বাহ্যিকভাবে প্রচলিত মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামি মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার তেমন পার্থক্য নেই। কিন্তু মূল পার্থক্যটা ধারণাগত দিক থেকে বিদ্যমান।

প্রচলিত মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কর্মীর পার্থিব শিক্ষা, বিষয়গত ধারণা এবং এককভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাজে কর্মীর দক্ষতাকে পরিমাপ করে বাছাই করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একজন কর্মী শুধুমাত্র সে প্রতিষ্ঠানের জন্য কতটুকু শ্রম দিতে পারে, কাঙ্ক্ষিত পদবির জন্য কতটুকু উপযুক্ত এবং তাকে দিয়ে প্রতিষ্ঠান এককভাবে কতটুকু লাভবান হবে সে বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে কর্মী নির্বাচন করা হয়। সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক থাকা বা না থাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের চিন্তার কারণ নেই। এ ধরনের কর্মী যখন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে নিজেও দুনিয়ার জীবনের ব্যাপারে বেশি সচেতন থাকে। পার্থিব উপার্জন এবং ভোগ বিলাসিতাই তার কাজের মূল উদ্দেশ্য। এখানেই প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাঝে পার্থক্য দেখা যায়।

---

৪. Suborno Barua, *Principles of Green Banking: Managing Environmental Risk and Sustainability*(Berlin : De Gruyter, 2020 AD), p. 51

৫. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৬. David A. Decenzo, *Fundamentals of Human Resource Management*(New York : John Wiley & Sons Inc., 2015 AD), p. 29

ইসলামি ব্যাংকসমূহ কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পার্থিব শিক্ষার পাশাপাশি প্রার্থীর কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞানও যাচাই করে। কারণ ইসলামি ব্যাংকিং পরিবেশে কাজ করতে হলে এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্ম সম্পাদন করতে হলে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান না থাকলে পৃথকভাবে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রকৃত উদ্দেশ্যই কখনো বাস্তবায়িত হবে না।[৭] একজন প্রার্থীর যদি কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকে তাহলে সে বিশ্বাস করে যে, তার উপার্জনের ফলাফল পরকালেও ভোগ করতে হবে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি বিশেষায়িত ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে কর্মী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নের কর্মপদ্ধতিও ভিন্ন। কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই কুরআন এবং হাদিসের ব্যাপারে জ্ঞানকে পরীক্ষা করা হয়। সে সাথে বিষয় ভিত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও যাচাই করা হয়। কর্মী নির্বাচনের পর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ হিসেবে ইসলামি অর্থনীতির ধারণা, উদ্দেশ্য এবং ব্যাংকিং খাতেও ইসলামি অর্থনীতি প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। এক্ষেত্রে একজন কর্মীর সম্পূর্ণ কর্মজীবন জুড়ে ইসলামি অর্থনীতির চর্চার মাধ্যমে এ বিষয়ে উত্তরোত্তর দক্ষতা অর্জিত হয়।

ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কর্মী ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করলে স্বাভাবিকভাবেই তার মাধ্যমে ব্যাংক তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এ ধরনের কর্মী নিজের উপার্জন দ্বারা যেমন পার্থিব উদ্দেশ্যও পূরণ করে ঠিক তেমনি সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টিও অর্জন করে। ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো ব্যাংকিং কার্যাবলি দ্বারা সামাজিক কল্যাণ সাধন। ইসলামি অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতিগুলো এমনভাবেই সম্পাদিত হয় যাতে সর্বস্তরের জনগণ উপকৃত হয়। যখন সর্বস্তরের কল্যাণ সাধিত হয় তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই অর্জিত হয়।

মূলধন গঠনে পার্থক্য : মূলধন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[৮] মূলধন গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাঝে একটা বিশাল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় উভয় প্রকার ব্যাংকই গ্রাহকদের ঋণ সরবরাহ করে তাদের বিনিয়োগের জন্য মূলধন সরবরাহ করছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি একটু ভিন্ন। গ্রাহকদের কাছে সরবরাহকৃত মূলধন প্রচলিত ব্যাংকগুলো ঋণ হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকগুলো সরবরাহকৃত মূলধনকে বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করে।[৯] প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহকদের সাথে ব্যাংকের দেনাদার-পাওনাদার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহকদের সাথে ব্যাংকের অংশীদারি সম্পর্ক অথবা সাহিবুল মাল-মুদারিব সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১০]

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো তিন ধরনের ঋণ প্রদান করে থাকে।[১১] যেমন, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহকদের অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়া হয় যা স্বল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে এবং উত্তোলনকৃত অর্থ পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট সুদ পরিশোধ করতে হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়

---

৭. Muhammad Junaid Nadvi & Zubair Bin Junaid, *Comparison of Modern and Islamic HRM : Impact of IHRM on Organizational Commitment [A Survey among Employees of Islamic Banks in Pakistan]*(.: Qudus International Journal of Islamic Studies, August, 2017 AD), 5:2, pp. 67-75

৮. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৯. Abdelrahman Elzahi Saaid Ali & Others (ed.), *Enhancing Financial Inclusion Through Islamic Finance* (Switzerland : Palgrave Macmillan, 2020 AD), vol. 2, p. 23

১০. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৮৪

১১. Abdul Awwal Sarker, *Islamic Banking in Bangladesh : Achievements & Challenges*(Dhaka : Islami Banking Training and Research Academy, 2013 AD), 1:1, p. 2

ব্যাংকগুলো উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধনের ঘাটতি পূরণের জন্য স্বল্প মেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট হারে ব্যাংক সুদ আদায় করে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অথবা স্থায়ী কোন প্রকল্প ক্রয় অথবা সম্প্রসারণের জন্য মধ্যম মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। স্বাভাবিকভাবে এসব ক্ষেত্রেও ঋণের বিপরীতে গ্রাহকরা ব্যাংককে সুদ প্রদান করে থাকে। উক্ত সকল ক্ষেত্রেই ব্যাংক গ্রাহকের সাথে দেনাদার-পাওনাদার সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

ইসলামি ব্যাংকগুলো এসব ক্ষেত্রে কিছু ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকে। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন ইসলামি শারি'আহ সম্মত নয় বিধায় ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রচলিত পদ্ধতিতে এ সুবিধা প্রদান করে না। যেসব ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা হয় তাও বিতর্কিত। ইসলামি ব্যাংকের কাছে যখন কোন গ্রাহক কোন নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা চায় তখন সরাসরি গ্রাহকের হাতে অর্থ তুলে দেয়ার পরিবর্তে ব্যাংক নিজেই সে পণ্য গ্রাহকের হয়ে কিনে দেয়।[১২] এক্ষেত্রে অর্থ হস্তান্তর হয় না; বরং পণ্য হস্তান্তর হয়। আর ছোটখাটো কেনাকাটার জন্য ডেবিট কার্ড ইস্যু করা হয়।

স্বল্পমেয়াদি চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্যও ইসলামি ব্যাংকিং-এর পৃথক পদ্ধতি রয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠান যখন ইসলামি ব্যাংকিং-এর দ্বারস্থ হয় তখন সে প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের কাছে মূলধন গ্রহনের উদ্দেশ্য, বাস্তবায়নের পদ্ধতি এবং আসলেই সে মূলধন কোন কোন খাতে কিভাবে ব্যয় করা হবে তার বিশদ বিবরণ পেশ করতে হয়। ব্যাংকের কাছে বিনিয়োগটি ফলপ্রসূ মনে হলে ব্যাংক এক্ষেত্রে মুরাবাহা বিনিয়োগ করতে পারে। আবার দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের পরিবর্তে ইসলামি ব্যাংকগুলো মুদারাবা, মুশারাকা বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেই ব্যাংক নিজে ঐ প্রকল্প যাচাই বাছাই করে প্রকল্পের অভ্যন্তরীন কার্যপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করে যা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় করা হয় না।[১৩] প্রচলিত ব্যাংকগুলো ঋণের সুদ গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু গ্রাহকের ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য সাধন হলো কি না তা ব্যাংকের দেখার বিষয় না। অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকগুলো নিজেরাই মূলধনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কার্যপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করে। তাই মূলধন গঠন ফলপ্রসূ হয় এবং তা আক্ষরিক অর্থে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

উদ্যোক্তা গঠনে পার্থক্য : অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।[১৪] প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যখন কোন উদ্যোক্তা ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করানোর চিন্তার সাথে সাথে ঋণের বোঝাও তার মাথায় যোগ হয়। তার উপর বন্ধকজনিত জটিলতা তো আছেই। ব্যবসার সফলতার চেয়েও ঋণের সুদ প্রদান করা উদ্যোক্তার কাছে বেশি কষ্টদায়ক হয়ে যায়। ব্যবসা সফল না হলেও সুদসহ ঋণ ঠিকই ফেরত দিতে হয়। ঋণ প্রদানে বিফলতায় আইনগত সমস্যা ও ভোগান্তিতে পড়ার ব্যাপারটা তখন উদ্যোক্তাকে বেশি চিন্তিত করে। তাছাড়া অনেক সময় প্রচলিত ব্যাংকগুলো একদম নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতেও চায় না। কারণ, ঋণের সুদ প্রদানের সক্ষমতাকেই প্রচলিত ব্যাংকিং-এ ঋণ প্রদানের মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয়।[১৫]

---

১২. Manzoor K. P., *Islamic Banking and Finance in India: Opportunities and Challenges*(Dhaka : Islamic Bank Training and Research Academy, March 2013 AD), 9:1, p. 114

১৩. Muhammad Hanif, *Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking*(Online : International Journal of Business and Social Science, February 2011 AD), 2:2, pp. 169-170

১৪. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১৫. Rajendra Parsad and A. Ramgutty, *Micro-credit in Conventional Banking : Would Islamic Banking be the Golden Age for Entrepreneurs?- The Mauritius Case Study*(. : Journal of Social and Development Science, Marche 2014 AD), 5:1, p. 20

ফলে উদ্যোক্তারা ইচ্ছা করলেও নিজেরা নিজেদের কর্মসংস্থান করে নিতে পারে না। এসব দিক চিন্তা করে বলা চলে অনেক প্রতিভাবান উদ্যোক্তা ঝামেলা এড়িয়ে চলার জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে এক রকম ভয়ই পায়।

অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকিং এসব ঝামেলা থেকে গ্রাহকদের অনেকাংশেই নিষ্কৃতি দেয়। যেমন, ইসলামি ব্যাংকগুলো মূলত বিনিয়োগমূলক লেনদেন করে থাকে।[১৬] এ ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক সাহিবুল মাল হিসেবে উদ্যোক্তাকে মূলধনের যোগান দেয়। উদ্যোক্তা মুদারিব হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করে। এখানে ঋণের সুদ আদায় মূল উদ্দেশ্য না। লাভ-ক্ষতি বণ্টন করে নেয়া মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ব্যবসায় ক্ষতি হলেও ব্যাংক সেখানে অংশীদার হবে। এখানে ব্যবসাটা হালাল কি না, ব্যবসার পরিকল্পনার সাথে বাস্তবায়নের সামঞ্জস্য আছে কি না এ বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[১৭] ঋণের সুদ প্রদানের সক্ষমতা এখানে দেখা হয় না যেহেতু ইসলামি ব্যাংকিং-এ সুদ থাকে না।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সহায়তায় পার্থক্য : ব্যাংকিং প্রযুক্তি ৪টা উপাদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এদেরকে একসাথে Core 'C's of Banking Technology বলা হয়। উপাদানগুলো হলো- Community, communication, collaboration আর commerce.[১৮] Community বলতে সমমনা গ্রাহকদের সমন্বয়ে একই রকম উৎস থেকে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকে বুঝায়। Communication বলতে সমমনা গ্রাহকগণের সাথে তাদের পছন্দসই উৎস থেকে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সে খাতের পেশাজীবীদের সাথে যোগাযোগকে বুঝায়। Collaboration বলতে সমমনা গ্রাহকদের সেবা প্রদান এবং সে খাতের পেশাজীবীদের নিকট থেকে তাদের সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধনকে বুঝায়। আর Commerce বলতে উভয় পক্ষের মেলবন্ধনের ফলে যে বাণিজ্যিক কাজ সম্পাদিত হয় তাকে বুঝায়।

প্রচলিত ব্যাংকিং এবং ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রযুক্তির প্রয়োগে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কিছু পরোক্ষ পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, প্রচলিত ব্যাংকিং-এর সেবা নেয়ার জন্য তারাই একত্রিত হবে যাদের ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা নেই অথবা থাকলেও তারা প্রচলিত এবং ইসলামি ব্যাংকিং-এর মধ্যকার পার্থক্যটা অনুধাবন করতে পারে না। তারা পার্থক্যটা অনুধাবনই করতে পারে না বলে সেবা গ্রহণের জন্য প্রচলিত ব্যাংকিং-এর সুদভিত্তিক পদ্ধতিকে বাছাই করে এবং সেখানকার পেশাজীবী ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হয়। গ্রাহক এবং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবী কর্মী উভয় পক্ষের মেলবন্ধনে একটি হারাম সুদি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলাফল হিসেবে ব্যবসাও আর হালাল থাকে না। এ ক্ষেত্রে কোন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হলে তাও হারাম কাজেই প্রয়োগ করা হচ্ছে।[১৯] আর বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত ব্যাংকিং সেবা একই রকম হয়ে থাকে এবং সেবাগুলোর পিছনে সুদই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটালেও ফলাফল উভয় পক্ষের সুদি লেনদেনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে।[২০]

---

১৬. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি*(ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৯১

১৭. S. M. Ali. Akkas & Others (ed.), *Text Book on Islamic Banking*(Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, 2008 AD), p. 176

১৮. Bank Negara Malaysia, *Technology and Innovation in Islamic Banking*(Kuala Lumpur : Malaysia International Islamic Finance Centre, March, 2015 AD), p. 2

১৯. Islamic Development Bank, *Innovations in Islamic Finance : Case Studies from Malaysia & Indonesia* (Jeddah : Publication Department, 2022 AD), p. 12

২০. Bernardo Nicoletti, *The Future of Fintech : Integrating Finance and Technology in Financial Services* (Switzerland : Palgrave Macmillan, 2017 AD), p. 3

অপরদিকে, শারি'আহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল গ্রাহকগণই ইসলামি ব্যাংকিং-এর সেবা নেয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ শারি'আহ সমর্থিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবীদের সাথেই যোগাযোগ করেন। ইসলামি ব্যাংকিং পেশাজীবীগণও গ্রাহকগণকে উৎসাহ দেন ইসলামি বিনিয়োগের ব্যাপারে। ফলে উভয়পক্ষের মেলবন্ধনে একটি হালাল চুক্তি সম্পন্ন হয় যার মাঝে সুদের কোন অস্তিত্বই থাকে না। ফলে সে ক্ষেত্রে কোন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হলে তা হালাল কাজেই প্রয়োগ করা হয়।[২১] ইসলামি ব্যাংকিং যেহেতু বিশেষায়িত ব্যাংক, তাই এর পিছনে সর্বক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসেবে সুদকে গণ্য করলে চলে না। কারণ সুদ তো এখানে ধর্তব্য বিষয়ই না; বরং সুদকে পাশ কাটিয়ে কিভাবে শারি'আহসম্মত লেনদেন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র আবিষ্কার করা যায় সে জন্য ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রচুর গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কাজ করতে হয়।[২২] যে খাতে যত বেশি গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কাজ হয় সে খাতে প্রযুক্তিগত উন্নতি ফলপ্রসূ হয়। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে ইসলামি ব্যাংকিং খাতে প্রচলিত ব্যাংকিং খাতের তুলনায় বেশি উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ সুগম করতে সক্ষম।[২৩]

শ্রম বিভাগ এবং মাত্রাগত উৎপাদনে অবদানে পার্থক্য : শ্রম বিভাগ ও মাত্রাগত উৎপাদন উৎপাদনশীল এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ও সেবাদান প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। আর উৎপাদন ও সেবাদান কার্যক্রম বৃদ্ধি পেলে, তা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।[২৪] শ্রম বিভাগ[২৫] এবং মাত্রাগত উৎপাদনের[২৬] দিক থেকে প্রচলিত ব্যাংকিং এবং ইসলামি ব্যাংকিং-এর মাঝে প্রত্যক্ষভাবে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা না গেলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বহুদিক থেকে এ বিষয়ে প্রচলিত ব্যাংক এবং ইসলামি ব্যাংকের মাঝে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে একইভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আর প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ প্রদান নির্ভর করে ঋণ গ্রহীতার ঋণ এবং সুদ পরিশোধের ক্ষমতার উপর। আবার ঋণের বিপরীতে বন্ধকের বাধ্যবাধকতাও থাকে। ঋণের সুদ প্রদান এবং সম্পদ বন্ধক রাখার ক্ষমতা সকল শ্রেণির মানুষের থাকে না। তাই সকল শ্রেণির লোক এ ব্যাংকিং সেবার আওতায় আসেও না। সে জন্য প্রচলিত ব্যাংক ইচ্ছা করলেই সব জায়গায় শাখা স্থাপন করতে পারে না। কারণ সুদি কর্মকাণ্ডের সুবিধা নিতে অনাগ্রহী জনগোষ্ঠীর এলাকাসমূহে শাখা খোলা প্রচলিত ব্যাংকের জন্য লাভজনক না। ফলে প্রচলিত ব্যাংকের কার্যাবলি

---

২১. Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic Fintech : Insights and Solutions*(Switzerland : Palgrave Macmillan, 2021 AD), p. 3

২২. Ismail Ali Ahmed, *Islamic Banking Growth, Role of Information Technology in Cost Optimization and Operational Excellence*(New York : Social Science Research Network, September, 2013 AD), p. 2

২৩. Dr. Islamil Ali Ahmad, *Technology Boosts Islamic Finance; ITS Provides Solutions*, see. www.worldfinance.com, published on 03.03.2014, visited on 14.01.2023 AD

২৪. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২৫. 'শ্রম বিভাগ বলতে বুঝায় কোন নির্দিষ্ট কাজের সম্পূর্ণ অংশ সম্পাদনের দায়িত্ব একই কর্মীর হাতে না দিয়ে সে কাজটিকে বেশ কিছু অংশে বিভক্ত করে এককেটি অংশ সম্পাদনের কাজ একেকজনের মাঝে বণ্টন করে দেয়াকে শ্রম বিভাগ বলে।'
দ্র. Waleed El-Ansary, *Economic Health, Division of Labor and the Three Dimensions of Islam*(Virginia : International Institute of Islamic Thoughts, 2020 AD), pp. 42-46

২৬. 'মাত্রাগত উৎপাদন বলতে বুঝায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর মাঝে কোন বর্ধন এবং সংযাজন করে এককপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।' দ্র. Heriyati Chrisna & Others, *Production Factors from the Perspective of Islamic and Conventional Economic*, ibid, p. 355

কতিপয় নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বৃহৎ পরিসরে জনবল নিয়োগ করতে পারে না। ফলে শ্রম বিভাগ ও মাত্রাগত উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী সহজলভ্য থাকে না।

অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো সর্বস্তরের জনগণকে ব্যাংকিং-এর আওতায় এনে তাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কল্যাণমূলক আর্থিক কার্যাবলির অধীনে নিয়ে আসা। ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগের পূর্বে মুনাফার চেয়েও প্রকল্পের বাস্তবায়নযোগ্যতার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। তাই প্রকল্প সম্পাদনের যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোনো উদ্যোক্তাই বিনিয়োগের জন্য ইসলামি ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে পারে। এভাবে ইসলামি ব্যাংকিং-এর পক্ষে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শাখা প্রতিস্থাপন সম্ভব। আবার, সাম্প্রতিককালে ইসলামি ব্যাংকগুলো অতি প্রয়োজনীয় এবং নিয়মিত ব্যাংকিং কাজকে সহজ করার জন্য এলাকাপ্রতি উপশাখাও স্থাপন করছে। যেমন : বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাঝে সবচেয়ে বেশি শাখা (৩৮৯ টি) স্থাপন করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।[২৭] আবার ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় অধিক জনবল নিয়োগে সক্ষম।[২৮]

তাছাড়া ইসলামি ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে। তাতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিচিত্র রকম সেবার সাথে সাথে বিচিত্র রকম গ্রাহকসেবাও দিতে হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন অধিক জনবল নিয়োগ দিতে হচ্ছে, তেমনি বর্ধিত জনবলকে বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণও দিতে হচ্ছে। তাতে সম্পূর্ণ সেবাপ্রদানমূলক কাজটি বেশ কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সেবা প্রদানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ জনবল কাজ করছে। ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিনিয়ত অধিক পরিমাণ লোককে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এতে করে শ্রম বিভাগ এবং মাত্রাগত উৎপাদন সহজ হচ্ছে।

অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে ভূমিকায় পার্থক্য : প্রচলিত সুদি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সময়ের মূল্যের ভিত্তিতে সুদের হার ধার্য করা হয়।[২৯] এর পিছনে বাস্তবিক অর্থে কোন সম্পদ থাকে না। সুদের হারের সম্পূর্ণ টাকাই বিনিময়হীন অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হয়। ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রকল্প অর্থায়নের বাজেটের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেয়। আর সুদের অর্থ বিনিময়হীন অতিরিক্ত সম্পদ এবং এর পিছনে কোন পণ্য, সেবা এবং সম্পদের অস্তিত্ব থাকে না বলে এ অর্থ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি ঘটে। ফলে পণ্য ও সেবা ধীরে ধীরে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, মুদ্রার মান কমতে থাকে, পণ্য ও সেবার মজুতদারিতা বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পণ্য এবং সেবার বিনিময় থেকে প্রাপ্ত মুনাফাকে ব্যাংকের আয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের বিপরীতে নির্ধারিত পণ্য, সেবা বা সম্পদ থাকে। তাই অর্থায়নে বাজেটের ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য থাকে। আবার আর্থিক লেনদেনের বিপরীতে পণ্য ও সেবা ধার্য করা থাকে বলে বিনিময়হীন অতিরিক্ত অর্থেরও অস্তিত্ব থাকে না।[৩০] ফলে মুদ্রাস্ফীতিও ঘটে না। আর্থিক কাঠামোতে সচ্ছলতা বিরাজ করে।

---

২৭. Bangladesh Bank, *Developments of Islamic Banking System in Bangladesh*(Dhaka : Research Department, September 2022 AD), p. 2

২৮. ibid, p. 3

২৯. Marjan Muhammad & Mezbah Uddin Ahmed (ed.), *Islamic Financial System: Principles & Operations* (Kuala Lumpur : International Shariah Research Academy for Islamic Finance, 2015 AD), p. 90

৩০. S.M. Ali. Akkas & Others (ed.), *Text Book on Islamic Banking*, ibid, p. 73

সামাজিক উপাদানসমূহের উপর প্রভাবগত পার্থক্য : প্রচলিত ব্যাংকিং-এর যাত্রালগ্ন থেকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল সুদি লেনদেন থেকে ব্যবসায়িক লাভ। সে সময় মহাজনরা অধিক লাভ অর্জনের আশায় সুদের কারবার করত। সে সময়ও এ সুদের ব্যবসায়ীদের সমাজে সকলেই ভয় পেত। কারণ, সুদ আদায় করার জন্য এমন কোন নিচু আচরণ নেই যা তারা করত না। সামাজিকভাবে ত্রাসের কারণ হয়ে বিরাজ করা আর্থিক লেনদেনের প্রাতিষ্ঠানিকরূপ হিসেবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হলে তার পিছনে কখনো সামাজিক কল্যাণ থাকতে পারে না। আমানতের টাকা কোথা থেকে আসছে, আর বিনিয়োগ কোন খাতে হচ্ছে তা শারি'আহ দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই-বাছাই না করে কেবলমাত্র ঋণ এবং ঋণের সুদ পরিশোধের সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে অর্থের লেনদেন কখনো সামাজিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।[৩১] আর ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুদি ব্যাংক সামাজিক কল্যাণমূলক পণ্য এবং সেবাকে বিবেচনা করে না। অর্থাৎ, তাদের বিনিয়োগ খাতে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা সমাজের ক্ষতি করল নাকি উপকার করল তা সুদি ব্যাংকের বিবেচনায় আসে না।

অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকিং ধারণার বীজ বপন হয় মহানবী সা.-এর যুগ থেকেই।[৩২] তাঁর যুগেই সুদ নিষিদ্ধ হয়ে সুদের বিকল্প ব্যবস্থায় শারি'আহসম্মত পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হতে থাকে। ইসলামি ব্যাংক ঠিক এমন খাতে বিনিয়োগ করে যা থেকে সবচেয়ে বেশি সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়।[৩৩] শারি'আহর দৃষ্টিতে হারাম পণ্যের ব্যবসায় ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগ করে না। আর ইসলামি ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র ব্যাংকিং-এর মাঝেই নিজেদের অবদান সীমাবদ্ধ রাখেনি। হাসপাতাল নির্মাণ, যাকাত প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য স্কিম তৈরি, স্কুল-কলেজ, মাদ্‌রাসা, এতিমখানা স্থাপন, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে সমাজে সুবিচার এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যও কাজ করেছে।

রাজনৈতিক উপাদানসমূহের উপর প্রভাবগত পার্থক্য : কোন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।[৩৪] প্রচলিত ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদে ইদানিং বেশ রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে অনেক সময় নতুন ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে নেয় অনেক দলীয় নেতাগণ। তখন তাদের সূত্র ধরেই অনেকে সেসব ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। অনেক সময় এসব ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। ঋণ নিয়ে তা কোন খাতে খরচ করল তার কোন খবর ব্যাংকের কাছে থাকে না। বন্ধক হিসেবে যে সম্পদ ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত থাকে তা থেকে যদি ব্যাংক ঋণ আদায় করেও নেয় তাতে ব্যবসায়ীর কিছু যায় আসে না। কারণ, হয়ত অনুৎপাদনশীল কোন সম্পদকেই বন্ধক রাখা হয়েছিল। সুতরাং, সে সম্পদ বিয়োগে ঋণ গ্রহীতার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকিং-এর পরিচালনা পর্ষদে ব্যাংকিং কাজে দক্ষ, ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে বিজ্ঞ এবং শারি'আহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তিদের প্রভাব থাকে।[৩৫] তখন শারি'আহ অসমর্থিত কোন খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ থাকে না। আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যাংকের

---

৩১. ড. মাহফুজুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৮

৩২. Yahia Abdul- Rahman, *The Art of Islamic Banking : Tools & Techniques for Community-Based Banking*(New Jersey : John Wiley & Sons, Inc, 2010 AD), p. 31

৩৩. মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*(ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২২১

৩৪. মনোরঞ্জন দে ও দিলীপ কুমার বল, *উন্নয়ন অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩৫. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

অংশগ্রহণ থাকে বলে কেউ ইচ্ছা করলেও ভিত্তিহীনভাবে ঋণ নিতে পারে না। বরং, বিনিয়োগকৃত প্রকল্পটি কেমন, প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা কেমন সেসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করা ইসলামি ব্যাংকেরই গুরুদায়িত্ব। এক্ষেত্রে আসলে স্বজনপ্রীতির খুব একটা সুযোগ থাকে না।[৩৬]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবিধ উপাদানে প্রভাবগত পার্থক্য : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশক ছাড়াও আরও বিবিধ কিছু উপাদান রয়েছে যার উপর সুদ বিরূপ প্রভাব ফেলে। সুদের বিরূপ প্রভাবের ফলে সে খাতগুলো ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়ই, সে সাথে দেশের সার্বিক অর্থব্যবস্থার উন্নতিও ব্যাহত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবিধ উপাদানগুলোর উপর সুদের নেতিবাচক প্রভাবগুলো নিম্নরূপ :

(ক) **শিল্পায়নে ভূমিকা :** যেহেতু প্রচলিত ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়ার সময় গ্রাহকের ব্যক্তিগত সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে দেয় সেহেতু ঋণ নেয়ার পর গ্রাহক ঋণের কতটুকু অংশ প্রকল্পের কাজে ব্যয় করল তার কোন হিসাব ব্যাংক রাখে না। ফলে যদি ঋণের অর্থ যথার্থভাবে প্রকল্পের কাজে না লাগে তাহলে সে প্রকল্প থেকে যতটুকু উপকার শিল্পখাতে হওয়ার কথা ছিল তা হয় না। সুতরাং, সে ঋণের বিপরীতে দেশের শিল্পখাতে কোন ব্যয় হয় না। ফলে অর্থ ব্যয়ের কোন হদিসও পাওয়া যায় না।

অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকিং প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজের ধরন বিবেচনা করে। ফলে ইসলামি ব্যাংকিং অনুৎপাদনশীল এবং হারাম কোন খাতে বিনিয়োগ করে না।[৩৭] অনুন্নত এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে বাস্তবিক অর্থেই যাতে কাজ সম্পাদিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখে। বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকগুলো গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, ষ্টিল, ফার্মাসিউটিক্যাল, বিদ্যুৎ খাত, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রভৃতি বড় বড় খাতে বিনিয়োগ করে যা দেশের মোট বিনিয়োগের এক-চতুর্থাংশ।[৩৮]

(খ) কৃষি খাতে ভূমিকায় পার্থক্য : প্রচলিত ব্যাংক কৃষিখাতে উন্নয়নের জন্য ঋণ দেয় সুদের ভিত্তিতে। সুদ ফেরত দেয়া দরিদ্র কৃষকদের জন্য শুধু কষ্টকরই না, অনেক ক্ষেত্রে দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর প্রচলিত ব্যাংকিং-এ কৃষকরা ঋণ নিলেই ব্যাংকের কাজ শেষ। ঋণ কিভাবে কাজে লাগাবে তা নিয়ে ব্যাংকের কোন দায়িত্ব নেই। ইসলামি ব্যাংকগুলো কৃষকের প্রয়োজন অনুযায়ী সালাম, মুরাবাহা, মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করে দেয়। কৃষকরা ব্যাংকের কাছ থেকে কেবলমাত্র পণ্যগুলো গ্রহণ করে, কোন অর্থ গ্রহণ করে না। আবার, ইসলামি ব্যাংক সালাম পদ্ধতিতে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ক্রয় করে তা বিক্রয় করতে সহায়তা করে। আবার, প্রয়োজনে কৃষকদের পরামর্শও প্রদান করে থাকে। ফলে কৃষি খাতে উপকার সাধিত হয়, বিনিয়োগও কাজে লাগে।[৩৯]

(গ) বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভূমিকায় পার্থক্য : প্রচলিত ব্যাংকের বিনিয়োগ থেকে কেবল ব্যাংক নিজে এবং ঋণ গ্রহীতা উপকৃত হয়। আর এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক লাভের বিষয়টাই জড়িত থাকে। সুদি ব্যাংকে সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত থাকে। বাস্তব মুনাফার সাথে পূর্ব নির্ধারিত হারের তারতম্যের জন্য বিনিয়োগ কাজ ব্যাহত হয়। অপরদিকে, ইসলামি ব্যাংকিং সুদূর প্রসারী সামাজিক কল্যাণে বিশ্বাসী। এ ব্যবস্থায় জনগণ উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। এক্ষেত্রে উন্নয়ন কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য না; বরং

---

৩৬. M. Kabir Hassan & Others, *Political Systems and the Financial Soundness of Islamic Banks*(Journal of Financial Stability, August 2017 AD), 31: 1, p. 2

৩৭. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব • প্রয়োগ • পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩৮. Shafiqur Rahman and Nicholas McDonald, *Economic Development of Bangladesh : The Role of IBBL, IIUC Studies 9* (December 2012 AD) : 330

৩৯. Muhammad Hanif, *Difference and similarities in Islamic and Conventional Banking*, p. 171

সমাজের সকল জনগণের জন্য। বিনিয়োগ থেকে যাতে সমাজের সকল শ্রেণির লোক উপকার পায় এবং আয়ের সুষম বণ্টন হয় ইসলামি ব্যাংকিং সে লক্ষ্যেই কাজ করে। এক্ষেত্রে সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত থাকে না। বাস্তবে যা ঘটে তাই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই সঠিক বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা নির্ধারণ করা যায়।[৪০]

(ঘ) দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকায় পার্থক্য : আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ কখনো সীমিত হতে পারে না। সম্পদ যখন কোন একটা গোষ্ঠী কুক্ষিগত করে নেয় তখন অন্য শ্রেণির হাতে যেটুকু সম্পদ থাকা প্রয়োজন তা থাকে না; তখনই বৈষম্য সৃষ্টি হয়। একচেটিয়া পুঁজির যোগানদাতা এবং সুদের ব্যবসা প্রচলিত ব্যাংকের অধীনেই হয়ে থাকে। এতে সকল সম্পদ সুদ প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির হাতে চলে যায়। আর যারা সম্ভাবনাময় প্রকল্প হাতে নিয়েও বিনিয়োগের অভাবে কাজ করতে পারে না, তারা পিছনে পড়ে থাকে। এভাবে সম্পদের সুষম বণ্টন হচ্ছে না; বেকারত্ব বাড়ছে; দারিদ্র্য প্রকট হচ্ছে। ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা সুদকে বিলুপ্ত করে আয়ের বৈষম্যরোধ করে, যাকাত নিশ্চিত করে, বিনিয়োগ যথার্থভাবে ব্যবহার করে অধিকার অনুযায়ী সম্পদের বণ্টন তো করছেই সে সাথে বিশ্ববাসীকে প্রকৃত উন্নয়নের দিকে নির্দেশ করছে।

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্যে পার্থক্য : প্রচলিত ব্যাংকগুলো নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে ক্রেডিট ওয়ারেন্টি প্রদান করে থাকে। আবার আমদানিকারক দেশের বাইরে বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু বিলম্বের কারণে আমদানিকারকের নিকট থেকে ফি নেয় যা রিবার অন্তর্ভুক্ত। আর প্রচলিত ব্যাংকিং-এ প্রয়োজনে ব্যাংক গ্রাহকের হয়ে মূল্য পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু পণ্যের মালিকানা ব্যাংকের নামে আসে না। ফলে প্রচলিত ব্যাংকের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিতে পণ্যটি ব্যাংকের মালিকানায় দেখানো হয় না। অপরদিকে ইসলামি ব্যাংকিং-এ মূল্য পরিশোধে বিলম্বের জন্য ব্যাংক ক্রেতার কাছ থেকে সুদ নিতে পারে না। ব্যাংক নিজে আগে মূল্য পরিশোধ করে পণ্য ক্রয় করে। তারপর তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রেতার কাছে আবার বিক্রয় করে। ফলে সুদের পরিবর্তে ব্যাংকের মুনাফা অর্জিত হয়।

(চ) কর্মসংস্থানে ভূমিকায় পার্থক্য : প্রচলিত ব্যাংকের কাজ সর্বত্রই এক রকম। আবার প্রচলিত ব্যাংক যখন ঋণ দেয় তখন সুদেরভিত্তিতে দেয়ায় অনেক সময় সুদের ভয়ে ভাল প্রকল্প হাতে নিয়েও উদ্যোক্তারা ব্যাংকিং সেবা নিতে চায় না। ফলে বেকারত্ব তাদের সঙ্গী হয়। আবার ঋণ নিলেও সঠিক কর্ম পরিকল্পনার অভাবে বাস্তবায়ন করতে হিমশিম খায়। ইসলামি ব্যাংকগুলো মুদারাবা, মুরাবাহা, মুশারাকা প্রভৃতি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে উদ্যোক্তাদের বেকারত্ব দূর করে কাজে যোগদানের স্পৃহা তৈরি করে কর্মহীনভাবে বসে থাকা কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে সাহায্য করে এবং তাদের জমিতে ফসল ফলানোর জন্য উৎসাহ দেয়। নারীদের জন্য পৃথক বিনিয়োগ করে নারীদেরও দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে।

(ছ) বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে পার্থক্য : প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রেমিট্যান্স আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক মুদ্রা বিনিময় থেকে লাভ অর্জন করে। কম দামে মুদ্রা ক্রয় করে তা বেশি দামে বিক্রয় করে। উভয় মূল্যের পার্থক্য ব্যাংকের লাভ হিসেবে গণ্য হয়। আর ইসলামি ব্যাংকিং-এ ব্যাংক এক্সচেঞ্জ হাউজ বা মার্কেট থেকে মুদ্রা বাজারদর অনুযায়ী ক্রয় করে তারপর পরিশোধ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর কাজ করার ভিন্নতার কারণেই সুদমুক্ত ব্যাংকিং দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন অধিক অর্জিত হয়। আর ইসলামি ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত পদ্ধতিতে কার্য পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

---

৪০. মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় সুদের অভিশাপ থেকে উম্মতকে রক্ষার জন্য ইসলামি ব্যাংকিং-এর আবির্ভাব এক আশীর্বাদস্বরূপ। এক সময় মনে করা হত যে, সুদ থেকে আসলে কোনভাবেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব না। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং যেভাবে তাদের কর্ম পরিধি চতুর্দিকে বিস্তৃত করে দিয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে সুদভিত্তিক কার্যাবলি নয়, বরং মহান আল্লাহর পছন্দসই অর্থব্যবস্থাই যে কোনো দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়।

ইসলামি ব্যাংকের গঠন পদ্ধতি : ইসলামি ব্যাংকের গঠনের জন্য এবং গঠনের অনুমতি প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করা জরুরি।

(১) **ব্যাংকিং এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীতিমালাপন্থী হওয়া :** কোন দেশের সরকারি অনুমতি না থাকলে সে দেশে ইসলামি ব্যাংক স্থাপন করা সম্ভব হয় না। তাই ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম সরকারি সচেতনতা জরুরি। ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রচলিত আইনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য যে নীতিমালা প্রণীত আছে তার অনুসরণ জরুরি। সে সাথে কেন্দ্রিয় ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকের জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তার অনুসরণও জরুরি।[৪১]

(২) **শারি'আহ পদ্ধতি অনুসরণ :** শারি'আহসম্মত লেনদেন পরিচালনার জন্যই ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলাম যেহেতু সুদকে হারাম করেছে সেহেতু ইসলামি ব্যাংকিং-এর আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ কার্যাবলি, ঋণ প্রদান, স্কিম প্রচলন- কোন কাজে সুদের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। এমনকি ব্যাংকিং কাজে প্রয়োজনীয় কোন কাগজপত্র, নথি ইত্যাদিতে এমন কোন শব্দ উল্লেখ থাকতে পারবে না যাতে বুঝা যায় উক্ত চুক্তিটি একটি সুদি চুক্তি। তাছাড়া, বিনিয়োগের সময়ও এমন কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে না যা ইসলাম সমর্থন করে না। আবার আমানত গ্রহণের সময়ও গ্রাহকের আয়ের উৎস শারি'আহর দৃষ্টিতে বৈধ কি না তা বিবেচনা করতে হবে।[৪২]

(৩) **প্রশাসনিক কাঠামো গঠন :** ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরুতে উদ্যোক্তাগণকে মূলধনের যোগান দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ শেয়ার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে জনগণকে ক্রয় করার অধিকার দিতে হবে। মূলধনের অংশীদারগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে। পরিচালনা পর্ষদের অধীনে একটি প্রশাসনিক অবকাঠামো থাকবে। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে থাকবেন সভাপতি, সহ-সভাপতি, পরিচালক, স্বাধীন পরিচালক এবং নির্বাহী পরিচালক। ইসলামি ব্যাংকের সকল কাজ শারি'আহসম্মত হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য থাকবে শারি'আহ সুপারভাইজরি কমিটি। এ কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন সভাপতি, সহ-সভাপতি, সদস্য-সচিব এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

---

৪১. মোহাম্মদ আলী ও এম এম মোঃ আব্দুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : মিলেনিয়াম প্রিন্টিং প্রেস, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ২৪১
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

নির্বাহী কমিটি, নিরীক্ষণ কমিটি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে থাকবেন সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে থাকবেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোম্পানি সচিব, প্রধান মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক।[৪৩]

(৪) **ইসলামি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের গঠন পদ্ধতি :** ইসলামি কেন্দ্রিয় ব্যাংক সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বায়ত্তশাসিতভাবে কাজ পরিচালনা করবে। এরূপ কেন্দ্রিয় ব্যাংক গঠনের জন্য মূলধন রাষ্ট্রীয়ভাবে যেমন সরবরাহ করা যেতে পারে তেমনি সরকার ও জনগণের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমেও সরবরাহ করা যেতে পারে। ইসলামি ব্যাংককে একটি দেশের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করতে হবে। আর সে জন্য এ কাজের যোগ্য একজন ব্যাক্তিকেই ইসলামি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে, যিনি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। ইসলামি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের গভর্নর যিনি হবেন, তার শারি'আহ, ইসলামি অর্থব্যবস্থা, ইসলামি ব্যাংকিং এবং ইসলামি বিমার ব্যাপারে বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে। ইসলামি কেন্দ্রিয় ব্যাংক রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে; তবে তাতে রাজনৈতিক কোন প্রভাব থাকবে না। রাষ্ট্র কর্তৃক ইসলামি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত হবে। পরিচালকমণ্ডলী ইসলামি শারি'আহ সম্পর্কিত জ্ঞানে যেমন পারদর্শী হবেন তেমনি তাদের মাঝে ইসলামি অর্থব্যবস্থার গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক।[৪৪]

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগের পদ্ধতিসমূহ : প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতির মধ্যে পরিণামগত এত পার্থক্যের পর সাধারণভাবে ধারণা হওয়া স্বভাবিক যে, ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতি অনেক সীমিত। অর্থ বিনিয়োগের ও বিনিয়োগ থেকে উপার্জনের সুযোগ হয়ত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অনেক সীমিত। কিন্তু ইসলামি বিনিয়োগ ব্যবস্থা পুরোপুরি অধ্যয়ন করলে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের সুযোগ কম তো নয়ই; বরং সঠিকভাবে বিনিয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারলে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য অর্থব্যবস্থার বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো কেবল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতি বিনিয়োগের সকল পক্ষ এবং সামাজিক ন্যায় বিচারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তাই ইসলামি বিনিয়োগের ক্ষেত্র সীমিত নয়; বরং বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার কার্যাবলি ভিন্ন ও সুবিস্তৃত। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

(ক) শিরকাত : শিরকাত (شِرْكَةٌ) আরবি শব্দ, এর শাব্দিক অর্থ, অংশীদারিত্ব, অংশগ্রহণ, অংশ।[৪৫] শিরকাত ইসলামি বিনিয়োগ ব্যবস্থার একটি বুনিয়াদি পদ্ধতি যা সুদের বিকল্প হিসেবে সর্বাবস্থায় সমাদৃত। ইসলামি ইতিহাস, রসুল সা.-এর সিরাত, খুলাফায়ে রাশিদিন সাহাবিগণের জীবন কাহিনী

---

৪৩. মোহাম্মদ আলী ও এম এম মোঃ আব্দুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৭

৪৪. মোঃ গোলাম মোস্তফা, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : সমন্বয় পাবলিকেশন্স, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ১৭০

৪৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৫৯৯

এবং খিলাফতের সময়কার ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে শিরকাতের বহু উদাহরণ পাওয়া য়ায়। শিরকাত দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায়িক চুক্তিকে বুঝানো হয়।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের অনুসৃত অর্থসংক্রান্ত বিধি– মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যায় অংশীদারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'অংশীদারি ব্যবসায়িক চুক্তি হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে সংঘটিত একটি অংশীদারি ব্যবসায়িক চুক্তি। তা এভাবে হয় যে, পুঁজি ও মুনাফায় তারা যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে।[৪৬] আন্তর্জাতিক শারি'আহ বোর্ড AAOIFI-এর ১২ নম্বর শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ড-এ অংশীদারি বিনিয়োগ চুক্তির সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে, 'মুনাফা কমানোর উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের সম্পদ তথা শ্রম বা বিশেষ যিম্মাদারি ও দায় মিশ্রণে চুক্তির মাধ্যমে একমত হওয়া।[৪৭] কুরআন মাজিদে শিরকাতের উদাহরণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিজেদের কোন একজনকে তোমাদের রূপার মুদ্রা দিয়ে নগরে পাঠাও। সে গিয়ে দেখুক, কোন এলাকায় ভাল খাদ্য আছে এবং সেখান থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসুক। সে যেন সতর্কতার সাথে কাজ করে। সে যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করে।[৪৮]

হাদিস থেকেও শিরকাতের উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابي هريرة رضـ، رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 'রসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি দুই অংশীদারের মধ্যে তৃতীয় অংশীদার হই, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কেউ খিয়ানত না করে। আর যখন তাদের কেউ খিয়ানত করে আমি তাদের মাঝ থেকে বের হয়ে যাই।[৪৯]

শিরকতের ক্ষেত্রে মুনাফা লাভের অধিকার শ্রম, পুঁজি এবং দায়ের উপর নির্ভর করে। সে জন্য কেউ যদি স্লিপিং পার্টনার হিসেবে অংশীদার হয় তাহলে তার পুঁজির আনুপাতিক হারের বেশি মুনাফা তার জন্য ধার্য করা যায় না। কারণ ঐ অতিরিক্ত অংশটি বিনিময়হীন হয়ে পড়ে। আর বিনিময়হীন যে কোন প্রাপ্তিই রিবার সমতুল্য। আর শিরকাতে ক্ষতি বহনের ক্ষেত্রে পুঁজির আনুপাতিক হারে বহন করা হয়। আর মুনাফা যে কোন হারে ঐক্যমতে নির্ধারণ করা যাবে। ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এ পদ্ধতি অবলম্বন করে বিনিয়োগের নতুন পদ্ধতি চালু করে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি করতে পারে।

(খ) মুদারাবা : মুদারাবা (مُضَارَبَةٌ) আরবি শব্দ, এর শাব্দিক অর্থ, মুদারাবা ব্যবসা, লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বভিত্তিক যৌথ ব্যবসা।[৫০] মুদারাবা পদ্ধতি ইসলামি বিনিয়োগের একটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পদ্ধতি। ইসলামি ব্যাংকিং, ইসলামি ব্যবসায়ের মৌলিক ভিত্তিই হলো মুদারাবা বিনিয়োগ পদ্ধতি।

AAOIFI-এর ১৩নং শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ২-এ মুদারাবা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মুদারাবা হলো মুনাফায় অংশীদারির চুক্তি। চুক্তিটি সম্পন্ন হয় এভাবে যে,

اَلْمُضَارَبَةُ شِرْكَةٌ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِّنْ جَانِبٍ (رَبُّ الْمَالِ) وَعَمَلٌ مِّنْ جَانِبٍ آخَرَ (اَلْمُضَارِبِ)

---

৪৬. সম্পাদনা পরিষদ, *মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ*(বৈরুত : মাতবা'আতুল আদাবিয়্যাহ, ১৪০২ হি.), ধারা নম্বর ১৩২৯

৪৭. একাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স (আওফি), শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং-১২

৪৮. আল কুরআন, ১৮ : ১৯

৪৯. ইমাম আবূ দাউদ র., অনূ. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবূ দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৬৮, হাদিস নং ৩৩৫০

৫০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৮

অর্থাৎ মুদারাবা হলো এক পক্ষ (সাহিবুল মাল) মূলধন যোগান দেয়া। আর অপর পক্ষ (মুদারিব) শ্রম বা ব্যবসায়িক কাজের ব্যবস্থাপনা করা।[৫১] যেখানে অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারদের পুঁজি বা শ্রম বা দায়ে শিরকাত থাকে, সেখানে মুদারাবার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের এভাবে শিরকত নেই। মুদারাবায় এক পক্ষের শ্রম আর অপর পক্ষের পুঁজি। সে জন্য ফক্বিহগণ শিরকত আর মুদারাবাকে এক হিসেবে গণ্য করেননি। মুদারাবার বিষয়ে সরাসরি কুরআন ও হাদিসে কোন কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সাহাবায়ে কিরামের আমল ও সালাফে সালিহিনের ইজমা দ্বারা মুদারাবা বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রমাণিত। মুদারাবা ব্যবসায়ে পুঁজিদাতা, ব্যবসায়ী ও পুঁজি এ তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

মুদারাবাকে শর্তহীন ও শর্তযুক্ত– এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। শর্তহীন মুদারাবার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মেয়াদ, ব্যবসা পরিচালনার স্থান, ব্যবসায়ের প্রকার এবং ক্রেতা-বিক্রেতা কোন কিছুই মূলধনের যোগানদাতা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আর এ বিষয়গুলোর কোন একটি যদি পূর্বে নির্ধারণ করে দেয়া হয় তাহলে সেটি শর্তযুক্ত মুদারাবা হিসেবে গণ্য হয়। মুদারাবা বিনিয়োগের ভিত্তি হলো– মুদারাবা চুক্তি, সাহিবুল মাল (মূলধন সরবরাহকারী), মুদারিব (উদ্যোক্তা), লাভ-ক্ষতি, মূলধন ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড।

মুদারাবা চুক্তি : মুদাবারা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ইজাব ও কবুল যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে হবে। চুক্তিতে মুনাফার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। চুক্তি লিখিত হওয়া মুস্তাহাব। চুক্তি সম্পাদনের জন্য আদর্শ মুদারাবা চুক্তিপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

সাহিবুল মাল : সাহিবুল মাল মূলত মুআক্কেল বা মূলধন সরবরাহকারী। সে তার সম্পদের ব্যবস্থাপনা করার উদ্দেশ্যে মুদারিব (উদ্যোক্তা)-কে ওয়াকিল (প্রতিনিধি) হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে। সাহিবুল মালকে চুক্তি সম্পাদনের সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাহিবুল মাল হলেন আমানতদারগণ, আর মুদারিব হলো আইনগত সত্ত্বা।

মুদারিব (উদ্যোক্তা) : ইসলামি আইন অনুযায়ী একজন মুদারিব আমানতদার, ওয়াকিল, অংশীদার, কর্মচারী এবং জামিনদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মুদারিবকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। তাকে তাকওয়াপূর্ণভাবে ব্যবসা করার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে। শারি'আহ পরিপন্থী লেনদেন থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে। ইসলামি বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ের নীতিমালা সম্পর্কে বিজ্ঞ হতে হবে।

লাভ-ক্ষতি : মুদারাবা বিনিয়োগের মুনাফা শতকরা হারে বা ভগ্নাংশে নির্ধারণ করতে হবে। মুদারাবা চুক্তির সময়েই মুনাফার হার স্পষ্টভাবে উভয় পক্ষের জানা থাকতে হবে। চুক্তিতে মুনাফার বিষয়টি কারো অজ্ঞাত থাকলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে প্রথমে সেটা মুনাফা থেকে কর্তন করতে হবে। মুনাফা থেকেও তা পূরণ না হলে মূলধন থেকে তা বহন করা হবে।

মূলধন : মুদারাবা বিনিয়োগের মূলধন নগদ মুদ্রায় হওয়ার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফে সালিহিন মতামত প্রদান করেছেন। চুক্তির সময়ই মূলধনের পরিমাণ, জাতীয়তা, প্রকার ইত্যাদি বিষয় উভয় পক্ষের জ্ঞাত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে অনিশ্চয়তা মুদারাবা চুক্তিকে ফাসিদ করে তুলে। মূলধন

---

৫১. একাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স (আওফি), শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩, (৩/২/১০), মে ২০০২ খ্রি., পৃ. ২৩৮

হস্তান্তর থাকতে হবে। অন্য কারো যিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকলে তা মূলধন হিসেবে ধার্য করা যাবে না। মুদারিবকে মূলধন ব্যয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। মুদারাবায় মূলধন ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা যাবে না। কারণ মুদারিব হলো আমাতনদার। সুতরাং মূলধন ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হলে সেটা দায় হিসেবে বিবেচিত হবে ও ক্ষতি হলেও অযৌক্তিক লাভের অংশ গণনা করতে হবে যা সুদেরই নামান্তর। মুদারিব যেহেতু আমানতদার ও মূলধন মুদারিবের নিকট আমানত সেহেতু স্বাভাবিক কোন কারণে মূলধন নষ্ট হলে তার জন্য মুদারিব দায়ি থাকবে না।

ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড : মুদারাবা ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, মুদারিবের পরিতোষণ, ব্যবসার কাজে সাহিবুল মালের অংশগ্রহণ ইত্যাদির সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শারি'আহ বিধান রয়েছে। ব্যবসার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যয়গুলো মুদারাবা তহবিল থেকে বহন করতে হবে। আর যেটা সরাসরি সম্পৃক্ত নয় সেটা মুদারিব একা বহন করবে। মুদারিব যখন ব্যবসায়ের কাজের অন্তর্ভুক্ত কোন দায়িত্ব পালন করবে তখন মুদারিবের পারিতোষিক মুদারাবা তহবিল বহন করবে। মুদারিবের উদ্দেশ্য হবে মুদারাবা বিনিয়োগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকা। সাহিবুল মাল সরাসরি ব্যবসায়িক কাজে ব্যাপকভাবে বা যখন তখন অংশগ্রহণের শর্তারোপ করতে পারবে না।

(গ) মুশারাকা : মুশারাকা (مُشَارَكَةٌ) আরবি শব্দ, এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, অংশগ্রহণ, অংশীদারিত্ব, সহযোগিতা, পরস্পর একে অপরের শরীক বা অংশীদার হওয়া।[৫২] এটি মুদারাবা ও শিরকতের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিনিয়োগ পন্থা। সাধারণভাবে দেখা যায় মুদারাবা ব্যবসায়ে মুদারিব শুধু ব্যবসা পরিচালনা করে। মুদারিব নিজে কোন মূলধন বিনিয়োগ করে না। কিন্তু মুদারিব যখন নিজেও কিছু মূলধন বিনিয়োগ করে তখন মুশারাকায় পরিণত মূলধন ও পরিচালনা উভয় দিক থেকেই মুদারিবের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয়। তবে মুদারাবার মত মুশরাকাতেও সাহিবুল মাল ব্যবসায়িক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। মুশারাকার উদাহরণ প্রাচীন ফিক্বহের গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আধুনিক যুগের ফক্বিহগণের কিছু গবেষণার পর মুশারাকা শারি'আহসম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে স্থান পেয়েছে।

সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার একটি আদর্শ বিকল্প হলো বিনিয়োগে মুশারাকা পদ্ধতি। মুশারাকায় পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ পূর্বে নির্ধারণ করা হয় না। বরং প্রকৃত মুনাফার পর তা সুনির্দিষ্টভাবে ধার্য করা হয়। মুনাফার হার মূল চুক্তিতে নির্ধারিত হয়। মুনাফার ভাগ হয় তিনটি। দুই ভাগ মুদারিব পায় (একভাগ মুদারিব হিসেবে, আরেক ভাগ মূলধনের অংশীদার হিসেবে), আর এক ভাগ সাহিবুল মাল পায়। ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদার তার বিনিয়োগকৃত মূলধন অনুপাতে ক্ষতি বহন করে। প্রকল্প অর্থায়ন, মুশারাকা ফান্ড বা সিকিউরিটিজ, চলতি মূলধনে অর্থায়ন (Working Capital Financing)- প্রভৃতি বিনিয়োগ মুশারকার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

(ঘ) ইজারা : ইজারা (اِجَارَةٌ) আরবি শব্দ, এর শাব্দিক অর্থ ভাড়ায় প্রদান, ইজারাদান, আশ্রয়দান, সাহায্যকরণ।[৫৩] ইজারা বলতে বুঝায়, কাজের বিনিময়ে কাউকে কিছু পারিশ্রমিক প্রদান করা। ত্রয়োদশ হিজরিতে উসমানি সালতানাতের অধীনে রচিত ইসলামি বিবিধ আইন মাজাল্লাতুল

---

৫২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৬
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

আহকামিল আদালিয়্যাহ'-এর ৪০৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে– 'ইজারা হলো, সুনির্দিষ্ট বিনিময়ের বিপরীতে নির্দিষ্ট উপকার বিক্রির নাম।[৫৪] এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিনিময় চুক্তির সময়ই নির্দিষ্ট করতে হবে। অন্যথায়, ইজারা ফাসিদ হয়ে যাবে। ইজারা থেকে কাঙ্ক্ষিত মানফা'আত বা উপকার সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইজারাকে ইজারাতুল আমল এবং ইজারাতুল মানফা'আত এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ইজারাতুল আমলে কোন কাজ বা আমলের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। ইজারাতুল মানফা'আতে কোন বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য লেনদেন সংঘটিত হয়।

(ঙ) সালাম : সালাম (سَلَمٌ) শব্দটি আরবি, এর শাব্দিক অর্থ সন্ধি, শান্তি, আত্মসমর্পণ, আনুগত্য, অগ্রিম ক্রয়।[৫৫] মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহর ভাষ্যমতে, 'নগদ মূল্য গ্রহণের বিনিময়ে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করাকে সালাম চুক্তি বলে।[৫৬] অর্থাৎ, এটি একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। কোন প্রকার ওয়াদা চুক্তি নয়। চুক্তির সময়ই পরিপূর্ণ মূল্য ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে অর্পণ করা জরুরি। চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করা হবে মর্মে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত করা হয়।

সালাম চুক্তি পূর্ব থেকেই আরবে বিদ্যমান ছিল। মদিনার কৃষি ব্যবসায়ীরা সালাম চুক্তিতে আবদ্ধ হত আবার কখনও কখনও সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করত। আবার আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের বিনিয়োগে ব্যবসায়ীরা সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করত। ২য় হিজরিতে সুদ নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিকল্প হিসেবে কিছু শর্তারোপের মাধ্যমে রসুল সা. সালাম চুক্তির বৈধতা প্রদান করেন। সালাম চুক্তিটি নিশ্চিত একটা চুক্তি হতে হবে। কোন পক্ষেরই কোন খেয়ার থাকতে পারবে না। পণ্যের মূল্য, জাতীয়তা, প্রকার, পণ্য অর্পণ ও গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়াদি চুক্তির সময়েই নির্দিষ্ট হতে হবে।

(চ) ইস্তিসনা' : ইস্তিসনা' (اِسْتِصْنَاعٌ) শব্দটি আরবি, এর শাব্দিক অর্থ তৈরি করতে বলা, বানিয়ে দিতে বলা।[৫৭] ইস্তিসনা' বলতে বুঝায় কোন কিছু তৈরি করে দেয়ার জন্য অর্ডার করা বা তলব করা। শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি ইস্তিসনা'-এর সংজ্ঞা পেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'বিক্রেতার কাছে ক্রেতা এ অর্ডার করা যে, বিক্রেতা তার নিজের কাঁচা মাল দিয়ে ক্রেতার জন্য কোন বস্তু তৈরি করে দিবে। এরপর উভয়ের ঐকমত্যে নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেতা উক্ত অর্ডার বাস্তবায়নে বাধ্য হবে।' অর্থাৎ ইস্তিসনা একটি চূড়ান্ত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। পণ্য অবিদ্যমান থাকাবস্থায়ই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হয়। রসুল সা.-এর যুগ এবং এরপর সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত এরূপ চুক্তির প্রচলন আছে ও কোন যুগেই ফক্বিহগণ এরূপ চুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। AAOIFI কর্তৃক প্রণীত **১১**নং শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ড-এর ধারা **২/২/১**-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'ইস্তিসনা' চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। তাহলে, যে জিনিস তৈরি করা হবে তার জাতীয়তা, প্রকার, পরিমাণ, প্রার্থিত গুণাবলি নির্দিষ্ট করা, মূল্য জ্ঞাত থাকা, মেয়াদ থাকলে তাও জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।[৫৮]

---

৫৪. সম্পাদনা পরিষদ, *মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, ধারা নং ৪০৫

৫৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২

৫৬. সম্পাদনা পরিষদ, *মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, ধারা নং ১৩৩০

৫৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৫৮. একাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স (আওফি), শারি'আহ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং-১১, (২/২/১)

(ছ) মুরাবাহা : ৬০-এর দশকে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুরাবাহা আলোচনায় উঠে আসে। ইসলামি ব্যাংকিং-এ বর্তমানে মুরাবাহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা ইবন রুশদ মালিকি রহ. মুরাবাহা-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, 'মুরাবাহা হলো বিক্রেতা যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করেছে, সে মূল্য ও অতিরিক্ত মুনাফায়, যা উভয়ের জ্ঞাত থাকবে ও বিষয় দু'টি মূল চুক্তিতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হবে এবং তা পূর্ব ওয়াদা চুক্তির ভিত্তিতে হবে না। সেটাই হলো মূল মুরাবাহা।' এটি একটি বৈধ ব্যবসা। সাহাবা ও তাবিইনের যুগ থেকে মুরাবাহার বৈধতার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। মুরাবাহায় পণ্য ক্রয় বাবদ মূল্য ও খরচ চুক্তিতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হয়। মুনাফার হার আলাদা করে চুক্তিতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হয়। মুরাবাহা চুক্তি আমানত ও বিশ্বাস নির্ভর লাভে বিক্রয় চুক্তি।

মূলত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যে বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো প্রচলিত রয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা রয়েছে। ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর ব্যাপকতা পাচ্ছে, বিধায় ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে আরো অনেক জনবান্ধব ও জনকল্যাণকর বিভিন্ন ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন অতিব জরুরি।

ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিবিধ সেবাদান পদ্ধতি : নির্দিষ্ট বিনিয়োগ পদ্ধতি ছাড়াও ইসলামি ব্যাংকিং-এর অধীনে বিবিধ সেবাদান কার্যাবলি সম্পাদিত হয় যা নিম্নরূপ:

(ক) জনকল্যাণমূলক বিনিয়োগ : ইসলামি ব্যাংকসমূহ সামাজিক দায়িত্ব এবং কল্যাণমুখী কাজে বিনিয়োগে উৎসাহী। সে জন্য তারা গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী উন্নয়নে বিনিয়োগ প্রকল্প পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প, দরিদ্র ও অবহেলিত কৃষকদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য কৃষি সরঞ্জামে বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদি প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকে।

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য : ইসলামি ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় সংক্রান্ত যে সব কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে– পণ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা, রপ্তানি সহায়তা, রেমিট্যান্স সংগ্রহ, বিল সংগ্রহ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়, ট্রাভেলারস চেক ইস্যু, হজ্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং সেবা, আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যুকরণ ইত্যাদি। সমস্ত কাজই শারি'আহসম্মত পন্থা অবলম্বন করে সম্পাদন করা হচ্ছে। শারি'আহ সুপারভাইজরি বোর্ড আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে এখনো গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

(গ) অর্থ আদান-প্রদান : দেশের অভ্যন্তরে অথবা দেশের বাইরে বিশ্বস্ততার সাথে টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, ডিমান্ড ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তরে সাহায্য করে।

(ঘ) কর্জে হাসানা : অভাবগ্রস্ত মানুষকে কর্জে হাসানা[৫৯] প্রদান করে আয় রোজগারে সাহায্য করে।

(ঙ) যাকাত সেবা : ইসলামি ব্যাংকগুলো যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণে সহায়তা করে।

ইসলামি বিনিয়োগে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ : ইসলামি বিনিয়োগের সাথে অন্যান্য বিনিয়োগের মূল পার্থক্য ইসলামি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে নিহিত। ইসলামি বিনিয়োগের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হলো :

---

৫৯. 'কর্জ শব্দের অর্থ ঋণ বা ধার ও হাসানাহ শব্দের অর্থ ভাল কাজ, মঙ্গল, কল্যাণ, পুণ্য, উত্তম বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য। অতএব কর্জে হাসানাব অর্থ উত্তম ঋণ।' দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪, ৭৮৭

(১) রিবা (رِبَا) : সাধারণভাবে ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত যা কিছু দেয়ার শর্তারোপ করা হয় তাকেই রিবা বলে। তবে ইসলামি অর্থনীতিতে রিবার পরিধি আরো বিস্তৃত। রিবার আভিধানিক অর্থ হলো– সুদ, কুসীদ, বৃদ্ধি, অতিরিক্ত হওয়া।[৬০] এ অতিরিক্তটা ঋণের উপরেও হতে পারে, বকেয়া মূল্যের উপরেও হতে পারে অথবা সমজাতীয় বস্তুর লেনদেনেও হতে পারে। সুতরাং রিবার বিষয়টি শুধুমাত্র ঋণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মূলধনের উপর বিনিময়হীন অতিরিক্ত যা পাওয়া যায়, তাই রিবা। ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ রিবাকে মূলত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথমত 'রিবা আল-নাসিয়্যাহ' (رِبَا النَّسِيْئَة) যা কুরআনুল কারিমে নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত 'রিবা আল-বুয়ূ' (رِبَا الْبُيُوْع) যা হাদিসে নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রিবা আল-নাসিয়াহ ঋণ বা দায় সম্পর্কিত রিবা। আর রিবা আল-বুয়ু ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত রিবা। ইসলামি অর্থনীতিতে অত্যন্ত কঠোরভাবে যে কয়টি বিষয় স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো রিবা বা সুদ। রিবার ব্যাপারে শিরকের পরে সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তির কথা কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ প্রচলিত অর্থনীতিতে রিবার গ্রহণযোগ্যতা এতটাই ব্যাপক যে, রিবা ছাড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির কোন বিনিয়োগই সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতি রিবার যে সূক্ষ্ম ভয়াবহতা অনুধাবন করেছে তা অন্য কোন অর্থব্যবস্থা অনুধাবন করতে পারেনি। রিবার ব্যবহার এতটাই বিস্তৃত যে, সহজে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এ কারণেই ইসলামি বিনিয়োগ ব্যবস্থা সর্বোত্তম। কারণ, ইসলামি বিনিয়োগেই রিবার ভয়াবহতা পৃথকভাবে অনুধাবন করে তা থেকে মুক্তির ব্যবহারিক উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

(২) বায়' আল 'ইনা (بَيْعُ الْعِيْنَة) : আরবি বায়' ও 'ইনা দু'টি শব্দের যৌগিক রূপ; সম্বন্ধবাচক পদ। পৃথকভাবে বায়' শব্দের আভিধানিক অর্থ– বিক্রয়, বিক্রি, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা এবং 'ইনা' শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট অংশ, শ্রেষ্ঠাংশ।[৬১] সাধারণ কোন প্রকার হিলা বা কৌশল অবলম্বন করে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনকে বায়' আল 'ইনা বলে। বায়' আল 'ইনা সাধারণত রিবা বা সুদ গ্রহণ ও প্রদানের একটি অপকৌশল। ফুকাহায়ে কিরাম 'ইনার ভিত্তিতে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয়, বিনিয়োগ কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। আর সে জন্যই বেশিরভাগ ফুকাহায়ে কিরামই বায়' আল 'ইনাকে নিষিদ্ধ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আল্লামা হাসকাফি রহ. 'ইনার পরিচিতি প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, 'কোন দ্রব্য বাকিতে বা অধিক মূল্যে বিক্রি করা, যেন ঋণগ্রহীতা ক্রয়কৃত পণ্যটি পুনরায় বিক্রেতার নিকট নগদে অল্প মূল্যে বিক্রি করে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে, এরূপ লেনদেনকে বায়' আল 'ইনা বলা হয়।'[৬২] এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার কারোরই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকে না। উভয়েরই উদ্দেশ্য থাকে পণ্যকে আশ্রয় করে অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত লেনদেন করা। এ ক্ষেত্রে মূলত ২টি ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতা ঋণদাতা আর ক্রেতা ঋণ গ্রহীতা। দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতা হলো প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের ক্রেতা, আর ক্রেতা হলো প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের বিক্রেতা। প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য হবে বাকি ও অধিক। দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য হবে নগদ ও প্রথমটির তুলনায় কম।

---

৬০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭, ৭২০

৬২. আল শাইখ মুহাম্মাদ বিন আলি বিন মুহাম্মাদ আলাউদ্দিন আল হাসকাফি, *আল দুররুল মুখতার শারহি তারবিরুল আবসার ওয়া জামি' আল বিহার*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯৪-৩৯৫

প্রথম লেনদেনেই দ্বিতীয় লেনদেনটি শর্তযুক্ত থাকে। অর্থাৎ প্রথম লেনদেনটি করার উদ্দেশ্যই হয় দ্বিতীয় লেনদেন। অর্থাৎ শর্ত করা হয় একই সময়েই দ্বিতীয় লেনদেনটি সংঘটিত করা বাধ্যতামূলক। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় লেনদেনটিকে হিলার মাধ্যমে বৈধ করার উদ্দেশ্যে প্রথম লেনদেনটি সংঘটিত হয়। সে জন্য এরূপ হিলার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ও বিনিয়োগ অবৈধ।

(৩) রিশওয়াহ : রিশওয়াহ (رِشْوَةٌ) আরবি শব্দ, এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, ঘুষ, উৎকোচ, উপরি।[৬৩] এটি একটি আর্থিক চুক্তির উপাদান। এ ক্ষেত্রে আর্থিক কোন উৎকোচের বিনিময়ে কোন সত্যকে বা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। যে কাজ স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সে কাজকেই সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা বা নিজের অবৈধ কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাউকে উৎকোচ প্রদান করা বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাতিল চুক্তি করার নিমিত্তে কোন উৎকোচ প্রদান করা রিশওয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত। ইসলামি বিনিয়োগে রিশওয়াহ একটি নিষিদ্ধ উপাদান। কারণ উৎকোচ প্রদানকে ইসলামে ব্যবসায়িক চুক্তির ক্ষেত্রে প্ররোচনার সাথে তুলনা করা যায়। প্ররোচনার মাধ্যমে কোন চুক্তি করা হলে সে চুক্তিকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়।

বাতিল চুক্তির মাধ্যমে কোন ব্যবসায়িক বিনিয়োগ সম্ভব নয়। রিশওয়াহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং এ উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে সে সম্পর্কে রুজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে কোন অংশ জেনে-বুঝে গ্রাস করার গুনাহে লিপ্ত হবে।[৬৪]

এ বিষয়ে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, 'আবদুল্লাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন।[৬৫]

(৪) ক্বিমার : ক্বিমার (قِمَارٌ) আরবি শব্দ, এ শব্দের আভিধানিক অর্থ– জুয়াখেলা, বাজি ধরা।[৬৬] ইসলামি ফিক্বহশাস্ত্রে ক্বিমার বলতে বুঝায় অনিশ্চিত কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এমনভাবে অর্থ বিনিয়োগ করা যাতে হয় তা বিনিময়হীনভাবে বিপুল পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে আসবে নতুবা বিনিয়োগকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃত হয়ে যাবে। তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআনে বর্ণিত আছে, 'যে কোন লেনদেন, কারবারে কেউ কিছুর মালিক হওয়াটা এমন শর্তের উপর, এমন বিষয়ের উপর মওকুফ রাখা, যা হওয়া না হওয়া দু'টিই সমান। আর এরই ভিত্তিতে লেনদেনের উভয়পক্ষ কখনো লাভবান হয়, কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ লাভ-ক্ষতির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ সমান।' বর্তমানে এটাই ক্বিমারের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধারণা।

ক্বিমার একটি 'আবাদুল মুআত্তমা' বা বিনিময়মূলক চুক্তি। এতে অংশগ্রহণকারী অন্যের সম্পদ গ্রাস করার জন্য নিজের সম্পদকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে দেয়। এ ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সম্পদ প্রাপ্তির বিষয়টি অনিশ্চিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী বিনিয়োগকতৃ সম্পদ থেকে বিনিময়হীন অনেক বেশি লাভ করে, না হয় নিজের সম্পদ পুরোটাই কোন বিনিময় ছাড়া হারিয়ে ফেলে। ক্বিমারে যেহেতু একজন অপর

---

৬৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০

৬৪. আল কুরআন, ২ : ১৮৮

৬৫. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, অনূ. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরিমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১০, হাদিস নং ১৩৪০

৬৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০২

জনের সম্পদ গ্রাস করার জন্য নিজের কিছু সম্পদ অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে দেয় এবং লেনদেনে যে সম্পদটা বিনিয়োগের জন্য উপস্থাপন করা হয়, তা বিনিময় ছাড়াই অন্যের মালিকানায় চলে যায় বা অন্যের সম্পদ কোন বিনিময় ছাড়া নিজের হয়ে যায়, সেহেতু ক্বিমারের উদাপান কোন বিনিয়োগ ও লেনদেনে পাওয়া গেলে তা হারাম বলে গণ্য হয়। বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে বিমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ক্বিমারের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

(৫) গারার (غَرَرٌ) : বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত অর্থ হালাল হতে হলে অবৈধ আর্থিক চুক্তি থেকে বিনিয়োগকে রক্ষা করা আবশ্যক। গারার এমনই একটি অবৈধ আর্থিক চুক্তি। গারার (غَرَارٌ) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– ধোঁকা দেয়া, প্ররোচিত করা, বিপথগামী করা, বিপদে ফেলা, ঘাটতি, হ্রাস বা ত্রুটি।[৬৭] পারিভাষিক অর্থে ইসলামি ফিক্বহের পরিভাষায়, শারি'আহ পরিপন্থীভাবে অজ্ঞাত পরিণতিযুক্ত চুক্তিকে গারার বলে। বর্তমান যুগের ফিউচার সেল, ফরওয়ার্ড সেল, ডেরিভেটিভ সেল, বিমা ব্যবসায় প্রভৃতিতে গারারের উপাদান বিদ্যমান।

গারার যুক্ত লেনদেনে চুক্তিকৃত বিষয় বা পণ্য অর্পণে বিক্রেতা অক্ষম হতে পারে অর্থাৎ পণ্য তার হস্তান্তর যোগ্যতা হারাতে পারে। মূল চুক্তিতে পণ্য, মূল্য অজ্ঞাত থাকে এবং মূল চুক্তিতে মালিকানা অর্জনের বিষয়টি কোন নির্দিষ্ট একটি ঘটনা ঘটা বা ঘটার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ গারারের ক্ষেত্রে যেহেতু আর্থিক চুক্তির মৌলিক কোন অংশে অর্থাৎ পণ্য, মূল্য বা মেয়াদে বড় ধরনের কোন বিশেষ অনিশ্চয়তা তৈরি হয় সে জন্য ইসলামি বিনিয়োগে গারার থাকলে তা হারাম বলে সাব্যস্ত হয়। পবিত্র কুরআনে গারারের নিষিদ্ধতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "হে মুসলিমগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পারিক সন্তুষ্টিক্রমে কোন ব্যবসায় করা হলে তা জায়েয'।[৬৮] হাদিসে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. ধোঁকাপূর্ণ ও এবং পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন'।[৬৯]

ইসলামি ব্যাংকসমূহের জন্য অভিন্ন শারি'আহ পরিদর্শন ও অডিট নীতিমালা প্রণয়ন : ব্যাংকিং ক্ষেত্রে শারি'আহ বিধিমালা সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে সকল ইসলামি ব্যাংকগুলোর শারি'আহ কাউন্সিলের অডিট কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সকল শারি'আহ কাউন্সিলের নীতিমালা অভিন্ন হতে হবে। গ্রাহক আকর্ষণের জন্য শারি'আহ নীতিমালার শিথিলতা গ্রহণযোগ্য নয়।

শারি'আহ পরিদর্শন ও অডিটের মৌলিক নীতিমালা : প্রচলিত ব্যাংক আমানতের বিপরীতে সরাসরি সুদ প্রদান করে। ইসলামি ব্যাংকগুলো মুদারাবা পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে তা বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে লভ্যাংশ পেলে তা চুক্তি অনুযায়ী আমানতকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়। আর এ পদ্ধতি সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তা শারি'আহ কাউন্সিলের তদারকি করতে

---

৬৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৭

৬৮. আল কুরআন, ৪ : ২

৬৯. ইমাম আবূ দাউদ র., অনূ. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবূ দাউদ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৬৬, হাদিস নং ৩৩৪৩

হবে।[৭০] প্রচলিত ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ দিয়ে তার উপর বার্ষিক হারে সুদ ধার্য করে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করে তার উপর মুনাফা গ্রহণ করে। তাই ব্যাংক থেকে গ্রাহক টাকা নিয়ে আসলেই পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের খাতে ব্যয় করছে কি না শারি'আহ কাউন্সিলের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রচলিত ব্যাংক অনাদায়ি ঋণ আদায়ের জন্য চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য করে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের অনাদায়ি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এ সুযোগ নেই। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক জরিমানা ধার্য করতে পারে; সে জরিমানা সাদাকাহ ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে। ব্যাংকের মূল লভ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ দিকে ইসলামি ব্যাংকের শারি'আহ কাউন্সিলের সঠিক দৃষ্টি দিতে হবে। প্রচলিত ব্যাংক ঋণের অর্থ সরাসরি গ্রাহকের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকগুলো গ্রাহকের হাতে সরাসরি টাকা না তুলে দিয়ে গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য ও কাঁচামাল ক্রয় করে দেয়। এ পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না শারি'আহ কাউন্সিলের সেদিকে নজর রাখতে হবে।

জেনারেল ব্যাংকিং খাতে লক্ষণীয় বিষয় : সকল মুদারাবা আমানতের বিপরীতে প্রভিশনাল মুনাফা প্রতি মাসে সংরক্ষিত হচ্ছে কি না তা শারি'আহ অডিটের মাধ্যমে তদারকি করতে হবে। বছর শেষে হিসাব চূড়ান্তকরণের পর ইসলামি ব্যাংকগুলোর গ্রাহকের মুদারাবা ও অন্যান্য হিসাবে প্রদেয় প্রভিশনাল হার ও চূড়ান্ত হারের মধ্যে যে পার্থক্য থাকবে তা গ্রাহকের একাউন্টে প্রদান করতে হবে। ইসলামি ব্যাংক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেক, পে-অর্ডার, ডিমান্ড ড্রাফট সরাসরি ক্রয় করতে পারে না। যদি এরূপ করা হয়ে থাকে তাহলে কর্জ প্রদান করে সার্ভিস চার্জ নিতে হবে। ব্যাংকের আমানত কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধির জন্য শারি'আহ বিরোধী পন্থায় কৃত্রিম চেক কালেকশন করা হয়েছে কিনা তা তদারকি করতে হবে। মুদারাবা হিসাবগুলোতে ব্যাংক কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত শতকরা হারের উপর নির্ভর করে চূড়ান্তভাবে মুনাফা প্রদান করা হয়েছে কি না তা তদারকি করতে হবে। ইসলামি ব্যাংকগুলো জ্ঞাতসারে কোন গ্রাহকের হারাম উৎস থেকে উপার্জিত কোন বিনিয়োগ গ্রহণ করেছে কি না তা তদারকি করতে হবে।[৭১]

বায়' মুরাবাহা-মুআজ্জাল বিনিয়োগে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ : ইসলামি ব্যাংকের নথিপত্রে বিনিয়োগের জন্য গ্রাহকের আবেদন আছে কি না তা শারি'আহ অডিটের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ গ্রাহক যদি বিনিয়োগের আবেদন না করেই নগদ অর্থ চেয়ে বসে তাহলে সরাসরি গ্রাহককে নগদ অর্থ প্রদান করা ইসলামি ব্যাংকের জন্য বৈধ নয়। বায়' মুআজ্জাল বিনিয়োগে চুক্তিপত্র সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কি না, তারিখ ও গ্রাহকের স্বাক্ষর সঠিকভাবে আছে কি না তা নিরীক্ষণ করতে হবে। চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে ইজাব কবুলের সময় চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, মুনাফা, ব্যাংক কর্মকর্তা ও স্বাক্ষীর স্বাক্ষর সঠিকভাবে আছে কি না তা তদারকি করতে হবে।

বিনিয়োগ চুক্তিপত্রে কোন ছাড় প্রদানের শর্ত থাকা বৈধ নয়। বিনিয়োগের পণ্যের বিক্রয়মূল্য একবার নির্ধারণ করার পর আর পরিবর্তন করা যাবে না। মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন বিনিয়োগ হিসাবের উপর কোনভাবেই নতুন মুনাফা ধার্য করা যাবে না। সরবরাহকারীর নামে ইস্যু করা পে-অর্ডার নগদায়নের পর এবং বিনিয়োগের অর্থ গ্রাহকের হিসাবে জমা করার পর গ্রাহক কোন নগদ সুবিধা নিতে পারবে না। পণ্য ক্রয় না করে বিনিয়োগের টাকা দিয়ে গ্রাহক পূর্বের কোন দায় পরিশোধ করতে পারবে না। বায়' মুআজ্জালের টাকা এলসি মার্জিন প্রদান করার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বায়' মুআজ্জালের

---

৭০. মোঃ মুখলেছুর রহমান, *ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ পরিপালন : করণীয় ও বর্জনীয়*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১২

৭১. মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*(ঢাকা : শামছুন নাহার মঞ্জু, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৪৭-৪৮

টাকা দিয়ে বাই মুরাবাহার পণ্য ছাড় করা বৈধ নয়। বায়‘ মুআজ্জালের টাকা দিয়ে পণ্যের ভ্যাট, ডিউটি প্রদান করা বৈধ নয়। বিনিয়োগের মেয়াদ নবায়ন করা হলে তার বিনিময়ে অতিরিক্ত মুনাফা ধার্য করা যাবে না। বায়‘ মুআজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা পণ্য অন্য বিনিয়োগ পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যাবে না।[৭২]

ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষনীয় বিষয় : বিনিয়োগ গ্রাহককে যদি ক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ দিতে হয় তাহলে গ্রাহকের নিকট আবেদনপত্র থাকতে হবে। ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য যে সকল গুণাবলি থাকা দরকার তার সবগুলোই যদি গ্রাহকের মাঝে থাকে তাহলেই গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে। গ্রাহককে স্থায়ীভাবে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ না করে প্রত্যেকটি চুক্তিতে পৃথক ক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা আবশ্যক। ক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করে ব্যাংকের তা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে এবং কব্জ সম্পন্ন করে গ্রাহককে হস্তান্তর করতে হবে। গ্রাহক ক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী পণ্য না কিনে অন্য কোন পণ্য কিনতে পারবে না। বিনিয়োগের টাকা পণ্য ক্রয় করার কাজে ব্যবহার না করে পূর্বের কোন দায় সমন্বয়ের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। গ্রাহক বিনিয়োগের টাকা বিনিয়োগে কাজে না লাগিয়ে ব্যাংক হিসাবে ফেলে রেখেছে কি না তা তদারকি করতে হবে। গ্রাহক বিনিয়োগের টাকা যদি বিনিয়োগে কাজে না লাগিয়ে ব্যাংক হিসাবে ফেলে রাখে তাহলে তার উপর মুনাফা দেয়া বৈধ নয়। এ বিষয়টিও শারি‘আহ অডিটের সময় তদারকি করতে হবে।[৭৩]

বায়‘ মুরাবাহা বিনিয়োগের সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ : চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত ও গ্রাহকের স্বাক্ষরবিহীন রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, মুনাফা, গ্রাহক, ব্যাংক কর্মকর্তা ও স্বাক্ষীর স্বাক্ষর যথাযথভাবে থাকা আবশ্যক। নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি করা যাবে না। এলসি অথবা মুরাবাহা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পণ্যের মালিকানা অর্জনের জন্য Irrevocable Letter of Authority নিতে হবে। বিনিয়োগের মেয়াদ নবায়ন করা হলে তার উপর অতিরিক্ত মুনাফা ধার্য করা যাবে না। ডিউটি, ট্যাক্স ও ভ্যাট পণ্যের মূল্য হিসেবে মূলের সাথে যুক্ত হলেও পুরো বছরের মুনাফার সাথে যুক্ত করা যাবে না।[৭৪]

বায়‘ সালামের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ : চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত ও গ্রাহকের স্বাক্ষরবিহীন রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, মূল্য, পরিমাণ, গুণাগুণ সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্টভাবে লেখা থাকতে হবে। বায় সালাম বিনিয়োগে গ্রাহককে সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। সালাম বিনিয়োগে মূল্য প্রদানের পর মুনাফা ধার্য করা যাবে না। রপ্তানির ক্ষেত্রে বায়‘ সালামকৃত পণ্য পুনঃবিক্রি করার জন্য ব্যাংকের প্রয়োজনে উক্ত গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা আবশ্যক।[৭৫]

---

৭২. মোঃ মুখলেছুর রহমান, *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী‘আহ্ বোর্ড*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক্ অব বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০৮

৭৩. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী‘আহ্র নীতিমালা*(ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৮-৩১

৭৪. ডক্টর ইউসুফ আল-কারদাভী, অনূ. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ ও অন্যান্য, *ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা*(ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৩-৪৬

৭৫. সম্পাদনা পরিষদ, *শরী‘আহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্ত*(ঢাকা : শরী‘আহ সেক্রেটারিয়েট, আইবিবিএল, মে ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১১৫

ইস্তিসনা' বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় : চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত ও গ্রাহকের স্বাক্ষরবিহীন রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, মূল্য, পরিমাণ, গুণাগুণ সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্টভাবে লেখা থাকতে হবে। রপ্তাণির ক্ষেত্রে ইস্তিসনাকৃত পণ্য পুনঃবিক্রি করার জন্য ব্যাংকের প্রয়োজনে উক্ত গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা আবশ্যক।[৭৬]

মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ : চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত ও গ্রাহকের স্বাক্ষরবিহীন রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে মূলধনের মালিকানা স্বত্ত্বের হার নির্দিষ্ট করতে হবে। সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান মুশারাকায় বিনিয়োগ করতে পারবে না। মুনাফার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে বণ্টন করা হলে তা মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসাবের সাথে সমন্বয় করতে হবে। মুশারাকা কারবারের লোকসান ব্যবসার মূলধন অনুপাতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে বণ্টিত হতে হবে।[৭৭]

মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ : চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত ও গ্রাহকের স্বাক্ষরবিহীন রাখা যাবে না। মুনাফা বণ্টনের আনুপাতিক হার সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে লেখা থাকতে হবে। মূলধনের ক্ষতি হলে সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংককেই তা বহন করতে হবে। মুনাফা মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে বণ্টন করা হলে তা মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসাবের সাথে সমন্বয় করতে হবে।[৭৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামি অর্থনীতি দ্বারা অনুমোদিত কর্মপন্থা অবলম্বন করে এবং গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে গ্রাহকদের অধিক পরিমাণ বিনিয়োগের সুযোগ উন্মুক্ত করা সম্ভব হলে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ জনগণকে সুদের চক্র থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে। তাছাড়া, সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর পদ্ধতি এবং এর সুবিধাসমূহ জনগণের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা করা হলে জনগণকে এ সব পদ্ধতির ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হবে। আবার, পর্যাপ্ত তদারকি এবং নিরীক্ষণের মাধ্যমে শারি'আহ দ্বারা অনুমোদিত পদ্ধতি কার্যকর হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

---

৭৬. ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আমিন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*(ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৫৬-১৫৮

৭৭. মোঃ মুখলেছুর রহমান, *ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ পরিপালন ঃ করণীয় ও বর্জনীয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭৮. এ.এ.এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : হেলেনা পারভীন (রীণা), ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৭৬-১৭৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রভাব পর্যালোচনা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানগুলোকে সুদমুক্ত ব্যাংকিং পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রভাবিত করতে পারলে দেশের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কিভাবে কাজ করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক সরাসরি বিনিয়োগের ব্যাপারে তদারকি করে। তাই কোন প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের কাজে, পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদনের কাজে যখন ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগ করে তখন সরাসরি গ্রাহকের হাতে টাকা তুলে না দিয়ে, ব্যাংক নিজে সে কাজের জন্য যন্ত্রপাতি কিনে দেয় এবং প্রতি ধাপে কাজ সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কি-না, কোন খাতে আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন সে সব বিষয়ও নিজে তদারকি করে।[৭৯]

বিনিয়োগকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অনুমিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর বাস্তব উন্নয়নের মাঝে সামঞ্জস্য থাকে। তাই আসলে কতটুকু বিনিয়োগ থেকে কতটুকু উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি সাধিত হলো তা সহজেই বুঝা যায়। আর ব্যাংক নিজেই যেহেতু বিনিয়োগ কাজটি তদারকি করে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক দক্ষ জনবল দ্বারা গবেষণার মাধ্যমে সহজেই বুঝতে পারে যে কোন পদ্ধতিতে কাজ করলে তা থেকে মুনাফা অর্জিত হবে। সে ক্ষেত্রে গ্রাহক একদিকে যেমন বিনিয়োগের সুযোগ পেল ঠিক তেমনি কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক হিসেবে ব্যাংককে পেল। আর ব্যাংক যেভাবে বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতির অনুমান করে, গ্রাহকের পক্ষে এত দক্ষতার সাথে অনুমান করা সম্ভব নয়। কারণ সর্বাবস্থায় ব্যাংকের লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যখন ব্যাংকগুলো কর্মী নির্বাচন করে অথবা জনবল নিয়োগ দেয় তখন ব্যাংকের লক্ষ্য থাকে প্রাথমিকভাবে শারি'আহ সম্পর্কে জ্ঞাত লোক ব্যাংকের জন্য নিয়োগ করা। একজন কর্মী যদি প্রাথমিকভাবে শারি'আহ সম্পর্কে জানে, তাহলে তার মস্তিষ্কে ইসলামি ব্যাংকিং এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান প্রবেশ করানো সহজ হয়। আর এ ধরনের কর্মী সহজেই ইসলামি ব্যাংকিং-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে কিভাবে কাজ করা দরকার তা প্রয়োগ করতে পারে। আর ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে দক্ষতা একটি বিশেষ উপাদান। আপাত: দৃষ্টিতে প্রচলতি ব্যাংকিং এবং ইসলামি ব্যাংকিং-এর মধ্যে পার্থক্য দেখা না গেলেও, কার্যপদ্ধতিগত দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আর শারি'আহ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ছাড়া এ পার্থক্য সহজে বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের জনবল যখন ইসলামি ব্যাংকের জন্য নির্বাচন করা হয়, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে তারা সঠিকভাবে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় যা দেশের মানবসম্পদে এক অর্ভূতপূর্ব দক্ষতার বিকাশ ঘটায়।[৮০]

---

৭৯. Nilima Choudhury, *'Is the rise of Islamic finance good news for the environment?'*, Climate Home News, Published on November 5, 2013, see. https://www.climatechangenews.com/2013/11/05/is-the-rise-of-islamic-finance-good-news-for-the-environment/, visited on 22.02.2022 AD

৮০. Muafi Uii, 'Purwohandoko Purwohandoko and Iqbal Salsabil, Human capital in Islamic Bank and its effect on the improvement of healthy organization and employee performance' *International*

মূলধন গঠনে সহায়তা : ইসলামি ব্যাংকিং-এর সবচেয়ে বড় সফলতা হলো দেশের বিনিয়োগ খাতে মূলধন গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারা। বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকগুলোই ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। আর ইসলামি ব্যাংকিং-এর সবচেয়ে বড় দক্ষতা হলো, ইসলামি ব্যাংকিং যে কোনো প্রকার বৈধ সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তর করতে সক্ষম। তাতে অর্থ কোন হাতে অলস জমা থাকে না। কোন না কোন প্রকল্পে, হোক তা স্বল্প মেয়াদি বা দীর্ঘ মেয়াদি, অর্থ সর্বক্ষণ চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। আর অর্থ যখন বিভিন্ন প্রকল্পে খাটানো হবে তা থেকে মুনাফা বৃদ্ধির পরিমাণও বাড়বে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথও সুগম হবে।

ইসলামি ব্যাংকিং বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করলে মূল্যস্ফীতির আশংকা অনেকাংশে কমে যায়। কারণ ইসলামি ব্যাংকিং যে আমানত সংগ্রহ করে তা থেকে অল্প পরিমাণ তারল্য বজায় রাখার জন্য অবশিষ্ট রেখে বাকি সম্পূর্ণটাই পুনরায় উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক কাজে বিনিয়োগ করে। এভাবে প্রতিনিয়ত বিনিয়োগের মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংক আয় করে। তাই নতুন অর্থ প্রবাহের জন্য অতিরিক্ত কাগজি নোট ছাপানোর চিন্তা সহজে কাজে লাগানো হয় না। আবার ইসলামি ব্যাংকিং অনুসরণের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি স্থিতিশীলতা কাজ করে। কোন খাতে অতিরিক্ত উন্নয়ন আবার কোন খাতে অতিরিক্ত অবনতি- এভাবে উন্নয়ন সাধিত না হয়ে সর্বক্ষেত্রেই একটা সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকে।[৮১]

উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তা : সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর অধীনে যদি উদ্যোক্তা গঠন শুরু হয় তাহলে উদ্যোক্তারা তাদের উদ্যোক্তা জীবনের শুরু থেকেই ইসলামি পদ্ধতিতে উদ্যোগ পরিচালনার সাথে অভ্যস্ত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উদ্যোক্তারা এমন পণ্য নিয়ে উদ্যোগ শুরু করতে চান, যার কোন বৈধতা ইসলামি শারি'আহ-তে নেই। ফলে এ ধরনের উদ্যোগে উদ্যোক্তারা মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত থেকে যেমন বঞ্চিত হন, তেমনি ব্যবসায় কোনভাবে সফলতা না আসলে প্রচলিত ব্যাংকিং-এর দ্বারস্থ হয়ে সুদের চক্রের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকেন। অথচ, তিনি জানতেও পারেন না তার উদ্যোগের গোড়াতেই সমস্যা ছিল।

ইসলামি ব্যাংক সর্বপ্রথম উদ্যোক্তাদের বুঝিয়ে দেয় যে তার উদ্যোগ আসলেই শারি'আহসম্মত কি না। আর শারি'আহসম্মত কোন উদ্যোগের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক তার সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি হিসাব করে উদ্যোক্তাকে জানায়। ফলে তার গৃহীত উদ্যোগের বাস্তবতা জানতে সহজ হয় । উদ্যোগটি সম্ভাব্য লাভজনক হলে ব্যাংক নিজেই সেখানে তদারকির মাধ্যমে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কিনে দেয়। সে ক্ষেত্রে ব্যাংক মুরাবাহার মাধ্যমে ব্যয়ের সাথে লাভ যোগ করে বিনিয়োগ করে। তাতে উদ্যোক্তাও বুঝে যায় যে ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে তা অবহেলায় নষ্ট করা যাবে না। অবশ্যই ব্যবসায়ের সার্বিক লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে সময়ে সময়ে ব্যাংক উদ্যোক্তাকে পরামর্শ দেয়। সর্বক্ষেত্রে ব্যাংকের নিজের উপস্থিতি থাকে বলে অর্থ অপচয় হওয়ার সুযোগ থাকে না।[৮২]

প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সহায়তা : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগের পূর্বে ব্যাংক সবসময় বিনিয়োগ খাতের শারি'আহ বিশ্লেষণ করে থাকে। ইদানিং প্রযুক্তিগত অপব্যবহার চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে।

Journal for Quality Research, vol. 11, no. 4 (April- September, 2017) : 849, see. DOI:10.18421/IJQR11.04-08, visited on 12.01.2023 AD

৮১. Hanif, 'Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking', p. 12

৮২. Gunputh and Ramgutty, 'Micro-credit in Conventional Banking : Would Islamic Banking be the Golden Age for Entrepreneurs?', p. 5

প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত অর্থ ভুল জায়গায় ভুল পদ্ধতিতে কাজে লাগানো হচ্ছে। এসব বিনিয়োগের কোন সফলতা পরিমাপ করা যাচ্ছে না। আবার, বিনিয়োগকৃত অর্থ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে তার হদিসও পাওয়া যাচ্ছে না। ইসলামি ব্যাংক যখন প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ করে তখন সে খাতের খুঁটিনাটি তথ্য যাচাই করে। কোন বিন্দু পরিমাণ শারি'আহ লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও যদি থাকে তাহলে ইসলামি ব্যাংক সে খাতে বিনিয়োগ করে না। আর ইসলামি ব্যাংক সবসময় উৎপাদনশীল খাতে প্রযুক্তির ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করতে কাজ করে বিধায় শিল্পকারখানা কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে চাইলে ইসলামি ব্যাংক সহজেই তাতে রাজি হয়ে যায়।[৮৩]

ফলে ইসলামি ব্যাংকিং যখন প্রযুক্তিগত খাতে বিনিয়োগ করে তখন সে বিনিয়োগ প্রচলিত ব্যাংকের বিনিয়োগের তুলনায় বেশি ফলপ্রসূ হয়। আবার, ব্যাংকিং কার্যক্রমের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় বর্তমানের ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম আগের তুলনায় অনেক বেশি প্রযুক্তি নির্ভর। তাই শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের দিক থেকেই না, ইসলামি ব্যাংকগুলো নিজের কাজের দিক থেকেও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য সবসময় কাজ করে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু করে ব্যাংকিং খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রাহকদের হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি, ব্যালেন্স ট্রান্সফার, পেমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি, হিসাব খোলা, এটিএম সংক্রান্ত তথ্য, এটিএম থেকে টাকা উত্তোলন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার, কল সেন্টার, ফরেন এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি সকল কাজকর্ম প্রযুক্তির মাধ্যমেই সম্পন্ন হচ্ছে। ইদানিং ইসলামি ব্যাংকগুলো তাদের জন্য বিশেষায়িত প্রযুক্তিগত পদ্ধতি আবিস্কার করছে। এর ফলে প্রযুক্তি ব্যবহারের সময়েও যাতে মায়সির, গারার, রিবা ইত্যাদি নিষিদ্ধ প্রচলনের সম্ভাবনা না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে।

শ্রম বিভাগ এবং মাত্রাগত উৎপাদনে ভূমিকা : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটা অভূতপূর্ব সাফল্য হলো, এটি ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক মানুষকে ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় আনতে সক্ষম। গ্রাহকপ্রতি বিনিয়োগের পরিমাণ যখন হ্রাস পায় তখন নির্দিষ্ট বিনিয়োগ বাজেটের মধ্যে অধিক লোকজন বিনিয়োগ সুবিধা পায়। এভাবে স্বল্প আয়ের লোকজনও বিনিয়োগ সুবিধা পায়। আবার, ইসলামি ব্যাংকসমূহ অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শাখা স্থাপন করে সে সব অঞ্চলের লোকজনকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে পরিচিত করে তুলছে। আগে যেখানে মানুষ ব্যাংকিং কি তাই জানত না সেখানে তারা এখন ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করতে নিজে থেকেই আগ্রহী হচ্ছে। ইসলামি ব্যাংকগুলো যেহেতু স্বল্প আয়ের গ্রাহকদের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা দেয়, তাই গ্রাহকরা কোন সংকোচ ছাড়াই ঘরে বসে না থেকে নিজেদের কোন উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত করতে পারে।

গ্রাহকদের উৎপাদনশীল মনোভাব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। কারণ উৎপাদনের চাকা সচল থাকলেই কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব। আর উৎপাদনের চাকা সচল রাখতে হলে শুধুমাত্র বৃহৎ পরিসরে, শিল্পায়নের মাধ্যমেই যে উৎপাদন করতে হবে তা নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বল্প আয়ের লোকজন, বেকার লোকজন,ভূমিহারা, সর্বহারা লোকজনকেও উৎপাদন কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এভাবে সর্বস্তরের লোকজন যখন উৎপাদন কাজে যুক্ত হবে তখন শ্রম বিভাজন সহজেই সংঘটিত হবে। কারণ বৃহৎ শিল্পে যে সকল পণ্য উৎপাদন হয় সেগুলোর কাঁচামাল ও অন্যান্য

---

৮৩. Bank Negara Malaysia, *Technology and Innovation in Islamic Banking*, ibid, p. 2

আনুষঙ্গিক উপকরণ হয়ত কোন ক্ষুদ্র পরিসরে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে আসে। ফলে একটা বড় পরিসরে উৎপাদিত পণ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে ক্ষুদ্র পরিসরের উৎপাদন খাত। এভাবে একটি সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদনের কাজটি অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে শ্রম বিভাগ সংঘটিত হয়। আর সে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জনপ্রতি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় বলে মাত্রাগত উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৮৪]

অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে ভূমিকা : সম্পদের অসম বণ্টন, উৎপাদন খাতকে গতিশীল করা, উৎপাদিত পণ্যের সফল বণ্টন ব্যবস্থা জোরদার করা এবং কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত জটিলতা এড়ানোর জন্য ইসলামি অর্থব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে শতভাগ সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঝুঁকির পরিমাণ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার তুলনায় বেশি থাকে। ইসলামি ব্যাংকিং-এর মূলনীতি হলো টাকার বিপরীতে অতিরিক্ত টাকার লেনদেন শারি'আহর দৃষ্টিতে হারাম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা এ টাকার বিপরীতে টাকার লেনদেনকেই বেশি উৎসাহিত করে। শারি'আহ ব্যাংকিং-এ যেহেতু টাকার বিপরীতে টাকার লেনদেন হয় না সেহেতু অর্থবাজারের মধ্য দিয়ে ঝুঁকি স্থানান্তর হয় না। আর লেনদেনের এ মডেলটি প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতা ঋণের যে ঝুঁকিতে থাকে সে মডেলের চেয়ে উত্তম।

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক লেনদেনের সাথে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকায় ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়পক্ষই বিনিয়োগের ব্যাপারে বেশি বিচক্ষণ থাকে। আর সে জন্য প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় ইসলামি ব্যাংকগুলো তারল্য বণ্টনে অধিক ভূমিকা পালন করতে পারে। এভাবে তারল্য বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকের হাতে কম অর্থ মজুদ থাকে এবং বিনিয়োগ গ্রহীতাদের হাতে অর্থ সঞ্চালন অধিক হয়। আবার ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতিতে গ্রাহকের পাশাপাশি ব্যাংকও বিনিয়োগ প্রকল্পে লাভের অংশীদার হিসাবে থাকে। তাই গ্রাহকের মুনাফাকে ব্যাংক নিজের জন্যও মুনাফার উৎস হিসাবে দেখে। আর নিজের মুনাফার অংশও যুক্ত থাকায় ইসলামি ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিক সচেতন হয়। এ সকল দিক বিবেচনা করে যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ করে তখন দেশের অর্থনীতির কাঠামো শক্তিশালী হয়। তাই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতির কাঠামো শক্তিশালীকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৮৫]

সামাজিক উপাদানসমূহের উপর ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রভাব : ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সামাজিক কল্যাণ সাধন। কারণ, শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক লাভ-ক্ষতিকে মাথায় না রেখে সমগ্র সমাজের লাভ-ক্ষতি মাথায় রেখেই ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতি কাজ করে।[৮৬] যাকাত, সাদাকাহ, কর্জে হাসানাহ প্রভৃতি পদ্ধতির সৃষ্টিই হয়েছে সামাজিক কল্যাণের জন্য। ইসলামি ব্যাংকিং যাকাত আদায়ের জন্য সমাজের উঁচু স্তরের জনগণকে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সে জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলো ডিপোজিট স্কিমও চালু করতে পারে। সাদাকাহ প্রদানের মাধ্যমে অভাবী জনগণের

---

৮৪. Wibowo, 'Bank Scale of Economies, Banking Industry Concentration, and Competition Level : The Indonesian Case', p. 70

৮৫. Muhamad Abduh and Nazreen T. Chowdhury, 'Does Islamic Banking Matter for Economic Growth in Bangladesh?', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 8 (January, 2012)*, see. https://ibtra.com/pdf/journal/v8_n3_article6.pdf, visited on 08.01.2023 AD

৮৬. Rahman, Sultana and Bhuiyan, 'Differences of Conventional & Islamic Banking Practices: An Empirical Analysis in Bangladesh,' p. 2

অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে। কর্জে হাসানাহ প্রদানের মাধ্যমে সুদমুক্ত ঋণের প্রচলন করে একদিকে যেমন জনগণের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে তেমনি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসরণে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এছাড়া, বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো সামাজিক উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে সেগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো- গরিব, অসহায় মানুষের কল্যাণের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা প্রদান, পরিবেশ সংরক্ষণ, আত্ন-কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং আরও অন্যান্য কর্মসূচি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং-এর ভূমিকা : রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থা বলতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার সামঞ্জস্যকে বুঝায়। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতির কাঠামো শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। আর দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলে। তাই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব দেশের সর্বস্তরে চোখে পড়ার মত। নির্বাচনের বছরে ব্যাংকিং ঋণ প্রদান প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে যায়, যার পিছনে রাজনৈতিক ব্যাপারগুলোই বেশি কাজ করে। ঋণের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণে চাহিদা অপঘাত সৃষ্টি হয় এবং ঋণের যোগানও বৃদ্ধি পাওয়ায় যোগান অপঘাত সৃষ্টি হয়। যদি ঋণ প্রদান সংক্রান্ত ব্যয় ঋণ প্রদানের পরিমাণের তুলনায় বেড়ে যায় তখন বলা যায় যে ঋণ ব্যবস্থা রাজনীতির কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে ঋণ যোগানের অপঘাত বিদ্যমান।

অপরদিকে, ব্যাংক ঋণের পরিমাণের সাথে যখন ঋণের বর্ধিত মূল্যের সম্পর্ক থাকে তখন সে ক্ষেত্রে চাহিদা অপঘাত বিরাজ করে। রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থায় প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে সরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা রাজনৈতিক প্রভাবসম্বলিত পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ বেশি পায়। সে জন্য প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণের কার্যক্রম রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হয়। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি নিজস্ব পৃথক পদ্ধতি আছে। যদি শারি'আহকে যথার্থভাবে মেনে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় তাহলে চাহিদা বা যোগান অপঘাত অথবা কোন রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা একে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। কারণ ইসলামি ব্যাংক ইচ্ছা করলেই রাজনৈতিক সহযোগিতায় শারি'আহ নির্ধারিত পদ্ধতি লঙ্ঘন করতে পারে না। তাই ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার ঘটলে দেশের অর্থবাজার রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।[৮৭]

শিল্পায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রভাব : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করেই টিকে আছে। লাভ-ক্ষতি বণ্টন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। লাভ-ক্ষাত বণ্টন পদ্ধতিতে গ্রাহকের পাশাপাশি ইসলামি ব্যাংক নিজেও শিল্পের কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই গ্রাহকের ক্ষতি অর্থ ইসলামি ব্যাংকেরও ক্ষতি। তাই এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করে। আর শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিনিয়োগ অনেক ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। শিল্পায়নের স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকের লাভ-ক্ষতি বণ্টন পদ্ধতির সুফল খুঁজে পাওয়া যায়।[৮৮]

---

৮৭. Bitar, Walker and Hassan, 'Political Systems and the Financial Soundness of Islamic Banks,' p. 6

৮৮. Rahman and McDonald, 'Economic Development of Bangladesh : The Role of IBBL,' p. 330

কৃষিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রভাব : ইসলামি ব্যাংকগুলো কৃষকদের কর্জে হাসানাহ প্রদান করে কৃষকদের ছোটখাটো প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করতে পারে। এতে করে দরিদ্র কৃষকদের সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে সর্বস্বান্ত হতে হয় না। কৃষিকাজের সরঞ্জাম ক্রয় করতে বিনিয়োগ, পশুপালন খাতে বিনিয়োগ, ফসল উৎপাদন ও মাছের চাষ প্রভৃতি প্রকল্প হাতে নিয়ে ইসলামি ব্যাংকগুলো কৃষি খাতে অবদানের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যভিত্তিক অর্থায়নে ইসলামি ব্যাংকগুলো কৃষকদের সাহায্য করতে পারে। ইসলামি ব্যাংকগুলো নিজেরা যন্ত্রপাতি কিনে তা ইজারার ভিত্তিতে কৃষকদের নিকট ভাড়া দিয়ে কৃষকদের যন্ত্রপাতির অভাব পূরণ করতে পারে। মূলকথা হলো, কৃষি খাতে সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ইসলামি ব্যাংকের অধীনে রয়েছে। তাই কৃষি খাতে ইসলামি ব্যাংকিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৮৯]

বিনিয়োগে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা : ইসলামি ব্যাংকসমূহ গতানুগতিক ব্যাংকিং বিনিয়োগ থেকে নিজেদের পৃথক করে শারি'আহ সমর্থিত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইসলামি ব্যাংকসমূহ নিজেদের বিনিয়োগ খাতের ব্যাপারে খুবই সচেতন। শুধুমাত্র পক্ষপাতিত্ব এবং গ্রাহকদের নিজেদের কথার উপর ভিত্তি করে ইসলামি ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ করে না। ইসলামি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের পিছনে ব্যাংকের নিজেদের লাভ-ক্ষতিও জড়িত থাকে বিধায় ব্যাংক নিজেই প্রকল্পের কাজ তদারকির দায়িত্ব নেয়। আর গ্রাহকগণ ব্যক্তি হিসেবে প্রকল্পের লাভজনক দিকটা যেভাবে যাচাই করতে পারে, ব্যাংক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সে কাজটা আরও দক্ষতার সাথে করতে পারে। ফলে বিনিয়োগের টাকা গ্রাহক ইচ্ছা করলেই ব্যাংক থেকে নিয়ে অন্য কোন খাতে ব্যয় করতে পারে না। ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে প্রকল্পের জন্য বিনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সে খাতেই অর্থ বিনিয়োগ হয়। তাই ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী বিনিয়োগ খাতে ব্যয়ের যে চিত্র ফুটে উঠে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধিও সরকারি হিসাব অনুযায়ী বিনিয়োগ খাতে ব্যয়ের হিসাব মিলে যায়। ফলে প্রকৃত উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করা সহজ হয়।[৯০]

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা : ইসলামি ব্যাংকসমূহ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কৃষিতে বিনিয়োগের ফলে প্রচুর লোক নতুন করে কৃষি খাতে নিজেদের যুক্ত করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বাংলাদেশের মত কৃষিপ্রধান দেশের জন্য এটি অনেক বড় একটা প্রভাব। কারণ বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের বিশাল অংশ কৃষি খাত থেকেই আসে। আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করে বেকার জনগণকে অন্যের অধীনে কাজের আশায় বসে না থেকে নিজের উদ্যোগে আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ করে ইসলামি ব্যাংকসমূহ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পের পরিসর বৃদ্ধি করে শিল্পায়নে ইসলামি ব্যাংকসমুহ অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। শিল্পের পরিসর বৃদ্ধির পেলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিক জনবল দরকার পড়ে। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও বেশি জনবল নিয়োগ দেয়। তাতে সমাজের অধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়। আবার ইসলামি ব্যাংকগুলো শারি'আহ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে জনবল নিয়োগ দেয়। ফলে শারি'আহর ব্যাপারে জ্ঞাত লোকজন যখন ব্যাংকিং কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় তখন

---

৮৯. Muhammad Hanif, 'Difference and similarities in Islamic and Conventional Banking', p. 171
৯০. ibid.

মাকাসিদে শারি'আহ অনুসরণ করা সহজ হয় এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম শারি'আহসম্মত পন্থায় পরিচালনা করা সহজ হয়।[৯১]

দারিদ্র্য বিমোচনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা : ইসলামি ব্যাংকগুলো যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টনে উৎসাহ প্রদান করে। সম্পদের সুষম বণ্টনের পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সহায়তাও যাকাতের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। আবার ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি সরঞ্জামের যোগান দিয়ে তাদের কাজে যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে। চাকরির আশায় বসে না থেকে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে যুবক সমাজ যাতে নিজেদের আয় উপার্জনের পথ উন্মুক্ত করতে পারে ইসলামি ব্যাংকসমূহ সে জন্য বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করে।

বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা : ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বৈদেশিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ পূর্বের বছরের তুলনায় ৪৬শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবাসীরা প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় ইসলামি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। আবার করোনা মহামারীর পর থেকে অনেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়ার কারণে ইসলামি ব্যাংকগুলোর সেবা নিতে বেশি আগ্রহী হচ্ছে। ফলে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৩৫ শতাংশ যা ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে এবং ২০২০ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত তা ছিল ৫০ শতাংশ। শুধুমাত্র ইসলামি ব্যাংকগুলোই না, বরং প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলো থেকেও ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স পূর্বের তুলনায় ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৯২]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইসলামি ব্যাংকগুলো যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রসারিত বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর কারণে। ইসলামি ব্যাংকগুলো যে দক্ষতার সাথে মূলধন স্থানান্তরের কাজ করতে পারে প্রচলিত ব্যাংকিং-এর তা ধারণায়ও থাকে না। আর শারি'আহ পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা হওয়ার কারণে ব্যবসায়ীদের আস্থার জায়গাটা ইসলামি ব্যাংকগুলো ধরে রাখতে সক্ষম। আবার ইসলামি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হওয়ায় মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্কও বজায় রাখা সম্ভব হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুদ ছাড়াও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্ভব। এক সময় ধারণা করা হত, ব্যাংকব্যবস্থা কখনো সুদমুক্ত হতে পারে না। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকগুলোর বর্তমান অবদান, সুদমুক্ত কার্যাবলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে গবেষণা এবং এ বিষয়ে বিশদ জ্ঞান অর্জনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে জনগণের মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধারণাগত পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়েই সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রসারে নিরলস কাজ করে যেতে হবে।

---

৯১. Rahman and McDonald, 'Economic Development of Bangladesh : The Role of IBBL,' p. 328
৯২. ibid, p. 329

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রসারে সুপারিশমালা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে ইসলামি ব্যাংকসমূহের বর্তমান পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। সে সাথে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত কর্মীদের ইসলামি ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য লাভ করার ব্যাপারে আরও সচেতনতা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকগুলোর জন্য নিম্নে উল্লিখিত কিছু সুপারিশমালা প্রস্তাব করা প্রয়োজন।

গ্রিন ব্যাংকিং-কে উৎসাহিত করা : সরকার ইসলামি ব্যাংকগুলোতে আরও বড় পরিসরে গ্রিন ব্যাংকিং কার্যকর করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারে, যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের অহেতুক ব্যবহার রোধ করা যায়। এ লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে গ্রিন ব্যাংকিং-এর উপকারিতা প্রচার করে এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা যায়। কেন্দ্রিয় ব্যাংক থেকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ডিপ্লোমা, শর্ট কোর্স প্রভৃতি আয়োজন করা যায়।[৯৩]

মুদারাবা এবং মুশারাকা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার : মুদারাবা এবং মুশারাকা অর্থায়ন পদ্ধতি ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা বর্তমানে যে পর্যায়ে এসেছে তা এ দু'টি পদ্ধতির অবর্তমানে সম্ভব হত না। ইসলামের শুরুর সময় থেকে এ দু'টি পদ্ধতি ব্যবসা বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে আসছে। তাই মুদারাবা এবং মুশারাকা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার না ঘটলে ইসলামি ব্যাংকিং-কে সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে না।[৯৪]

দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিহতকরণ : বাংলাদেশে এখন ১৬টির মত প্রচলিত ব্যাংক আছে যারা ইসলামি ব্যাংকিং শাখা খুলে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে করে একদিকে তারা শারি'আহসম্মত ব্যাংকিং পরিচালনা করছে বলে দাবি করে, অপরদিকে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদের ব্যবসার সাথেও নিজেদের জড়িয়ে রাখছে। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর এরূপ দ্বিমুখী নীতি ইসলামি ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই সরকারের উচিত কোন প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামি ব্যাংকিং শাখা খুলে দ্বৈত ব্যাংকিং পদ্ধতি অবলম্বন করে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ না দেয়া। বরং, ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে দেশে ইসলামি ব্যাংকের সংখ্যা বাড়ানো সময়ের দাবি।[৯৫]

ইসলামি পুঁজি বাজার প্রতিষ্ঠা করা : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং অনেক পূর্ব থেকে চলমান থাকলেও ইসলামি পুঁজি বাজার এখনো তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার সুকুক ইস্যু করার অনুমতি দিলেও তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়নি। ইসলামি পুঁজি বাজারকে যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা পরোক্ষভাবে ইসলামি ব্যাংকিং খাতেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রচুর

---

৯৩. S. M. Abu Zaker, 'Islamic Banking in Bangladesh : an Alluring Prospect Ahead', *Bangladesh Journal of Political Economy*(Dhaka : Bangladesh Economic Association, w.d), p. 27, see. https://bea-bd.org/site/images/pdf/new17/115.pdf, visited on 05.01.2023 AD

৯৪. ibid.

৯৫. ibid.

বিনিয়োগকারী সুকুকে বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহী। তাই সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[৯৬]

বায়'-মুআজ্জাল ও বায়'-মুরাবাহার ক্ষেত্রে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন : বায়'-মুয়াজ্জাল ও বায়'-মুরাবাহা সাধারণত সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে গ্রাহকগণ চুক্তির সমন্বয়ের জন্য কিছুটা বাড়তি সময় দাবি করে থাকে যা কেন্দ্রিয় ব্যাংক থেকে এ বিষয়ক নীতিমালা না থাকার কারণে ব্যাংকের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় না। তার উপর ঐ এক বছর সময়ের মাঝে মুরাবাহার যে লভ্যাংশ (Mark-up) তা নিঃশেষ হয়ে যায় বলে ব্যাংকার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারে না। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের করার জন্য কেন্দ্রিয় ব্যাংক থেকে নীতিমালা প্রণীত হওয়া উচিত।[৯৭]

আন্তর্জাতিক সুদি বাজার মুকাবেলা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদকে পাশ কাটিয়ে কোন কাজ করা খুব মুশকিল। ইসলামি ব্যাংকগুলো যখন বিদেশি কোন ব্যাংকে থাকা তাদের হিসাবে সুদ পায় তখন তা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকগুলো তা সওয়াব ছাড়াই মানবকল্যাণে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু যখন সুদ প্রদান করতে হয় তখনও সুদের কারবার থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের ইসলামি ব্যাংকগুলোর সমন্বয়ে একটি ইসলামি আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠিত হতে পারে এবং বাংলাদেশ সেখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।[৯৮]

আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়তা : উপযুক্ত সুযোগ অনুযায়ী এলসি খোলা, দর কষাকষি এবং এড কনফার্মেশন ইত্যাদি আমদানি রপ্তানির সাথে জড়িত ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলোকে মনোনীত করা যেতে পারে যাতে বিশ্বে ইসলামি ব্যাংকের পরিচিতি বিস্তার লাভ করতে পারে।[৯৯]

পৃথক এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ : বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকগুলো পৃথক কোন এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে না। বর্তমানে ইসলামি এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)-এর স্ট্যান্ডার্ডগুলো সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত। বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকগুলোর উচিত AAOIFI-এর সদস্য পদ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে তাদের এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।[১০০]

ঋণপত্রের ক্ষেত্রে পৃথক নিয়ম অনুসরণ : Uniform Customs Practice for Documentary Credit (UCP-600)-এর আর্টিকেল-৫ অনুসারে প্রচলিত ব্যাংকগুলো এলসি খোলার ক্ষেত্রে পণ্য ও সেবার চেয়ে পণ্য ও সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বেশি যাচাই করে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকগুলো পণ্য ও সেবাকে আগে বিবেচনা করে যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তাই ইসলামি ব্যাংকগুলোর ঋণপত্রের ক্ষেত্রে পৃথক নিয়ম অনুসরণ করা উচিত।[১০১]

---

৯৬. S. M. Abu Zaker, 'Islamic Banking in Bangladesh : an Alluring Prospect Ahead', *Bangladesh Journal of Political Economy*, ibid, p. 27
৯৭. ibid.
৯৮. ibid.
৯৯. ibid, p. 28
১০০. ibid.
১০১. ibid.

সম্পদ দ্বারা সমর্থিত বিনিয়োগ বৃদ্ধি : ইসলামি ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে সকল বিনিয়োগ কোন না কোন সম্পদ দ্বারা সমর্থিত থাকে। তাই বিনিয়োগকৃত অর্থ খেলাপি ঋণের আওতায় যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ঝামেলাও ব্যাংককে কম পোহাতে হয়। সম্পদ দ্বারা সমর্থিত এ বিনিয়োগ ব্যবস্থা সরাসরি উদ্যোক্তাদের আর্থিক ঋণ প্রদানের চেয়ে উত্তম। তাই প্রচলিত ব্যাংকগুলোরও এমনভাবে বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু করা উচিত যা সম্পদ দ্বারা সমর্থিত হয়। তাহলে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমবে।[১০২]

বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা : ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রবৃদ্ধির জন্য বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত যাতে ইসলামি লেনদেনের প্রকৃতি যাচাই করার জন্য এবং ইসলামি পদ্ধতিতে চুক্তির যথার্থতা নিরূপণের জন্য সঠিকভাবে শারি'আহ আইনের বিশ্লেষণ করা যায়।[১০৩]

নতুন বিনিয়োগ পদ্ধতির উদ্ভাবন : লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে বিনিয়োগে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন বিনিয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা উচিত। এ লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় খাতসমূহে পরীক্ষামূলক বিনিয়োগ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। আর এ ধরনের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা শহর এবং গ্রামীণ উভয় পর্যায়ে করা যেতে পারে। তাতে করে সব ধরনের পরিবেশেই লাভ-ক্ষতি পদ্ধতিতে বিনিয়োগের জন্য জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা জানা যেতে পারে।[১০৪]

প্রচার পদ্ধতির পরিবর্তন : বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো যেভাবে নিজেদের কার্যক্রম জনগণের সামনে উপস্থাপন করে তাতে প্রচলিত ব্যাংক এবং ইসলামি ব্যাংকের মাঝে কোন পার্থক্য করা যায় না। ইসলামি ব্যাংকগুলোর উচিত নিজেদের কার্যাবলি এমনভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা যাতে জনগণ সহজেই বুঝতে পারে যে, ইসলামি ব্যাংকিং শুধুমাত্র লভ্যাংশ ভোগকারী কোন ব্যাংকিং পদ্ধতি নয়। ইসলামি ব্যাংকিং-এর কল্যাণমূলক দিকটি সামনে তুলে ধরতে হবে। সম্পদে মহান আল্লাহর মালিকানার ধারণাটি জনগণের মাথায় প্রবেশ করাতে হবে।[১০৫]

সঠিক তদারকি ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ : ইসলামি অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি আয়ের সুষম বণ্টনের দিকে গুরুত্বারোপ করে। তাই ইসলামি ব্যাংকগুলোর আয়ের সুষম বণ্টন সঠিকভাবে হচ্ছে কি না সেদিকে তদারকি করতে হবে। প্রথমে ব্যাংক নিজের এবং তার আমানতদাতা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে আয়ের সুষম বণ্টন হচ্ছে কি-না সেদিকে খেয়াল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমাজের অন্যান্য শ্রেণি ও পেশার জনগণের মাঝে আয়ের সুষম বণ্টনের সুফল পৌঁছাচ্ছে কি না সেটাও ইসলামি ব্যাংকগুলোর তদারকি করতে হবে।[১০৬]

---

১০২. Abdul Awwal Sarker, 'Islamic Banking in Bangladesh : Achievements & Challenges', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, vol. 1, no. 1 : 5, http://www.ibtra.com/pdf/journal/v1_n1_article5.pdf, visited on 04.01.2023 AD

১০৩. ibid, p. 9

১০৪. ibid.

১০৫. ibid.

১০৬. Abdul Awwal Sarker, 'Islamic Banking in Bangladesh : Achievements & Challenges', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, ibid, p. 9

সম্পদ বণ্টন দক্ষতা বৃদ্ধি : ইসলামি ব্যাংকগুলোকে তাদের লভ্যাংশ বণ্টন পদ্ধতি উন্নত করতে হবে। সে সাথে মুনাফা বৃদ্ধির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। সে জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলোকে বিনিয়োগের জন্য গ্রাহক নির্বাচনে আরও সচেতন হতে হবে। স্বল্প আয়ের জনগণের উপযোগি সম্পদ থেকে উচ্চ আয়ের জনগণের কাছে সম্পদের রাতারাতি স্থানান্তর না করে স্বল্প আয়ের জনগণের সমাজের সম্পদ তাদের মাঝেই সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করলে সম্পদ বণ্টনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।[১০৭]

সামাজিক কল্যাণ বিবেচনা করে বিনিয়োগ বণ্টন : ইসলামি ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ সামাজিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বণ্টন করা উচিত। এ ক্ষেত্রে তারা যে কাজগুলো করতে পারে তা হলো নিম্নরুপ :

প্রথমত, ইসলামি ব্যাংক তাদের বিনিয়োগযোগ্য অর্থ সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য যে সকল খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ দরকার সে সব খাতে বিনিয়োগের জন্য নির্বাচন করতে পারে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগের উপযুক্ত খাত হিসেবে কৃষি, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্যের খাত (গার্মেন্টস, চিংড়ি চাষ) ইত্যাদিকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাতগুলো নির্বাচনের পর খাতগুলোর কোনটায় কি পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, অগ্রাধিকার খাতগুলোর মাঝে কোন খাত থেকে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা কিরূপ তা নিরূপণ করতে হবে।[১০৮]

দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির প্রসার : ইসলামি ব্যাংকিং সামাজিক কল্যাণের নীতিতে বিশ্বাসী। তাই, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির প্রসার ইসলামি ব্যাংকিং-এর অধীনে বেশি পরিমাণে হওয়া উচিত। কারণ দরিদ্র জনগণের মাঝে শিক্ষার অভাব খুব স্বাভাবিক। আর প্রচলিত ব্যাংকিং যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুদের বিনিময়ে কল্যাণের আশা দেখিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো শুরু করে তাহলে দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত জনগণের সুদের কুফল অনুভব করার সুযোগ থাকবে না। সামাজিক কল্যাণের সে জায়গাটা যদি ইসলামি ব্যাংকগুলো দখল করতে পারে তাহলে প্রকৃত কল্যাণ যেমন সম্ভব হবে, তেমনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামি ব্যাংকিং-এর ব্যাপারে একটা সু ধারণা সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে।[১০৯]

প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামো প্রণয়ন : বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় ব্যাংক সম্পূর্ণ সুদি ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রচলিত তফসিলি ব্যাংকগুলোর মত ইসলামি ব্যাংকগুলোকেও বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদি ব্যবস্থার নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। বিশেষ করে তারল্য ও রিজার্ভ ফান্ডের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ইসলামি ব্যাংকের জন্য পৃথক কোন নীতিমালা নেই। এ ব্যাপারে সরকারের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি উদ্যোগ না নেয়া হয় তাহলে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রসার আশানুরূপভাবে করা সম্ভব না।[১১০]

---

১০৭. Abdul Awwal Sarker, 'Islamic Banking in Bangladesh : Achievements & Challenges', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, ibid, p. 9

১০৮. ibid.

১০৯. ibid.

১১০. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৬২

ইসলামি বীমা অথবা তাকাফুল কোম্পানির প্রসার : বাংলাদেশে এখনো ইসলামি বিমা বা তাকাফুল কোম্পানির প্রসার ঘটেনি। প্রচলিত আইনে ব্যাংকের বিমা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইসলামি ব্যাংকগুলোর সকল কাজ শারি'আহভিত্তিতে পরিচালিত হলেও বিমার ক্ষেত্রে তাকাফুল কোম্পানির প্রসার না থাকায় প্রচলিত বিমা কোম্পানির অধীনে বিমা করতে হয়। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও প্রচলিত বিমা কোম্পানির সুদ ইসলামি ব্যাংকিং-এর মধ্যে প্রবেশ করছে। তাই তাকাফুল কোম্পানির প্রসার ঘটানো এবং এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ আবশ্যক।[১১১]

বিশ্বের সকল দেশে শাখা প্রসার : বিশ্বের অনেক দেশেই ইসলামি ব্যাংকের শাখা থাকলেও তা অপর্যাপ্ত। আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের যোগাযোগ রাখতে হয়। এমতাবস্থায়, এমন কোন দেশের সাথে যখন যোগাযোগ রাখা দরকার পড়ে যে দেশে ইসলামি ব্যাংকের শাখা নেই, তখন বাধ্য হয়েই সে দেশের সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেনে অংশগ্রহণ করতে হয়। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামি ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

ইসলামি ব্যাংকারদের মাঝে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের অভাব : ইসলামি ব্যাংকগুলোতে জনবল নিয়োগের পর প্রাথমিকভাবে ইসলামি ব্যাংকিং-এর উপর কিছু প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও তা শারি'আহসম্মত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্ঠ নয়। ইসলামি ব্যাংকগুলোতে যারা কর্মরত রয়েছেন তাঁদের ইসলামি অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং-এর উপর বিশদভাবে অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। ইসলামি অর্থনীতির ব্যাপারে গভীরজ্ঞান না থাকার কারণে সুদি ব্যাংকের কর্মী এবং ইসলামি ব্যাংকের কর্মীদের ব্যাংকিং দক্ষতার মাঝে সহজে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না।

আবার আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর ব্যাপারে কোন ডিগ্রি চালু না থাকায় উচ্চ মাধ্যমিকের পর কেউ চাইলেও এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। শুধু স্কুল, কলেজ নয়, মাদ্‌রাসাগুলোতেও ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে কোন ডিগ্রি চালু নেই। তাই কেউ ইচ্ছা করলেও ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। ফলে ইসলামি ব্যাংকগুলোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে সুদি ব্যাংকিং-এ অভিজ্ঞ জনবল এনে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফলে ইসলামি ব্যাংকিংকে যেভাবে প্রচার করা দরকার সেভাবে তারা প্রচার করতে পারেন না। তাই ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ইসলামি ব্যাংকগুলোতে কর্মরত কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা উচিত।

সুদভিত্তিক মন মানসিকতা পরিবর্তনে সচেতনতা সৃষ্টি : সুদি ব্যাংক থেকে যে সকল কর্মী ইসলামি ব্যাংকে যোগদান করেন তাদের মাঝে সুদি ব্যবসার মন মানসিকতা বিদ্যমান থাকে। আবার সুদি ব্যাংকের সেবা নিয়ে অভ্যস্ত গ্রাহকদের মাঝেও সুদি ব্যবসায়ের মনোভাব বিদ্যমান থাকে। তাই আপাতঃদৃষ্টিতে সুদি ব্যাংকিং এবং ইসলামি ব্যাংকিং-এর মাঝে পার্থক্য তাদের বোধগম্য হয় না। ইসলামি ব্যাংকগুলোর উচিত কর্মী নিয়োগের সময় ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে প্রার্থীর প্রাথমিক ধারণা যাচাই করে নেয়া। আবার কর্মী নির্বাচনের পর কেবলমাত্র ইসলামি ব্যাংকিং-এর ব্যাপারে সামান্য ধারণা না দিয়ে, ইসলামি ব্যাংকিং-এর মূল কর্মপদ্ধতি হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আবার ইসলামি ব্যাংকগুলোর উচিত সাধারণ জনগণের মন থেকে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং-এর ধারণা পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।[১১২]

---

১১১. মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১১২. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি অর্থনীতি বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ : বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তো নয়ই, এমনকি মাদ্‌রাসাগুলোতেও ইসলামি অর্থনীতির বিষয়ে কোন বিশদভাবে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ নেই। অথচ প্রতিটি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও অর্থনীতি বিষয়ে সর্বদা জ্ঞান অর্জনের সুযোগ আছে। তাই ইসলামি অর্থনীতি, ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং নিয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন বিভাগ চালু করতে হবে।[১১৩]

ইসলামি ব্যাংকগুলোর পরস্পরের মাঝে সহযোগিতা : বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ইসলামি ব্যাংকের সংখ্যা ১০টি। ইসলামি পন্থায় পরিচালিত ব্যাংকগুলোর মধ্যে যে হৃদ্যতা থাকা দরকার তা বিদ্যমান নেই। ইসলামি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবসময় প্রতিযোগিতামূলক একটা সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামি ব্যাংকগুলো প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে যদি নিজেদের মাঝে সম্মিলিতভাবে দেশের স্বার্থে কাজ করার মনোভাব গড়ে তুলে তাহলে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রসার আরও বিস্তৃত করা সম্ভব।

ইসলামি পন্থায় বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি : সাধারণ জনগণের চিন্তাভাবনায় যদি সুদভিত্তিক চিন্তাভাবনা বিরাজ করে তাহলে লেনদেনের শারি'আহসম্মত পন্থা সেখানে স্থান করতে পারে না। অধিক এবং রাতারাতি সম্পদের মালিক হওয়ার আশায় কারো মনে যদি শারি'আহসম্মত পন্থা থেকে সরে আসার মানসিকতা থাকে তাহলে তার মধ্যে ইসলামি অর্থনীতির বীজ বপন করা খুবই জরুরি। এ ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকগুলো গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারে। ইসলামি ব্যাংকগুলো আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ঢেলে সাজানোর জন্য বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নিতে পারে।

মুদারাবা পদ্ধতির শারি'আহসম্মত ব্যবহার : মুদারাবা পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার এখনো ব্যাংকার এবং ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রসারিত হয়নি। ইসলামি ব্যাংক যখন মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে তখন ব্যাংক সাহিবুল মাল হিসাবে কাজ করে আর উদ্যোক্তারা মুদারিব হিসেবে কাজ করে। মুনাফা বণ্টনের পূর্ব নির্ধারিত হার অনুযায়ী ব্যাংক এবং উদ্যোক্তা মুনাফা বণ্টন করে নেয়ার কথা। কিন্তু ক্ষতি হলে তা ব্যাংককে একাই বহন করতে হয়। উদ্যোক্তা কোন ক্ষতি বহন করে না। ইসলামি ব্যাংকগুলো বড় পরিসরে সৎ ব্যবসায়ীর অভাবে এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। কারণ, উদ্যোক্তাদের ক্ষতি বহন করতে হয় না বলে তারা অনেক সময় মুনাফা গোপন করে। অনেক সময় পুরো বিনিয়োগকৃত অর্থই ক্ষতি হয়েছে বলে দেখিয়ে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে ব্যাংককে ক্ষতি বহন করতে হয়। অথচ প্রকৃত অর্থে কোন ক্ষতিই হয়নি। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য ইসলামি ব্যাংকের নিজের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বিনিয়োগকৃত প্রকল্পে সরাসরি তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। আর এ ব্যাপারে ব্যাংকের শারি'আহ অডিটিং বিভাগকে আরও জোর দিতে হবে।[১১৪]

মুশারাকা পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার : মুশারাকা পদ্ধতিও ইসলামি বিনিয়োগের একটি উত্তম বিনিয়োগ পন্থা। ইসলামি ব্যাংকগুলো এ ক্ষেত্রেও বিনিয়োগে নিরাপত্তার অভাবে ভুগে। মুশারাকা পদ্ধতিতে ক্ষতি ব্যাংক এবং উদ্যোক্তা উভয়কেই বহন করতে হয়। তাই মুনাফার পরিমাণ এক্ষেত্রেও গোপন

---

১১৩. ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আমিন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১১৪. Investment Administration Division, *Investment Operation Manual*(Dhaka : Public Relations Division, IBBL, 2016 AD), p. 34

রাখার প্রবণতা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও ব্যবসার তদারকিতে ব্যাংকের সরাসরি তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।[১১৫]

প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ : ইসলামি ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকিং-এর চেয়ে বেশি জনবল প্রয়োজন হয়। কারণ, প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের চেয়ে ইসলামি ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে কিছু কাজ অতিরিক্ত করতে হয় যেগুলোর জন্য অধিক জনবল প্রয়োজন। আবার ইসলামি ব্যাংকিং-এর অতিরিক্ত কর্ম সম্পাদন করার জন্য অধিক জনবল দরকার বলে ইসলামি ব্যাংকগুলোকেও বেশি জনবল নিয়োগের ঝামেলা পোহাতে হয়। অধিক জনবল নিয়োগ একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ অপরদিকে ব্যয়বহুলও। তাই ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সহজে এবং কম জনবল দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য ইসলামি ব্যাংকিং-এর নামে সুদি ব্যাংকের প্রক্রিয়াতেই কাজ সম্পাদন করে ফেলে। কিন্তু এই চর্চা বন্ধ করা আবশ্যক। অধিক জনবল সহজে নিয়োগের জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলোর মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের নতুন কর্মী নির্বাচন পদ্ধতির উদ্ভাবন করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত।

কর ব্যবস্থায় ইসলামি নীতিমালার অন্তর্ভুক্তিকরণ : সরকারের উচিত কর ব্যবস্থায় ইসলামি নীতিমালার অনুপ্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করা। কারণ কর ব্যবস্থায় ইসলামি নীতিমালার অনুপ্রবেশ না ঘটালে শারি'আহসম্মত উপায়ে অর্জিত অর্থও কালো টাকায় পরিণত হয়ে যেতে পারে। এ ভুলভাবে উপস্থাপিত কালো টাকা অপচয় হতে পারে অথবা বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ইসলামি নীতিমালার অনুপ্রবেশ ঘটলে অনেক শারি'আহসম্মত উপার্জন কর ব্যবস্থায় রিটার্ন দাখিলের সময় দেখানো সহজ হবে।

প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা : বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকগুলোর যে প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট আছে তা কেবলমাত্র সে ব্যাংকের কর্মীদের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং, ইসলামি বিমা এবং ইসলামি পুঁজি বাজার নিয়ে জনসাধরণকে ধারণা দেয়ার জন্য তেমন কোন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নেই। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইদানিং কয়েকজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এ ধরনের প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট চালু করলেও প্রচারের অভাবে তা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। প্রচলিত ব্যাংকিং, বিমা এবং পুঁজি বাজারের প্রশিক্ষণের প্রতিযোগিতায় ইসলামি ব্যাংকিং, বিমা এবং পুঁজি বাজারের জ্ঞানকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অধিক পরিমাণে প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলোর ব্যাপক প্রচারণার বিকল্প নেই।

অনাদায়ি ঋণ আদায়ের জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ : ইসলামি ব্যাংকগুলোর অনাদায়ি ঋণ আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচলিত অনাদায়ি ঋণ আদায়ের জন্য প্রণীত নীতিমালা উপযোগী নয়। কারণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রণীত নীতিমালা সুদি ব্যাংকের উপযোগী করে প্রণীত হয়েছে। সুদি ব্যাংক ঋণ অনাদায়ে সময় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে যতটুকু সুদ ধার্য হয় তার চেয়েও অতিরিক্ত সুদ আদায় করে। কিন্তু ইসলামি অর্থব্যবস্থায় এভাবে ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় রিবার অন্তর্ভুক্ত। তাই ইসলামি ব্যাংকগুলো এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে না। তাই প্রচলিত আইনে অনাদায়ি ঋণ আদায়ের জন্য ইসলামি ব্যাংকগুলো কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। এ ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ জরুরি।[১১৬]

---

১১৫. সম্পাদনা পরিষদ, *আইবিবিএল শরী'আহ ম্যানুয়াল*(ঢাকা : শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট, আইবিবিএল, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৬০

১১৬. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

শারি'আহ কাউন্সিলের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি : বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিটি ইসলামি ব্যাংকেরই নিজস্ব শারি'আহ কাউন্সিল আছে। উচ্চ পর্যায়ের আলেম, উলামায়ে কিরাম,, ফক্বিহ, আইন বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের সম্মিলনে শারি'আহ কাউন্সিলগুলো গঠিত হয়। ইসলামি ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম শারি'আহসম্মত উপায়ে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা নিরীক্ষণের জন্যই শারি'আহ কাউন্সিল গঠিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ইসলামি ব্যাংকগুলোর শারি'আহ কাউন্সিলের সদস্যগণের দক্ষতা সন্তোষজনক নয়। যে সকল উলামায়ে কিরাম, ফক্বিহগণ শারি'আহর ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাদের কারো অর্থব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ধারণা নেই। আবার যে সকল অর্থনীতিবিদ, আইন বিশেষজ্ঞ শারি'আহ কাউন্সিলের সদস্য তাদের কারো শারি'আহর ব্যাপারে বিস্তারিত ধারণা নেই। কিন্তু ইসলামি অর্থব্যবস্থা শারি'আহ ও অর্থনীতির সম্মিলিত জ্ঞান ছাড়া অচল। তাই শারি'আহ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনের সময় শারি'আহ এবং অর্থনীতির সম্মিলিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করা জরুরি।[১১৭]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং খাতের উপযোগী আইন এবং শক্তিশালী তদারকির ব্যবস্থা প্রণয়ন না করা হলে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর সুফল দৃষ্টিগোচর হতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হবে। তাই সুদি কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত জাল থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য সকল পক্ষেরই তৎপরতা প্রয়োজন।

১১৭. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং*(ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৬২৩

উপসংহার

উপসংহার

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। ক্ষুদ্র জনপদ থেকে একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হতে বাংলাদেশ বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র জনপদের পৃথক শাসনব্যবস্থার পর মৌর্যযুগে বাংলা সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যরূপে একত্রিত হয়ে আবির্ভূত হয়। মৌর্যযুগের পরবর্তী ৫০০ বছরের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস অতিক্রম করে গুপ্ত শাসনের সূত্রপাত হয়। গুপ্ত শাসনের সময়ে ক্ষুদ্র জনপদগুলো একত্রিত হওয়া শুরু করে। গুপ্ত সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জনপদের একীভূত হওয়ার মাধ্যমে উত্তর ভারতীয় অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলার সম্পৃক্ততা শুরু হয়। পরবর্তী কিছু কাল শাসকগণের অদক্ষতার কারণে বাংলার প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্লান অবস্থায় বিরাজমান হলেও পাল বংশের উত্থানের ফলে ধ্বংসপ্রায় বাংলার অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। সর্বশেষে সেন শাসনের মাধ্যমে বাংলার প্রাচীন যুগের সমাপ্তি ঘটে। এ সকল শাসনামলেই অর্থব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যের অধিপতিগণের প্রণীত নিয়মানুযায়ীই পরিচালিত হয়েছে।

বাংলার মধ্যযুগে মুসলিম শাসকগণের আধিপত্য বিরাজ করায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে মুসলিমদের সমর্থিত বিধি-বিধানের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। খলজি শাসন, তুর্কি শাসন, বলবন শাসন, ইলিয়াস শাহি শাসন, মাহমুদ শাহি শাসন, হোসেন শাহি শাসন, মুঘল শাসন এবং নবাবি শাসন অতিক্রম করে বাংলার আধুনিক যুগের শুরু হয়। বাংলার আধুনিক যুগে ইউরোপিয় শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্য শুরু হয়। বাংলার ধন-সম্পদ প্রাচুর্যের কথা সুদূর ইউরোপেও প্রচারিত হওয়ায় ইউরোপিয় বণিকরা অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদনের আশায় বাংলার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হতে শুরু করে। এক পর্যায়ে বাংলার শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় এবং দীর্ঘ ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশরা প্রস্থান করে।

ব্রিটিশ শাসনামলের পর বাংলা পাকিস্তানি শাসনের অধীনে আসলে অর্থব্যবস্থায় পাকিস্তানি শাসকদের নির্ধারিত নিয়মনীতির আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের ফলস্বরূপ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি নিজেদের রাষ্ট্রভাষার অধিকার লাভ করে এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে উত্তরণের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সে সময় অর্থব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদান সবচেয়ে বেশি। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা ধীরে ধীরে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে থাকে। আর উন্নয়নের এ মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপদান হিসেবে দেখা দেয়।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে করোনা ভাইরাসের আবির্ভাব এবং ২০২২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বাংলাদেশের উপরও আঘাত হানে। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং বলিষ্ঠ

নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে শুরু করে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, আর্থিক প্রণোদনা সরবরাহ, মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন– প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে আরও অগ্রসর হয়েছে। কৃষি, শিল্প, বিদুৎ, পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে অভুতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আর্থিক প্রণোদনা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ভাতা প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ উন্নয়নকে নির্দেশ করার জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক উভয় প্রকার নির্ধারকসমূহকেই গণ্য করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ, মূলধন, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তি, শ্রম বিভাগ ও মাত্রাগত উৎপাদন অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন– এগুলো অর্থনৈতিক নির্ধারক। আর সামাজিক উপাদান, রাজনৈতিক উপাদান, সুশাসন ও প্রশাসনিক দক্ষতা এবং ধর্মীয় উপাদান– এগুলো অ-অর্থনৈতিক উপাদান। আর এ উপাদানগুলোর উপর ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা তফসিলি ও অ-তফসিলি এ দু'ভাগে বিভক্ত। তফসিলি ব্যাংকগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, বিদেশি ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত। পুঁজিবাদি, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র এবং ইসলামি সকল প্রকার অর্থব্যবস্থার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। ইসলামি অর্থনীতি মহান আল্লাহর নির্দেশিত ও রসুল সা. কর্তৃক প্রদর্শিত অর্থব্যবস্থা। তাই ইসলামি অর্থনীতির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকিং পদক্ষেপ সবচেয়ে বেশি জরুরি।

ইসলামি অর্থনীতি ইসলামি আইনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত অর্থব্যবস্থা। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস– ইসলামি আইনের মূল উৎস। ইসলামি আইনের উৎসসমূহ থেকেই ইসলামি অর্থব্যবস্থার বিধি-বিধান উৎকলিত হয়েছে। বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রসার মূলত স্বাধীনতার পর শুরু হলেও পঞ্চাশের দশক থেকেই উপমহাদেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থা নিয়ে উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০টি ইসলামি ব্যাংক রয়েছে। সে সাথে ৯টি প্রচলিত ব্যাংক ৪১টি ইসলামি ব্যাংকিং শাখা পরিচালনা করছে এবং ১৩টি প্রচলিত ব্যাংক ৪৩৪টি ইসলামি ব্যাংকিং বিভাগ পরিচালনা করছে।

বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকগুলো এ দেশের জনগণের জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইসলামি অর্থনীতিতে সুদের নিষিদ্ধতাই বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রসারের মূল কারণ। সুদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সচেনতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থের লেনদেন থেকে বিনিময়হীন অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ করাকেই সুদ নামে অভিহিত করা হয়। সুদের অর্থনৈতিক কুফল যেমন রয়েছে– তেমনি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক কুফলও রয়েছে।

সুদের বিবিধ কুফলের কারণেই সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামি ব্যাংকগুলো নিরলসভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির

নির্দেশকগুলোর উপর ব্যাংকার ও গ্রাহক– উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে জরিপ পরিচালনা করে ইতিবাচক প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার নির্দেশকের উপর সুদের নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান। তাছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবিধ খাতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামি ব্যাংকিং সুদমুক্তভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে সুদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহকে রক্ষা করতে সক্ষম।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রচলিত ব্যাংক এবং ইসলামি ব্যাংক পাশাপাশি অবস্থান করে কাজ করলেও সুদের কারণে উভয় ব্যাংকব্যবস্থার কার্যপদ্ধতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর উপকারিতা বিবেচনা করে দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিহার করে সঠিকভাবে ইসলামি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করা বর্তমানে সবচেয়ে জরুরি। ইসলামি পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা, ইসলামি বিনিয়োগ ব্যবস্থার জন্য সঠিক ও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইসলামি ব্যাংকিং-এর নীতি অনুসরণ করা।

সর্বোপরি সঠিক তদারকিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুদমুক্ত কার্যাবলি পরিচালনার জন্য ইসলামি ব্যাংকের প্রসার ঘটানো সম্ভব। এ ছাড়া, সরকারি উদ্যোগে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধা প্রচার, জনসচেতনতা সৃষ্টি, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর অগ্রাধিকার প্রদান, কর ব্যবস্থায় সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর নীতিমালা অন্তর্ভুক্তিকরণ, সরকারি উদ্যোগে শারি'আহ কাউন্সিলের তদারকি বাধ্যতামূলককরণ প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের তৎপরতার মাধ্যমেই ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রসার ঘটিয়ে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার সুফল ভোগ করা সম্ভব।

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি

(এ জরিপ শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য)

সাক্ষাৎকার বিবরণী (ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ)
(Questionnaire for the Banker and Customer)

বর্তমান দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থবাজারে শারি'আহসম্মত অর্থব্যবস্থা এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকিং বেশ পরিচিত একটি বিষয়। ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বে ইসলামি অর্থব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর চর্চা বেড়ে চলেছে। তাই বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কতটুকু অবদান রাখছে তা নিরূপণ করাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলির উত্তর প্রদান করে উক্ত গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করতে আমাকে অনুগ্রহপূর্বক সহযোগিতা করবেন বলে আশা করছি।

'ক' বিভাগ : জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত প্রশ্ন

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহ আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা অনুমোদিত। আপনার তথ্য সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো। তথ্য প্রদান করে সহায়তা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

(১) নাম ও পদবি : ... ...
(২) বয়স (বছরে) : ... ...
(৩) লিঙ্গ : (অ) পুরুষ (আ) নারী
(৪) বৈবাহিক অবস্থা : (অ) বিবাহিত (আ) অবিবাহিত
(৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা : (অ) এসএসসি/সমমান (আ) এইসএসসি/সমমান (ই) গ্রাজুয়েট (ঈ) পোস্ট গ্রাজুয়েট (উ) অন্যান্য
(৬) পেশা :
(৭) প্রতিষ্ঠানের নাম :
(৮) পদবী (যদি কর্মক্ষেত্রে যুক্ত থাকেন) :
(৯) কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা (যদি কর্মক্ষেত্রে যুক্ত থাকেন) :

'খ' বিভাগ : ব্যক্তিগত মতামত সংক্রান্ত তথ্য

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মতামত সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু অবগত অথবা অনবগত তা নির্দেশ করতে নিম্নলিখিত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = উত্তমরূপে, ৪ = হ্যাঁ, ৩ = কিছুটা, ২ = না, ১ = একদমই না)

ব্যক্তিগত মতামত					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
আপনি কি ইসলামি শারি'আহ সম্পর্কে অবগত?					
আপনি কি সুদ সম্পর্কে অবগত?					
আপনি কি লেনদেনের ইসলামি পন্থার পক্ষপাতী?					
আপনি কি সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে পরিচিত?					
আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে লেনদেন করেন?					
আপনার উত্তরের স্বপক্ষে কারণ					
আপনি কি মনে করেন, একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদ মুক্ত ব্যাংকিং গুরুত্ব বহন করে?					

‘গ’ বিভাগ : প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমানে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
ইসলামি শারি‘আহ প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারকে উৎসাহিত করে					
বর্তমানে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও এর গুণগত মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে					
কৃষিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে সুদমুক্ত ব্যাংকগুলো ভূমির সদ্ব্যবহারেভূমিকা রাখছে					
পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে সুদমুক্ত ব্যাংক নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ খাতে (যেমন– তামাক, এলকোহল) বিনিয়োগ না করে সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে					
প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব কমাতে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে					
ইলেক্ট্রনিক লেনদেনকে ত্বরান্বিত করে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ গ্রিন ব্যাংকিং-কে উৎসাহিত করছে					

‘ঘ’ বিভাগ : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫= সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪= একমত, ৩= নিরপেক্ষ, ২= দ্বিমত, ১= সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আবশ্যক					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হল শারি‘আহভিত্তিক লেনদেন সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান					
যথাযথ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হলে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর উপর পেশাদার অভিজ্ঞ জনবল গড়ে তোলা সম্ভব					
বর্তমানে বাংলাদেশের সুদমুক্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো যে ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তার আধুনিকায়ন জরুরি					
ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার উপর উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত					
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থার উপর আলাদা বিভাগ চালু করা উচিত					

‘ঙ’ বিভাগ : মূলধন গঠনে সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো মূলধন গঠনে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

মূলধন গঠনে সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিনিয়োগ নীতিমালাসমূহ মূলধন গঠনকে ত্বরান্বিত করছে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলধনকে ত্বরান্বিত করে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে					
মূলধন গঠনের মাধ্যমে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা শিল্প ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছে					

মূলধন গঠন ত্বরান্বিত হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ভূমিকা রাখছে					
মূলধন গঠনের মাধ্যমে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা শিল্প ও উৎপাদিত পণ্যেও বাজার সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছে					

'চ' বিভাগ : উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
উদ্যোক্তা গঠনের উদ্দেশ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে					
শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা উদ্যোক্তা গঠনে ভূমিকা রাখছে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচি দ্বারা অন্যান্য পেশা থেকে জনগণ নিজস্ব উদ্যোগমূলক কর্মকাণ্ডে বেশি আগ্রহী হচ্ছে					
উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তার মাধ্যমে সুদমুক্ত ব্যাংকিং উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে আরও অনেক বেকার লোকদের উপার্জনের ব্যবস্থা করছে					
উদ্যোক্তা গঠনে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কর্মক্ষম জনশক্তি বৃদ্ধি করছে					

'ছ' বিভাগ : প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রযুক্তিগত প্রসারে অংশগ্রহণ করেছে					
ই-ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে লেনদেনকে আরও সহজসাধ্য, ব্যয় সাশ্রয়ী, সময় সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ করতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে					
নিজস্ব মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সুদমুক্ত ব্যাংকগুলো গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে সর্বদা সচেষ্ট					
ই-ব্যাংকিং সুবিধাগুলোর কারনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ডিজিটাল লেনদেনের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়ছে					
প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে সুদমুক্ত ব্যাংকিংসমূহ দেশিয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হচ্ছে					

'জ' বিভাগ : শ্রম বিভাগ এবং মাত্রাগত উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো শ্রম বিভাগ এবং মাত্রাগত উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

শ্রম বিভাগ এবং মাত্রাগত উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বহুমুখী বিনিয়োগের ফলে বিভিন্ন কাজে দক্ষ জনবলের দরকার পড়ছে					
বিশেষায়িত দক্ষ লোকের প্রয়োজন পূরণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে					
বিভিন্ন কাজে দক্ষ জনবল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে যা ইসলামি বিনিয়োগের পরোক্ষ ফল					
বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষ জনগোষ্ঠী সে বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মক্ষম থাকায় শ্রম বিভাগ সৃষ্টি হচ্ছে					
শ্রম বিভাগ প্রবর্তনের ফলে সুদমুক্ত ব্যাংকিং শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছে					

'ঝ' বিভাগ : অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি দেশীয় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়ক					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর মূলধন গঠন পদ্ধতি শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠতে সহায়ক					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রযুক্তিগত প্রসার অধিক পরিমাণে শিল্প ও ব্যবসাকে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর আওতায় নিয়ে আসছে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিংসমূহ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সচেষ্ট					

'ঞ' বিভাগ : সামাজিক উপাদানসমূহকে প্রভাবিত করতে সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো সামাজিক উপাদানসমূহকে প্রভাবিত করতে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

সামাজিক উপাদানসমূহকে প্রভাবিত করতে সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
সুদমুক্ত ব্যাংকিং জনগণের মনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেতনা সৃষ্টি করে					
জনগনের ধর্মীয় চেতনাকে আর্থিক লেনদেনে প্রতিফলিত করে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং সামাজিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং সামাজিক কল্যাণের দিকে মানবমনকে ধাবিত করে					
শারি'আহভিত্তিক লেনদেন দ্বারা নিজেদের কতটুকু উপকার হবে সে ব্যাপারে জনগণকে সামাজিকভাবে সচেতন করে					

'ট' বিভাগ : রাজনৈতিক উপাদানসমূহকে প্রভাবিত করতে সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো রাজনৈতিক উপাদানসমূহকে প্রভাবিত করতে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

রাজনৈতিক উপাদানসমূহকে প্রভাবিত করতে সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
সুদমুক্ত ব্যাংকিং রাজনৈতিক অস্থির অবস্থায়ও সমানভাবে ফলপ্রসূ					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রসার রাজনৈতিক জটিলতা থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনে ফলপ্রসূ					
রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সুদ এবং বিনিয়োগে যে জটিলতা তৈরি হয় শারি'আহ-ভিত্তিক ব্যাংকিং তা থেকে মুক্ত					

'ঠ' বিভাগ : সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি মজবুত শাসনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত					
শারি'আহভিত্তিক পন্থায় পরিচালিত হওয়ায় প্রশাসনিক কাঠামো দক্ষভাবে কাজ করতে পারে					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রিয় শারি'আহ কমিটিতে বিজ্ঞ শারি'আহ বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি থাকে বলে শারি'আহভিত্তিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ থাকে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের কর্মকাণ্ড শারি'আহভিত্তিক পন্থায় তদারকি করা হয়					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং সুষ্ঠু আর্থিক নিরীক্ষণের মাধ্যমে কাজ করে					

'ড' বিভাগ : ধর্মীয় উপাদানসমুহের ক্ষেত্রে সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো ধর্মীয় উপাদানসমুহের ক্ষেত্রে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহপূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

ধর্মীয় উপাদানসমুহের ক্ষেত্রে সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
ইসলামে যে লেনদেনের নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে তা সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর মাধ্যমেই জনগণ জানতে পারে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত একটি বিষয়					
ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরাও সুদমুক্ত ব্যাংকিং থেকে উপকৃত হতে পারে					
জনগণ সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর সুবিধা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে স্বাধীন					

'ঢ' বিভাগ : জাতীয় সংহতিতে সহায়তা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো জাতীয় সংহতিতে সহায়তার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

জাতীয় সংহতিতে সহায়তা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
সুদমুক্ত ব্যাংকিং জাতীয় সংহতিকে স্বাগত জানায়					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং সরকারকে যেকোনো কল্যাণমূলক সহায়তা প্রদানে সচেষ্ট					
জাতীয় কল্যাণই সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর মূলমন্ত্র					
সুদের কালো থাবা থেকে জাতিকে মুক্ত করে সামগ্রিক আর্থিক কল্যাণ সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর উদ্দেশ্য					

'ণ' বিভাগ : শিল্পায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো শিল্পায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

শিল্পায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
একটি দেশের শিল্পখাতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর দৃঢ় পদক্ষেপ দেশটির শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে					
ইসলামি অর্থব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে গচ্ছিত মূলধন যথাযথভাবে কাজে লাগানো সম্ভব					
ইসলামি অর্থব্যবস্থা অনেক মূলধন বিহীন লোককেও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের মাধ্যমে শিল্পখাতে অবদান রাখতে সহায়তা করে					
ইসলামি অর্থব্যবস্থা শিল্প কলকারখানা সমূহের শৃঙ্খলা বজায় রেখে উৎপাদনশীলতাকে সক্রিয় রাখে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং উৎপাদনমুখী শিল্পকে ত্বরান্বিত করে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং শিল্পখাতে মূলধন, দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরি এবং পেশাগত দিকগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে					

'ত' বিভাগ : কৃষিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো কৃষিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

কৃষিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
সুদি ব্যাংকের ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকরা বেশিরভাগ সময়েই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয় যা সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব					
সুদমুক্ত ব্যাংক সমূহ কৃষিখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষকদের সাথেও অংশীদার হিসেবে কাজ করতে পারে					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ কৃষকদের সাথে লাভ লোকসানের বণ্টন করে যা কৃষকদের আর্থিক ক্ষতি হ্রাস করে					
কৃষিতে বিনিয়োগের ফলে অনেক বেকার মানুষও কৃষিকাজে নিজেকে নিয়োজিত করার সাহস পাচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশের কৃষি অগ্রগতি লাভ করছে					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ কৃষকদের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করায় কৃষিকাজে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে					

‘থ’ বিভাগ : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫= সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪= একমত, ৩= নিরপেক্ষ, ২= দ্বিমত, ১= সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
সুদমুক্ত ব্যাংক সমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করছে					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ তরুণ উদ্যোক্তাদের মাঝে ঝুঁকি গ্রহণের উৎসাহ সৃষ্টি করে বলে উদ্যোক্তারা স্বাধীন ব্যবসায় আগ্রহী হয়					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ উদ্যোক্তাদের সাথে লাভ লোকসানের বণ্টন করে যা তাদের আর্থিক ক্ষতি হ্রাস করে					
অন্যের অধীনে চাকরির জন্য না ঘুরে স্বাধীন ভাবে নিজের কর্মসংস্থান যাতে নিজেই করা যায় সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা সেই উৎসাহ দেয়					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের সাহায্য নিয়ে উদ্যোক্তারা নিজের ব্যবসায় সফল ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তাতে আরও অনেক লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব					

‘দ’ বিভাগ : বিনিয়োগে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো বিনিয়োগে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

বিনিয়োগে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহক নির্বাচনে দক্ষতা ব্যাংকিং কার্যক্রম সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কোন গ্রাহক সেবা নিতে চাইলে তা অবশ্যই শরিয়ত সম্মত শর্ত সাপেক্ষে হবে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিনিয়োগের আওতা সুদী ব্যাংকের বিনিয়োগের আওতা অপেক্ষা বেশি বিস্তৃত থাকে					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ খাতেও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে কারন এক্ষেত্রে সুদের পরিবর্তে ব্যাংক লাভ বা লোকসানের অংশীদার হয়					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ সর্বাচ্চ পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মূলধন গঠনে উৎসাহ দেয়					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদের স্থান থাকে না বলে এর অর্থায়নে উৎপাদিত পণ্যেও বাজারদর ও মান অধিকতর গ্রহণযোগ্য					

‘ধ’ বিভাগ : কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ নিজেদের প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করছে					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে					
যারা মূলধনের অভাবে কোন কাজ করতে পারত না সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা তাদের মূলধন সরবরাহ করে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো বিনিয়োগে অংশীদার হিসাবে থাকায় বিনিয়োগ গ্রহীতারা লাভ লোকসান সবই বণ্টন করতে পারে					
লাভ লোকসান বণ্টনের সুবিধার কারনে বেকাররা নিশ্চিন্তে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর সুবিধা গ্রহণ করতে রাজি হয়					

'ন' বিভাগ : নারীর ক্ষমতায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো নারীর ক্ষমতায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

নারীর ক্ষমতায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মহিলাদের স্বতন্ত্রভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে					
নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর বিনিয়োগ পদ্ধতি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে সক্ষম					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে অনেক উচ্চশিক্ষিত নারীরা এখন সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন করছেন					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা নারীদের জন্য স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র তৈরির কারনে দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে					
উচ্চ শিক্ষিত নারীরা সুদমুক্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছে বলে তাদের উপর আস্থা রেখে নারী গ্রাহকগণ নিজেরাই ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারছেন					

'প' বিভাগ : দারিদ্র্য বিমোচনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো নারীর ক্ষমতায়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

দারিদ্র্য বিমোচনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়					
সঠিক পরিমানে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের যাকাত প্রদানে সক্ষম জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে যাকাত আদায় করার গুরুদায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে পারে					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে সকল কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে তা মানুষের অভাব দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে					

‘ফ’ বিভাগ : বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

বৈদেশিক রেমিট্যান্স আদায়ে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
সুদমুক্ত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রেমিট্যান্স আদায় করছে তা যথেষ্ট ফলপ্রসু					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স আদায়ের ফলে দ্রুতগতিতে প্রবাসীদের অর্থ পরিবারের হাতে পৌঁছেছে					
রেমিট্যান্স আদায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুদমুক্ত ব্যাংক সমূহের সম্প্রসারিত কর্মসূচির প্রয়োজন					
সুদমুক্ত ব্যাংক সমূহ রপ্তানিমুখী শ্রমশক্তি বৃদ্ধিতে দক্ষতা উন্নয়নের কাজে সরকারের পাশে দাঁড়াতে পারে					
সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ রপ্তানিমুখী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিতে সফল হলে রেমিট্যান্সের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে					
রেমিট্যান্স আদায়ের আর্থিক খরচসমূহ দক্ষতার সাথে হ্রাস করার ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে					

‘ব’ বিভাগ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
সুদমুক্ত ব্যাংক সমূহ আমদানি আর রপ্তানির কাজকে সহজ করতে পারে					
সুদমুক্ত ব্যাংক সমূহ আমদানি রপ্তানিতে ভূমিকা রাখায় বিশ্ব বাজারে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে					
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সেটা তদারকির জন্য কেন্দ্রিয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ দরকার					

‘ভ’ বিভাগ : Corporate Social responsibility-তে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো Corporate Social responsibility-তে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

Corporate Social Responsibility-তে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর ভূমিকা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর মূল উদ্দেশ্য শারি'আহসম্মত উপায়ে সামাজিক কল্যাণ সাধন					
সমাজ থেকে শুধু অর্থ উপার্জন না বরং সমাজের কল্যানের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় ও সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের সামাজিক দায়িত্ব					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর সুফল যাতে সমাজের সর্বস্তরের জনগণ ভোগ করতে পারে সেজন্য Corporate Social Responsibility পালন করা জরুরি					
দক্ষ Corporate Social Responsibility (CSR) কার্যক্রম সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর পরিসর আরও বিস্তৃত করবে					

‘ম’ বিভাগ : সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের সচেতনতা

নির্দেশনা : নিম্নোক্ত তথ্যগুলো সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের সচেতনতা সম্পর্কিত। প্রতিটি তথ্যের সাথে আপনি কতটুকু একমত অথবা দ্বিমত পোষণ করেন তা নির্দেশ করতে অনুগ্রহ পূর্বক প্রদত্ত মানদণ্ড ব্যবহার করুন।

(৫ = সম্পূর্ণরূপে একমত, ৪ = একমত, ৩ = নিরপেক্ষ, ২ = দ্বিমত, ১ = সম্পূর্ণরূপে দ্বিমত)

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের সচেতনতা					
প্রশ্নাবলি	১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং প্রসারে কেন্দ্রিয় ব্যাংকের ভূমিকা সন্তোষজনক					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রিয় ব্যাংকের যে সকল নীতিমালা রয়েছে তা সময়োপযোগী					
কেন্দ্রিয় ব্যাংক আরও নতুন নতুন সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদন দেয়া উচিত					
সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থিতিস্থাপকতা আনার জন্য যদি নতুন নীতিমালা প্রণীত হয় তাহলে তা					
পর্যাপ্ত নীতিমালার অভাবে বেশিরভাগ সুদমুক্ত ব্যাংকই সম্পূর্ণ শারি‘আহভিত্তিক পন্থায় পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সন্দেহজনক					
সুদমুক্ত ব্যাংকগুলো সম্পূর্ণরূপে শারি‘আহভিত্তিক পন্থায় পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা কেন্দ্রিয় ব্যাংকের তদারকি করা উচিত					
সুদমুক্ত ব্যাংকগুলোর শারি‘আহভিত্তিক নীতিমালায় নমনীয়তা মানে সম্পূর্ণভাবে ইসলামি শারি‘আহর লঙ্ঘন					

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি উৎস

১. القراٰن الكريم وتفسيره

২. أبو عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري : صحيح البخاري، بيروت : دار ابن كثير للنشر والطباعة، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

৩. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري : الصحيح لِمسلم، دمشق : دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ

٤. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي : جامع الترمذي، لاهور : مكتبة العلم، بدون التاريخ

٥. أبو داود سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود، الرياض : مكتبة دار السلام، ٢٠٠٨م

٦. أحمد ابن تيمية : مجموع فتاوى، المدينة المنورة : مجمع الملك فهد بن عبد العزيز، ١٤١٥هـ

٧. الدكتور حمادي العبيدي : الشاطبي ومقاصد الشريعة، بيروت : دار قتيبة، ١٤١٢هـ

٨. شاه ولي الله الدهلوي : حجة الله البالغة، بيروت : دار الفكر، ١٤١٠هـ

٩. أبو عبيد القاسم بن سلام : كتاب الأموال، بيروت : دار الشروق، ١٤٠٩هـ

١٠. مجلس المراجعة : الموسوعة الفقهية، الكويت : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ١٤٠٤هـ

١١. برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني : الهداية، كراتشي : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ١٤١٧هـ

বাংলা উৎস

১২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৭

১৩. ড. আবদুল আজিজ আল-নাজ্জার : *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?* অনূঃ ও সম্পাদনা, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : আইবিবিএল, ১৯৮৪

১৪. সম্পাদনা পরিষদ : *ফিকহে হানাফরি ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকা : ইফাবা, মে, ২০১৪

১৫. সম্পাদনা পরিষদ : *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫

১৬. এম. আযীযুল হক : *ইসলামী ব্যাংক : কতিপয় ভ্রান্তিমোচন*, অনূঃ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৬

১৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, জুলাই, ২০১০

১৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং : সক্ষমতা ও সফলতার নিরিখে*, ঢাকা : আইবিবিএল, সেপ্টেম্বর, ২০১৪

১৯. মোহাম্মদ জিয়াউল হক : *আল কুরআনের আলোকে অর্থনীতি*, ঢাকা : প্রিয়বই প্রকাশনী, ২০০২

২০. এ. জেড. এম. শামসুল আলম : *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, মে, ১৯৯৯

২১. এ. জেড. এম. শামসুল আলম : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ইফাবা, নভেম্বর, ২০০৩

২২. প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী : রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল, ২০০৫

২৩. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী অর্থনীতি*, ইফাবা, অক্টোবর, ২০০৪

২৪. প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৪

২৫. এম. এ হামিদ : *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মে, ২০০২

২৬. ড. এম ওমর চাপড়া : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, অনূঃ ড. মাহমুদ আহমদ, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০০

২৭. ড. এম ওমর চাপড়া : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনূঃ ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, এ কে এম সালেহ উদ্দীন, খন্দকার রাশেদুল হক, আমানুল্লাহ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০

২৮. ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী : *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপরেখা*, অনূঃ এম.এম. ছলিমুল ওয়াহেদ, ঢাকা : জাবাল-এ-নূর প্রকাশনী, মার্চ, ২০০৭

২৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংকব্যাবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, অক্টোবর, ১৯৯৬

৩০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৮

৩১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : *ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, মে, ১৯৯৬

৩২. ইকবাল কবীর মোহন : *আধুনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, অক্টোবর, ২০০৩

৩৩. ইকবাল কবীর মোহন : *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : জেরিন পাবলিশার্স, এপ্রিল, ২০১০

৩৪. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি কেন কিভাবে?* ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৮

৩৫. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*, ঢাকা : আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০১

৩৬. তাজুল ইসলাম ও আবু তাহের মোঃ সালেহ : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, মে, ১৯৮৪

৩৭. মোহাম্মদ ইসমাঈল খান : *ইসলামের দৃষ্টিকে সুদ ও ব্যবসা*, ঢাকা : মীর পাবলিকেশন্স, ২০০১

৩৮. মোঃ শামসুল কবির খান : *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ডিসেম্বর, ২০০০

৩৯. ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, চট্টগ্রাম : গাউছিয়া হক মঞ্জিল, মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, ১৯৯৮

৪০. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী : *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, ঢাকা : দারুল ইবতিকার, এপ্রিল, ২০০০

৪১. এম. এ মান্নান : *ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, অনূঃ আলী আহমেদ রুশদী, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩

৪২. মাওলানা হিফজুর রহমান : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনূঃ মাওলানা আব্দুল আওয়াল, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ, ২০০২

৪৩. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনূঃ ও সম্পা. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

৪৪. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী : *ইসলামের অর্থ বণ্টন ব্যবস্থা*, অনূঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা : ইফাবা, জুন, ১৯৯৫

৪৫. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, জুন, ১৯৯৫

৪৬. ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী : *শরীয়তের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার*, অনূঃ কারামত আলী নিযামী, ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০০

৪৭. ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী : *সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা*, অনূঃ কারামত আলী নিযামী, ঢাকা : আঞ্জুমানে মুছান্নিফিন, ১৯৯৫

৪৮. এ. বি. এম হোসাইন : *ইসলামে বাণিজ্য আইন*, অনূঃ এম রুহুল আমিন, ঢাকা : ইফাবা, মে, ২০০০

৪৯. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী : *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন : সমস্যা ও সমাধান*, অনূঃ মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, অক্টোবর, ২০০৫

৫০. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী : *সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, অনূঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, মার্চ, ২০০৭

৫১. মু. শামসুজ্জামান : *খেলাপী বিনিয়োগ আদায়*, ঢাকা : নভোনীল প্রকাশনা, অক্টোবর, ২০১৭

৫২. মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন : *ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, সপ্তপদী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

৫৩. মুহাম্মদ মুবারক হুসেইন : *জেনারেল ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, সপ্তপদী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

৫৪. এ.এ.এম হাবীবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রকাশিকা- হেলেনা পারভীন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, জানুয়ারি ২০০৪

৫৫. মোঃ মুখলেছুর রহমান : *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী'আহ্ বোর্ড*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, জুন, ২০০৪

৫৬. ড. মুহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা : *এ হ্যান্ডবুক অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন*, ঢাকা : প্রকাশিকা- সাহেরা হায়দার, ডিসেম্বর, ২০০০

৫৭. ড. মুহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা : *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং কাস্টমস এন্ড প্র্যাকটিস*, ঢাকা : প্রকাশিকা- সাহেরা হায়দার, ২০০৮

৫৮. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ : পরিপালন * প্রয়োগ * পদ্ধতি*, ঢাকা কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৬

৫৯. মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা : *ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা : ইসলামী শরীয়াহ্‌র আলোকে সঠিক বক্তব্য*, ঢাকা : ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মার্চ, ২০০৪

৬০. মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা : *ইসলামী ব্যাংকিং : নতুন প্রোডাক্ট নতুন ভাবনা*, ঢাকা : মুনিরাতুল কুবরা, মে, ২০১৩

৬১. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল, ২০১৭

৬২. মুহাম্মদ হারোয়ান সুক্রি ও মুহাম্মদ হাওয়ারী : *শরিআহ'র ধারণা এবং ইসলামী অর্থায়নে এর প্রয়োগ কৌশল*, অনূ. ইকবাল কবীর মোহন, ঢাকা : সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ডেভেলোপমেন্ট, ২০২০

৬৩. এ.কে.এম. নুরুল ইসলাম : *ইউনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রকাশক- তাসনীম জাহান, ডিসেম্বর, ২০০৫

৬৪. মোঃ মোসলেহ উদ্দিন : *ব্যাংকিং এ শরীয়া : আমানত, বিনিয়োগ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা : বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি, ২০২০

৬৫. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ : *ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ● প্রয়োগ ● পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, এপ্রিল, ২০০৪

৬৬. ড. মো. ইব্রাহীম খলিল : *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, মে, ২০১৫

৬৭. ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আমিন : *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

৬৮. সম্পাদনা কমিটি : *বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস*, ঢাকা : ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডিসেম্বর, ২০১৭

৬৯. মোহাম্মদ শাহজাহান : *নতুন ধারার কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং*, ঢাকা : বাংলা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

৭০. এম. আজিজুর রহমান : *আধুনিক ব্যষ্টিক অর্থনীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, আগস্ট, ২০০২

৭১. এম. জামান হোসেন : *শিল্প অর্থনীতি*, ঢাকা : সুপ্রীম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

৭২. রেজাউল করিম সিদ্দিক ও মোঃ আকতারুজ্জামান সরকার : *ব্যবসায় উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : ন্যাশনাল লাইব্রেরী, জুন, ২০০৪

৭৩. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : *বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন*, ঢাকা : দি যমুনা পাবলিশার্স, অক্টোবর, ২০০৫

৭৪. ড. মোল্লা জালালউদ্দিন : *শিল্প অর্থনীতি*, ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, এপ্রিল, ২০০৮

৭৫. সম্পাদকমণ্ডলী : *শিল্পায়ন ও উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা : প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, নভেম্বর, ১৯৯৭

৭৬. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা : *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহর নীতিমালা*, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, সেপ্টেম্বর, ২০১১

৭৭. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, নভেম্বর, ২০১৫

৭৮. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, মে, ২০১৭

৭৯. মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী : *ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি*, অনূঃ আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ডিসেম্বর, ২০১৭

৮০. মুহাম্মদ রুহুল আমিন : *ইসলামী আইনের উৎস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, আগস্ট, ২০১৩

৮১. এ. বি. সিদ্দিক : *চুক্তি আইন*, ঢাকা : কামরুল বুক হাইস, নভেম্বর ২০১১

৮২. বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী : *আল-হিদায়া*, অনূঃ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল, ২০১৪

৮৩. ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী : *ইসলামী শরীআহ ও সুন্নাহ*, অনূঃ এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা : ইফাবা, মে, ২০০৭

৮৪. সম্পাদনা কমিটি : *আইবিবিএল শরী'আহ ম্যানুয়াল*, ঢাকা : শরী'আহ সেক্রেটারিয়েট, আইবিবিএল, ডিসেম্বর, ২০২০

৮৫. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : ইফাবা, অক্টোবর, ২০০৪

৮৬. সম্পাদনা পরিষদ : *ওয়াকফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১৩

৮৭. ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ : *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্ট ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইফাবা, ফেব্রুয়ারি, ২০১০

৮৮. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী : *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনূঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭

৮৯. আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান : *ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার*, অনূঃ ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ঢাকা : ইফাবা, সেপ্টেম্বর, ২০১০

৯০. ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী : *ইসলামী ব্যাংকিং*, অনূ. ড. মোস্তাক মোহাম্মদ ও ড. একেএম মফিজুল ইসলাম, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০১৩

ইংরেজি উৎস

91. Dr. Khurshid Ahmed : *Economic Development in an Islamic Framework,* Leicester : The Islamic Foundation, 1979

92. M. Umar Chapra : *Islam and Economic Development : A Strategy for Development with Justice and Stability,* Islamabad : International Institute of Islamic Thoughts, Islamic Research Institute, 1993

93. Dr. M. Nejatullah Siddiqui : *Banking Without Interest,* Leicester : The Islamic Foundation, 1983

94. Nasiruddin Ahmed : *Banking, Finance and Economics,* Dhaka : Shamarukh Nasir, 2nd Edition, October, 2000

95. Abdur Raquib : *Principle & Practice of Islamic Banking,* Dhaka : Panam Press Ltd., 2007

96. Board of Editors : *Thought on Islamic Banking,* Dhaka : Islamic Economic Research Bureau, 1982

97. Board of Editors : *Text Book on Islamic Banking,* Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, November, 2008

98. Ansar Ali Khan : *The Negotiable Instruments Act, 1881,* Dhaka : New Warsi Book Corporation, 2007

99. Board of Editors : *Bangladesh Economic Review 2016,* Dhaka : Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, 2017

100. Md. Abdul Hamid Miah : *Special Investment Schemes of IBBL and Its Social Impect,* Dhaka : PRD, IBBL, February, 2018

101. Deviga Vengedasalam : *Principles of Economics*, New York : Oxford University Press, 2013
102. Peter S. Rose : *Bank Management & Financial Services*, Singapore : McGraw Hill, 2013
103. Anthony Saunders & Marcia Millon Comett : *Financial Institutions Management*, New Delhi : McGraw Hill Education (India) Pvt. Ltd., 2013
104. Taher Ahmed : *Bank Audit & Internal Control*, Dhaka : Shamsunnahar, September, 2019
105. Board of Editors : *Bangladesjh Vision 2030*, Dhaka : BIBM, 2015
106. Board of Editors : *Investment Operation Manual*, Dhaka : IAD, IBBL, June, 2016
107. Omar Khaled Rumi : *A to Z Banking Glossary*, Dhaka : Accurate Publication, March, 2016
108. Omar Khaled Rumi : *General Banking Glossary*, Dhaka : Green Global Web, November, 2015
109. Omar Khaled Rumi : *Islamic Banking According to Maqasid Al Shariah*, Dhaka : Accurate Publication, March, 2016
110. Mohammad Abdul Mannan : *Islamic Banking in the Light of Objectives of Shariah*, Dhaka : PRD, IBBL, September, 2015
111. Md. Abdul Hamid Miah : *Islamic Microfinance*, Dhaka : Principal Publishers Ltd., February, 2018
112. Editorial Team : *Green Banking in Bangladesh*, Dhaka : BIBM, November, 2014
113. Editorial Team : *Banking Review Series 2016*, Dhaka : BIBM, 2016
114. Adolph Matz & Milton F. Usrv : *Manual Cost Accounting Planning and Control*, New York : South-Western Publishing Co., 2006
115. Atiur Rahman : *Inclusive Finance and Sustainable Development*, Dhaka : BIBM, 2013
116. P.N. Varshney : *Banking Law and Practice*, New Delhi : Sultan Chand & Sons, 2006
117. Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel & Donald E. Kieso : *Accounting Principles*, New York : John Wiley & Sons (Asia) Pvt. Ltd., 2016
118. Editorial Team : *International Standard Banking Practice*, Dhaka : ICC Bangladesh, 2013
119. L.R. Chowdhury : *A Textbook of Foreign Exchange*, Dhaka : Brothers' Publications, 2016
120. Board of Editors : *Guidelines for Foreign Exchange Transactions*, Dhaka : Foreign Exchange Policy Department, Bangladeh Bank, 2018
121. Fahda Nur Ahmad Kamar : *Islamic Economics : Theory and Practice*, Kuala Lumpur, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, 2016
122. Adam Abdullah & Others : *Islamic Economics : Principles & Analysis*, Kuala Lampur, International Sh'ariah Research Academy for Islamic Finance, 2016

বিভিন্ন বই, পুস্তিকা ও প্রতিবেদনসমূহ

১২৩. ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, জানুয়ারি ২০১৪
১২৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি, ঢাকা : আইবিবিএল, জুলাই ২০১০

১২৫. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০২১)
১২৬. আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০২১)
১২৭. আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০২১)
১২৮. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০২১)
১২৯. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০২১)
১৩০. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০২১)
১৩১. এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০২১)
১৩২. ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০২১)
১৩৩. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১)
১৩৪. গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১)
১৩৫. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১)
১৩৬. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-২০২১)
১৩৭. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০২২
১৩৮. অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০০২, সংখ্যা ৪, জুলাই ২০০৩, সংখ্যা ১০, ডিসেম্বর ২০০৮, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর ২০১৩
১৩৯. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০২২
১৪০. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন, ২০২১
১৪১. ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট।

এ্যাবস্ট্রাক্ট (Abstract)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

(Impact of Interest Free Banking System on the Economic Growth of Bangladesh : An Analysis)

সুদমুক্ত ব্যাংকিং মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক পরিচালিত এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যাতে সুদ ও সুদের বিনিময়ে ধার ও ঋণের লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে সুদ নির্মূলকরণ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা, ন্যায়বিচার, দক্ষতা, স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্যোক্তা ও পুঁজির মালিকের মধ্যে শিল্প অথবা বাণিজ্যিক ঝুঁকি সমানভাবে বণ্টন এবং বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা ও মুনাফা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে মূলধনের ভিত্তিতে ভাগ করে দেয়া হয়ে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সাধারণত সেরা ঋণ পরিশোধকারী গ্রাহকদের সেবা দিতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও লাভজনক প্রকল্পের সন্ধান করে। ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকিং তাত্ত্বিকভাবে ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্তর ও সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের বিরোধিতা করে এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। বাংলাদেশের চলমান অর্থব্যবস্থাকে আরো স্থিতিশীল করে গড়ে তোলার জন্য সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাবতীয় যোগ্যতা ধারণ করে। আর সে ধারণার আলোকে **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক শিরোনামে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণীত হয়েছে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাংকিং কার্যাবলিতে ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালন করা। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতা নির্ভর করে সুদ বর্জন নীতিমালা পরিপালনের উপর। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে ব্যাংকিং-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সকল দিক ও বিভাগে সুদ পরিহারের নীতিমালা পরিপালন অত্যাবশ্যক। সুদমুক্ত ব্যাংকিং বিষয়ে বিশ্বে যে ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে সে তুলনায় বাংলাদেশ এখনও অনেকটা পিছিয়ে আছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকি ও অর্থায়ন অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এ ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইসলামি পদ্ধতির আলোচনা এখন পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন একটা স্থান পায়নি বললেই চলে। ফলে এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা ও সংশয় এখনও বিরাজমান করছে। বিশেষত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যপদ্ধতির ব্যাপারে ব্যাংকার-গ্রাহক ও জনসাধারণের মাঝে স্পষ্ট ধারণার ব্যাপক অভাব পরিদৃষ্ট হয়। আর এ বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ গবেষণার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো ব্যাংকিং কার্যাবলিতে ইসলামি বিধি-বিদান পরিপালন করা, যা সাম্য, ন্যায়, ও মমত্তভিত্তিক। সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুফল লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে কুরআনে বর্ণিত সে নীতি পরিপালনের উপর। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে

সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বাস্তবতা উদ্ঘাটন করা।

এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব-উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য ইংরেজি ও আরবি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের ব্যাংকিং কাঠছামো ও বাংলাদশের সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তার সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকসমূহে সুদমুক্তভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে মাঠ জরিপের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অবস্থা চিহ্নিত করে সম্ভাব্য দিক-নির্দেশনা ও সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি ভাবানুবাদের আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় প্রণীত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামি ব্যাংকসমূহে সুদ পরিহারপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে যে সব খাতে অবদান রেখেছে সেগুলোতে ইসলামি বিধি-বিদান পরিপালনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণই গবেষণা পরিধির আওতাভুক্ত। এ ছাড়া এ সংক্রান্ত ব্যাপারে মানুষের মাঝে ভুল ও অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত রয়েছে। সে বিষয়টিও এ গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া শারি'আহ ও সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের পরিচিতিও তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালনপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ব্যাংকসমূহের অবদান সংক্রান্ত বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

সর্বোপরি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিশেষত সুদমুক্তভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ইসলামি বিধি-বিধান পরিপালনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিস্থিতি চিহ্নিত করে এতদ্‌বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা গবেষণা কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Sources) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Sources) ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে **'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা'** শিরোনামে এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায়ে ও প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের কাঠামো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার শিরোনামোক্ত বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ভূমিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা, গবেষণা কর্মের পরিধি, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা এবং বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ক্রমানুসারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের উৎপত্তি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন'। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যুদয়, স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-

সামাজিক অবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুদমুক্ত ব্যাংকিংও এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্র'। এ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিশ্লেষণ, ইসলামি অর্থনীতির ধারণা, বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ' বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং'। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর বিকাশ, বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং-এর সামগ্রিক চিত্র, সুদ ও মুনাফার পরিচিতি, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদ ও মুনাফার অবস্থানগত পার্থক্য ও বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব : ব্যাংকার-গ্রাহক দৃষ্টিকোণ'। এ অধ্যায়ে মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরোক্ষ নির্দেশকগুলোর উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিবিধ প্রকার নির্দেশকের উপর সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাংকার ও গ্রাহকগণের উপর মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং'। এ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নির্দেশকসমূহের উপর প্রচলিত ও সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর অবস্থানগত পার্থক্য, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সে আলোকে বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর প্রসারে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। শিরোনামোক্ত বিষয়বস্তুসমূহকে আরো বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে যথাস্থানে তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তথ্যসূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে।

উপসংহার : অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার লিখিত হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে একান্ত অভিব্যক্তি উপসংহারে প্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা শারি'আহ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সুদমুক্ত ব্যাংকসমূহের গ্রাহকগণ ও ইসলামি অর্থনীতিবিষয়ক গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনসাধারণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভ থেকে সুদমুক্ত ব্যাংকিং, ইসলামি শারি'আহ, সুদ ও সুদের কুফল, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন, সর্বোপরি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয়ভাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ যদি সামান্যতম উপকৃত হয় তাহলেই এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে পরিগণিত হবে।

তারিখ, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.

নুসরাত জাহান রাত্রি
এম.ফিল. গবেষক
রেজি: নং-১৯৮/২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়